বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সন ১৩৪৯ সাল।

প্রকাশক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
১২৪।৫ বি, রসা রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা।

পি ১৬৩ নং রসা রোড
কমার্শিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
শ্রীশচীন্দ্রকুমার চন্দ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

স্বর্গগত

সুপণ্ডিত, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধর্ম্মপ্রাণ

পিতৃদেব

৺কৈলাসচন্দ্র দাশগুপ্ত

মহাশয়ের পবিত্র

পাদপদ্মে

এই গ্রন্থ ভক্তিভাবে উৎসর্গ

করিলাম।

সেবক

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

ভূমিকা

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি পূর্ণায়তন জীবন-চরিত নাই বলিয়া অনেকেই আক্ষেপ করিয়াছেন। কেন যে তাহা হয় নাই তাহা বিস্ময়ের বিষয়। বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর মধ্যে যেন কোন জীবনচরিত লিখিত না হয়, তিনি এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক তাঁহার মহাপ্রস্থানের পরেও প্রায় চারি যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

আজ যে এতদিন পরে এই ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সেই বিরাট পুরুষের জীবনী বাহির হইল, তাহাও সেই মহান্ "অদৃশ্য শক্তির" সহায়তায়ই হইয়াছে। ভগবান কাহাকে দিয়া কি কাজ সম্পন্ন করান একমাত্র তিনিই জানেন, তাঁহারই কৃপায় পঙ্গুও পর্ব্বত লঙ্ঘন করে।

ছিলাম উকীল, হইলাম চাকুরীজীবী। কি অবস্থায় তাহা সম্ভব হইল সে কাহিনী বলিয়া লাভ নাই, তবে একথা সত্য যে উকীল থাকিলে এ কাজ সম্ভব হইত না। আর যে মহাপ্রাণ ব্যক্তির পরিচালনাধীনে কাজ করি, তাঁহার সৌজন্য, উদারতা ও হৃদয়ের বিশালতা ব্যতীতও এই কার্য্য দুঃসাধ্য হইত। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ প্রণয়নে যদি কাহারও সুযশ থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে সেই হৃদয়বান্ মহানুভব ব্যক্তিরই তাহা প্রাপ্য।

কিরূপে জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সে কাহিনীও বিস্ময়কর। বঙ্কিম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে একদিন বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে

সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় জ্যোতিশবাবু খুল্লতাতের জীবনচরিত লিখিবার জন্য কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে শতঞ্জীব বাবুই এই মহাকার্য্যে আমাকে উদ্দীপিত করেন। তাঁহার নিকট যে সমস্ত কাগজাদি ও চিঠিপত্র আছে, তাহাই সূত্র ধরিয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হই। চিঠিগুলি পারিবারিক বিষয়ে নিবদ্ধ হইলেও খুঁজিয়া দেখিলেই বঙ্কিমচন্দ্রকে তাহাতে ধরা যায়। এই হিসাবে সেই পুরাতন চিঠিপত্রের মূল্য খুবই বেশী এবং শতঞ্জীব বাবু এই সমস্ত কাগজপত্রাদি দেখিতে ও যদৃচ্ছারূপ ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্কিম জীবনীর জন্য তাঁহার এতই আগ্রহ যে, এই সব কাগজের বিনিময়ে বিদেশের লোভনীয় অর্থপ্রাপ্তিরও আশা পরিত্যাগ করিয়া তিনি কম স্বার্থত্যাগ ও স্বাদেশিকতার পরিচয় দেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার অকপট সৌহার্দ্দ্য ও সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশই অসম্ভব হইত।

অর্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার সময়ের লোক এখন আর জীবিত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই উপাদান সংগ্রহ করিতে আমাকে বহু পরিশ্রম ও সাধনা করিতে হইয়াছে: বহুস্থানে যাইতে হইয়াছে, বহু লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছে এবং বহু তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইয়াছে। গত চারি বৎসরে আমাকে প্রায় ১২।১৪ বৎসরের পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। প্রত্যেক উপন্যাসের মূলসূত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য আমি যশোহর, কাঁথি, মজিলপুর, বারুইপুর, বারাসত, বহরমপুর, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কাঁটালপাড়া, নারায়ণপুর, হালিসহর, নৈহাটী, হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি বহুস্থানে গিয়াছি। এমন কি আমাকে সমুদ্রতীরস্থ বালিয়াড়ির পথে পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রমুখ কলিকাতার প্রধান প্রধান গ্রন্থাগার ও রাজসাহী, ঢাকা, বহরমপুর ও চাংড়ীপোতা প্রভৃতি স্থানের লাইব্রেরী হইতেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। বিপুল পরিশ্রমে যে উপাদান সংগ্রহ হইয়াছে তাহা বিরাট না হইলেও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে এবং যে সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ রচনা, স্বহস্ত লিখিত উইল, পড়িবার পুস্তকের তালিকা এবং কয়েকখানি চিঠিপত্র ও দলিলের সন্ধান না পাইলে গ্রন্থরচনা অসমাপ্ত থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা ৺শরৎ কুমারীর একমাত্র জীবিত পুত্র সহোদরোপম স্নেহশীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঔদার্য্যগুণে এই সব দিয়া গ্রন্থরচনায় যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ঋণ একরকম অপরিশোধনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্কিমের দ্বিতীয়া কন্যা ৺নীলাব্জ কুমারীর জ্যেষ্ঠপুত্র উদারচরিত শ্রীযুক্ত নীলাদ্রি নাথ মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্রের সুধী পৌত্রগণ শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চামেলী চট্টোপাধ্যায়, এড্ভোকেট, শ্রীযুক্ত সুধীর চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থপ্রণয়নে আমাকে নানাবিষয়ে সহায়তা করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমার অগ্রগামী বঙ্কিমের ভ্রাতুষ্পুত্র পূজ্যপাদ শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা আর অধিক কি বলিব? এপর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লেখক বলিতে তাঁহাকেই বুঝায়। আমি

তাঁহার প্রণীত বঙ্কিম জীবনী হইতে যে কেবল নানাভাবে সহায়তা পাইয়াছি তাহা নয়, তিনি আমাকে আরও নূতন উপাদান দিয়া, সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিয়া, আশীর্ব্বাদ সিঞ্চন করিয়া যেরূপ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা চট্টোপাধ্যায় পরিবারেরই উপযোগী বটে। একথা খুবই সত্য যে তাঁহার প্রণীত জীবনী না থাকিলে আমার কার্য্য আরও দুরূহ হইত। তিনি আমাকে স্নেহ ও সহৃদয়তাপূর্ণ যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহার কোন কোন স্থান প্রকাশ করা আমার পক্ষে অশোভন হইলেও তাঁহার মহানুভবতা দেখাইবার জন্য প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় বিধায় উহা উদ্ধৃত করিলাম।* তাঁহার নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

---

* হরি ওঁ

উত্তরপাড়া।
১৭।১২।৩৮

প্রিয় হেমেন্দ্রবাবু,

আপনার প্রীতিদত্ত 'গিরিশপ্রতিভা' পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম।

বঙ্কিম-জীবনী লিখিবার উপযুক্ত পাত্র আপনি, আমি যেখানি লিখিয়াছি সেখানি জীবনচরিত নয়, জীবনীর উপাদান মাত্র। সেখানি লেখা না থাকিলে আজ কেহ যে জীবনচরিত লিখিতে পারিতেন, তাহা মনে হয় না। আপনি বঙ্কিম জীবনী লিখুন।

আপনি কৃতবিদ্য; তা ছাড়া আপনার লিখিবার, বুঝিবার ও বুঝাইবার একটা শক্তি আছে। তত্তুল্য শক্তি আমার পরিচিত বা বঙ্গসাহিত্যে পরিচিত কোন ব্যক্তির আছে বলিয়া মনে হয় না। সকল রকমে আমার সাধ্যমত সাহায্য আপনাকে করিতে প্রস্তুত আছি।

বিনীত—
শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

'মেদিনীপুর ইতিহাস' ও 'বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্কিমসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি মহানন্দে আমাকে সঙ্গে করিয়া রসুলপুরের নদীর মোহানা, হিজলী, কাঁথি, সমুদ্রতীর, দরিয়াপুর, বালিয়াড়ির পথ, বালিয়াড়ির ধবল শিখর ও তমালতালী বনরাজিনীলা সবই দেখাইয়াছেন। এই সমস্ত স্থান প্রত্যক্ষ না করিলে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাল করিয়া কেহই চিনিতে পারিবেন না। যোগেশবাবু এই সমস্ত তীর্থস্থান দর্শন করাইয়া আমাকে যে কেবল কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নয়, স্বীয় উদারতায় আমাকে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। সাহিত্যিকের এইরূপ হৃদয়ের প্রসারতা সকলেরই আদর্শস্থল।

বঙ্কিমসুহৃদ কবিবর হেমচন্দ্রের জামাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৃদ্ধবয়সেও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মেদিনীপুর হইতে আমাকে যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন ও বাটী ও বিদ্যালয়ের ফটো পাঠাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয় মনে করিতেছি ও তাঁহার উদারতায় মুগ্ধ হইয়াছি। শরৎ কুমারীর দৌহিত্রী জামাতা রায় সাহেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যেই তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা উঠিয়াছে যে তিনি নাকি আত্মজীবনী লিখিয়াছিলেন। একথা সত্য নহে। তিনি জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা গল্পচ্ছলে বলিতেন। তাঁহার বড় জামাতা 'প্রচার' সম্পাদক স্বর্গীয় রাখাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা অবলম্বন করিয়া একখানি জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া কিছু কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি লিখিবার জন্য অতঃপরে রাখালবাবুর পুত্রগণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করেন। হেমেন্দ্র বাবু

কতদূর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই অসমাপ্ত হস্তলিখিত পুস্তকখানি মহানুভব হেমেন্দ্রবাবু আমাকে দিয়া চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করিয়াছেন। যদিচ ইহার কোন কোন ঘটনা শচীশবাবুর পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি এই খাতাখানির মূল্য খুবই বেশী। শরৎ কুমারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উপর নির্ভর করিয়াই পূজ্যপাদ মাতামহ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যাহারা কিছু স্মৃতিকথা লিখিয়া রাখিয়াছেন তন্মধ্যে বঙ্কিমানুজ স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।' ৺অক্ষয় চন্দ্র সরকার ও কবিবর নবীন সেন মহাশয়ের লিখিত কথাও কম মূল্যবান নয়। স্বর্গীয় শ্রীশ মজুমদার ও কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের কাহিনীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ এইগুলি এবং অন্যান্য স্মৃতিকথা এই জীবনী প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

নৈহাটী নিবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহুভাবে সহায়তা করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনিই তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নোটবহিখানি আমাকে দিয়াছেন। তিনিই হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করাইয়া দেন। অধ্যক্ষ মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের উপাদানলাভে সহায়তা করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস সেনও সহায়তা করিয়াছেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধনীয়।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ রায় তাঁহার দমদমার লাইব্রেরী হইতে সমস্ত পুস্তক দেখিতে দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

সুচরিত সাধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমার অকৃত্রিম সুহৃদ। তাঁহার সহানুভূতি ও উপকার কখনও বিস্মৃত হইব না। জীবনচরিতকার সুলেখক শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ঘোষ, বিক্রমপুর ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র মোহন গুপ্ত ও মুণীন্দ্র কুমার সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মজিলপুরের শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত, দেবপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র নাথ রায় প্রভৃতি অসংখ্য বন্ধু আমাকে সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন। সকলের নিকটই আমি বিশেষ ঋণী।

আমার আফিসস্থ সহকর্ম্মীগণের উদারতা ও সহানুভূতি ব্যতীত আমার গ্রন্থপ্রণয়ন অসম্ভব হইত। তাঁহাদের নিকট আমি বিশেষ ঋণী।

কমার্শিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কসের প্রোপ্রাইটরদ্বয় শ্রীযুক্ত সুধেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার চন্দ মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টার গুণে যুদ্ধের সঙ্কটকালেও 'বঙ্কিমজীবনী' এত শীঘ্র প্রকাশিত হইল। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী।

বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে যে সমস্ত আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তিনি লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন সেইগুলির বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজনীয় বিধায়, রাধাবল্লভ, যাদবচন্দ্রের সাংঘাতিক পীড়া, ঈশ্বর গুপ্ত ও বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ও সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা একটু দীর্ঘ হইয়াছে। স্কুল কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব সম্বন্ধেও কথাগুলি সংক্ষিপ্ত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ডেপুটী জীবনের আরম্ভ, পত্নীবিয়োগ ও পুনরায় বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারের সহিত অনেক বিষয়ের সম্বন্ধ বিধায় সেই সমস্ত ঘটনাও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বঙ্কিম প্রথম কলিকাতা আসিয়াই সহরের অবস্থা যেরূপ দেখিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীর অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন, সেই অভিজ্ঞতাও তাঁহার রচনাকুশলের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। তাই আমি বিস্তারিতভাবে

১৮৫৬—৫৮ সালের অবস্থা, প্রধানতঃ তাঁহার উপন্যাসাবলী হইতে, বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

অনেক অনভিজ্ঞ পাঠক মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণ ও মুসলমান এতদুভয়ের প্রতিই বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। একথা সম্পূর্ণ অসত্য। বঙ্কিমের সমগ্র রচনাবলী উপস্থিত করিয়া আমি দেখাইয়াছি, বঙ্কিম কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের উপর বিদ্বেষী ছিলেন না, দেশের বা জাতির অহিতকারী ব্যক্তির উপরই তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। 'বন্দেমাতরমের' মহাকবি কশাঘাতে জাতির ক্রুটী জঞ্জাল বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইলেও সর্ব্বত্র তিনি সমদর্শী, তাঁহার নিকট গড্, আল্লা, ব্রহ্ম, জগন্নাথ সবই এক। তিনি ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, মুসলমান সকলকে সমান চক্ষে দেখিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি জীবনী বুঝাইবার জন্য তাঁহার জীবন-সংশ্লিষ্ট স্থান ও ব্যক্তিসমূহের প্রায় একশত ফটো দেওয়া আবশ্যক। এই সমস্ত ফটো ব্যতীত খাঁটি পরিচয় অসম্ভব। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণের ফটো লইয়াই দ্বিতীয় খণ্ড আবির্ভূত হইবে।

আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার রচনা হইতেই পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার ধ্রুব বিশ্বাস "Great geniuses live in their writings. Their cousins can tell you nothing about them." এই অভিপ্রায়ে পাঁচ খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী, উপন্যাসাবলীর উৎপত্তি ও সংযোগস্থল এবং বিশেষতঃ সৃষ্টিনৈপুণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমার প্রয়াস কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহার বিচারের ভার দেশবাসীর উপর।

১৫ই, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

সূচি—

শ্রীশ্রী৺বিজয় রাধাবল্লভ ঠাকুর, শ্রীশ্রীবলদেব

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রথম অধ্যায়—কাঁটালপাড়ার শ্রীমন্দির

শ্রীশ্রী৺বিজয়রাধাবল্লভ ঠাকুর কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আরাধ্য গৃহ-দেবতা। ইনি বড়ই জাগ্রত বিগ্রহ। চলিত কথায় লোকে ইঁহাকে 'রাধাবল্লভ' বলিয়া থাকে। পরিবারের সকলেরই বিশ্বাস রাধাবল্লভ ঠাকুরের করুণাই তাঁহাদের সকলের সর্ব্ববিধ সুখ-শান্তির আধার। তিনিই তাঁহাদের অভিভাবক, তিনিই তাঁহাদের অন্নদাতা। রাধাবল্লভের মন্দিরটি বর্ত্তমানে সুসংস্কৃত অবস্থাতেই বিদ্যমান। বিগ্রহের ভোগের ঘর, রান্না ঘর ও পুষ্করিণী আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথা হইতেও আমরা চাটুয্যে পরিবারের রাধাবল্লভের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা উপলব্ধি করিতে পারি। প্রায়ই তিনি অশ্রুসিক্ত হইয়া ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিতেন, "রাধাবল্লভ আমাদের বংশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন, আমাদের সকলের কথা শুনেন, সব আবদার রক্ষা করেন; রোগে, শোকে, বিপদে আমরা তাঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদের বড় ভালবাসেন।"*

*চন্দ্রনাথ বসু-স্মৃতি "বন্ধু বৎসল বঙ্কিমচন্দ্র"—ভাদ্র ১৩০৬, প্রদীপ।

বহুদিন পূর্ব্বে 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' গ্রন্থেও পড়িয়াছিলাম, "রাধাবল্লভের কৃপায় চাটুয্যেরা ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়াছেন।" বঙ্কিম, তাঁহার সহোদরগণ ও পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই রাধাবল্লভের সেবায়েত ছিলেন এবং সকলেই প্রায় কেহ না কেহ নবাবী বা ইংরাজী আমলে রাজসরকারে উচ্চ চাকুরী লাভে সমর্থ হন। লর্ড্ উইলিয়াম্ বেন্টিঙ্ক সর্ব্বপ্রথম যে চারিজনকে ডেপুটি কালেকটারের পদ প্রদান করেন, তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র অন্যতম। অতঃপর যে তাঁহার চারি পুত্রও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। বলাবাহুল্য, তখন লোকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদটিকে খুবই সম্মানের চক্ষে দেখিত এবং চাটুয্যে বাড়ীর পাঁচ ছয়টি সন্তান এই পদের অধিকারী হওয়াতে পরিবারে অত্যন্ত গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পক্ষে আজ আর ইহার কোন গৌরব নাই। বাঙ্গালার জাতীয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে বক্ষে ধারণ করিয়া এই বাড়ীখানি যে অতুল গৌরবের অধিকারী হইয়াছে, তাহার কাছে পূর্ব্বোক্ত সম্মানের মূল্য খুবই অকিঞ্চিৎকর। তবে লোক-চক্ষে যেটুকু ছিল, তাহাও রাধাবল্লভের পদাশ্রয়ে বংশের পুণ্যের জোরেই সম্ভব হইয়াছিল।

কোন্ সময়ে যে কাঁটালপাড়ায় শ্রীশ্রী৺বিজয় রাধাবল্লভ ঠাকুরের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা হয় সে সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণের সুযোগ্য পুত্র বঙ্কিমজীবনী-রচয়িতা পূজনীয় শচীশচন্দ্র বলেন, ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে কাঁটালপাড়ায় রাধাবল্লভের শুভাগমন হয়। শচীশবাবু তাঁহার লিখিত বঙ্কিমজীবনীতে 'মির্জাফর', 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র', 'ইংরাজের ভারতব্যাপী রাজ্যের সূচনা' ও 'জটাজুটধারী সন্ন্যাসী' প্রভৃতি চমকপ্রদ বাক্য সংযোজনায় অতি মনোজ্ঞ ভাষায় গল্পটিকে হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন,

এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার বলিবার অধিকারও আছে, কিন্তু অন্যান্য কাগজ পত্র পড়িয়া গ্রন্থকারের প্রতীতি হইয়াছে যে ইতিহাসটি সম্ভবতঃ আরও পুরাতন! এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্রের পরম স্নেহাস্পদ ও সমসাময়িক "বঙ্গদর্শনের" অন্যতম লেখক, পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী নৈহাটি নিবাসী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত কিম্বদন্তীই সমধিক প্রচলিত বলিয়া মনে হয়। এ জন্য আমরা সেটিই প্রথমে উল্লেখ করিলাম :—

"প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কাঁটালপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র ঘোষাল ব্রাহ্মণের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন। ঘোষালের স্ত্রী ও দুইটি কন্যা। তিনি অতি দরিদ্র, তাঁহার দিনপাত হওয়া কঠিন ছিল। তথাপি তিনি সপরিবারে সন্ন্যাসীর যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিলেন। দৈবক্রমে সন্ন্যাসী তাঁহার বাটিতেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী আরোগ্যলাভ করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার সেবায় বড়ই সন্তুষ্টি লাভ করিলাম। আমার আর কিছুই নাই, এই রাধাবল্লভ বিগ্রহটি আমি তোমাকে দিয়া গেলাম, তুমি ইহার সেবা করিও।' ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'ঠাকুর আমারই দিন চলে না, অমি কি করিয়া বিগ্রহের সেবা করিব?' সন্নাসী কহিলেন, "আচ্ছা, আমি আসা পর্য্যন্ত যেরূপে পার চালাও, আমি আসিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা করিব।" কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া রাধাবল্লভের নামে একটি তালুক লিখিয়া দিলেন। ক্রমে ঘোষাল মহাশয় বেশ সম্পন্ন লোক হইয়া উঠিলেন। ফুলে ও বল্লভী মেলে দুইজন ভঙ্গ কুলীনের সঙ্গে দুইটি কন্যার বিবাহ দিলেন এবং জামাই-দিগকে রাধাবল্লভের সেবার ভার দিয়া পরলোকগমন করিলেন। এই এই ফুলে মেলে যে জামাই হইল—তাহারই বংশে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম।*"

*মানসী ১৩২১ বৈশাখ, পৃঃ ৩৪১ (কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ)

এই একরূপ কাহিনী, কিন্তু শচীশবাবু তাঁহার প্রণীত 'বঙ্কিম-জীবনী'তে প্রথম সংস্করণে গল্পটী এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"এমনই দিনে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে একদা অপরাহ্নে জনৈক জটাজুট-ধারী সন্ন্যাসী সশিষ্য কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অতিথিশালা নাই, সন্ন্যাসী বাধ্য হইয়া অর্জ্জুনার তটে বটচ্ছায়াতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। তাঁহার কাঁধের উপর একটি দীর্ঘ বিলম্বিত ঝুলি। ঝুলির ভিতর রাধাবল্লভজীউ ছিলেন। সন্ন্যাসী ঝুলিটি নামাইয়া তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন।

"বিশ্রামান্তে সন্ন্যাসী যখন ঝুলিটি তুলিতে গেলেন, তখন আর তুলিতে পারিলেন না। ক্ষুদ্র বিগ্রহ তুলিতে সন্ন্যাসীর সামর্থ্যে কুলাইল না। সন্ন্যাসী বুঝিলেন ঠাকুরের সেস্থানে থাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি তখন রঘুদেব ঘোষালকে ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুদেব তন্মুহূর্ত্তে স্বীকার পাইলেন। সন্ন্যাসী অর্জ্জুনার সন্নিকটে একস্থানে একখানি ক্ষুদ্র চালা তুলিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

"কয়েকমাস পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া রঘুদেবকে এক দানপত্র প্রদান করিলেন। দানপত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক রাধাবল্লভজীর বরাবর লিখিত। দানের সম্পত্তি সামান্য কয়েক বিঘা ভূমি মাত্র।"

এই গল্পটি শচীশবাবুর পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তিনি ইহার স্থানে তাঁহার পিতৃদেব লিখিত একটি কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "ব্রহ্মচারী প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, যে ঠাকুর পশ্চিমমুখী ছিলেন, সেই ঠাকুর পূর্ব্বমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন।"

শচীশচন্দ্র প্রথম সংস্করণের গল্পটী বোধহয় বঙ্কিমদৌহিত্র দিব্যেন্দু সুন্দর প্রদত্ত কাহিনী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। "সমালোচনী"

(১৩০৮—১৩০৯ প্রথম বর্ষ পৃঃ ২৭৫) মাসিক পত্রে দিব্যেন্দু বাবু বেশ সরসভাবে লিখিয়াছেন যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর সহ ঝুলি উঠাইতে না পারিয়া বলেন, "রঘুদেব ! বুঝতে পাচ্ছ—ব্যাপারখানা কি ? আমি ত অনেক দেশ—অনেক তীর্থ এই ঠাকুর লইয়া বেড়াইলাম। কোথাও এরূপ ঘটে নাই। বোধহয়, ঠাকুরের আর আমার কাছে থাকিবার সাধ নাই। আচ্ছা ঠাকুর ! তোমার যখন এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তখন এখানেই থাক।"

যাহা হউক, শচীশবাবু পরে ইহা বর্জ্জন করিয়া ভালই করিয়াছেন।

কিম্বদন্তী প্রায়ই রূপান্তরিত ও অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে। ভারতের তীর্থস্থান সমূহ পর্য্যটন করিলে আমরা অনেক সময়েই বহু কিম্বদন্তীর উপর আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি। এই সমুদয় কিম্বদন্তীর সত্যাসত্য অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু গল্পচ্ছলে উহা এতই রূপান্তরিত হইয়া থাকে যে, সত্য-উদ্ঘাটন অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়াই মনে হয় ! রাধাবল্লভের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও আমরা একাধিক আখ্যান পাই। তাহার কোনটিই বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তথাপি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে গল্পটি লিখিয়াছেন, নিকটস্থ শিক্ষিত মহলে প্রচলিত বলিয়া উহাই বেশী বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। তাহা হইলেও শচীশ বাবুর দ্বিতীয় বারে প্রদত্ত শ্যামাচরণ বাবুর কাহিনীটিকেও আমরা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারি না। শ্যামাচরণ বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাও ১১।১৪ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ, উপরন্তু বাড়ীর অনুষ্ঠানাদিতে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি যতটা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অন্য সহোদরগণের কেহই বোধহয় সেরূপ ছিলেন না। রাধাবল্লভ ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি সর্ব্বদাই সর্ব্বজনবিদিত ! বিশেষতঃ দুই একটী অলৌকিক বিষয় ব্যতীত শ্যামাচরণের অনেক কথাই কাগজ-পত্র দলিলের অনুরূপ।

আমরা এখন সেই সমস্ত কাগজপত্র, দলিল প্রভৃতি হইতে যে সঠিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব।

সন ১১০৮ সালে (ইংরাজী ১৭০১ খৃষ্টাব্দে) বন্দরপুর গ্রাম হইতে নারায়ণ ব্রহ্মচারী ও তাঁহার শিষ্য শ্রীশম্ভু ঘোষাল রাধাবল্লভ ঠাকুর সহ কাঁটালপাড়ার গ্রামে আসিয়া রাজ সরকারের তত্ত্বাবধানে সেখানে একটি দেবালয় স্থাপন করেন। প্রথম কয়েক বৎসর গুরু শিষ্যই বিগ্রহের সেবাকার্য্য চালাইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে নারায়ণ ব্রহ্মচারী পরলোক গমন করিলে একাকী শম্ভুর পক্ষে ঠাকুরের সেবা চালানো কষ্টকর হইয়া উঠিল। তখন নারায়ণ ব্রহ্মচারীর দুই সহোদর লক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ও বলরাম ব্রহ্মচারী রায়পুরের দেবালয়ের সেবায়েত ছিলেন। জ্যেষ্ঠের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাঁহারা কাঁটালপাড়ার দেবালয়ে চলিয়া আসিলেন, এবং তথায় বড় ব্রহ্মচারীর শ্রাদ্ধকার্য্য যথারীতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া বিগ্রহ ও তাঁহার সেবাকার্য্যের চমৎকার বিধি-ব্যবস্থা করেন। শম্ভু ঘোষালের অনুজ রঘুদেব ঘোষাল তাঁহাদের মন্ত্রশিষ্য হইয়া দেবসেবার ভার প্রাপ্ত হইল। ব্যবস্থা হইল, যে যে স্থানে বৃত্তি ধার্য্য করা ছিল তৎসমুদয়ের আয় হইতে বিগ্রহ ও দেবালয়ের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে। এই ব্যবস্থার পরে লক্ষ্মণ ঠাকুর রহিলেন, বলরাম চলিয়া গেলেন। দশ বৎসরকাল সেবাকার্য্য বেশ ভাল ভাবেই চলিল। সহসা ইতিমধ্যে একদিন মহাকাল আসিয়া মধ্যম ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণকেও আহ্বান করিয়া লইয়া গেল। মন্ত্রপ্রাপ্তির অধিকার সূত্রে রঘুদেবই তাঁহার উত্তর ক্রিয়াদি সমাপন করিলেন। এই আকস্মিক ঘটনার পরেও অবশ্য দেবসেবা-বিধির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—ছোট ব্রহ্মচারী বলরাম ঠাকুর আসিয়া শম্ভু ও রঘুকে কায়েমীভাবে সেবায়েত করিয়া গেলেন।

দশ বৎসর পরে আবার একদিন বলরামও সহসা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কাঁটালপাড়ায় সম্ভবতঃ রাধাবল্লভজীর সেবার ও শুশ্রূষার বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছিল, সে জন্য তিনি শিষ্য সমভিব্যাহারে রঘুদেবের কোন্নগরস্থ পৈতৃক বাটীতে সাময়িকভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলাবাহুল্য রাধাবল্লভজীও তাঁহাদের সঙ্গেই ছিলেন। আরোগ্যলাভ করিবার পরে রঘুদেব গুরুকে লইয়া কাঁটালপাড়া গিয়া আবার গুরু ও দেবসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু রঘুদেব অবিশ্রান্ত সেবায়ও গুরুদেবের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। অল্পদিন মধ্যেই বলরামকেও জ্যেষ্ঠদ্বয়ের অনুগামী হইয়া মহাপথ যাত্রা করিতে হইল। মৃত্যুকালে বলরাম ব্রহ্মচারীর একমাত্র সম্পত্তি রাধাবল্লভজী ও অন্যান্য দেবোত্তর সম্পত্তি সমস্তই দানসূত্রে রঘুদেবের হাতে আসিল।* মৃত্যুর পূর্ব্বে বলরাম তাহার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া যান। কাঁটালপাড়া নিবাসী পুরোহিত জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী এই দানের সাক্ষী ছিলেন।

সমস্ত বিধি ব্যবস্থা পাকাপাকি হইল বটে কিন্তু ইহার পরেই শত্রুর চক্রান্তে রঘুদেবের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্তরায়ের মূলে ছিল গ্রামস্থ কন্দর্প সিদ্ধান্ত ও গোপাল শর্ম্মা নামে দুই ব্যক্তি। ছোট ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই দুই ব্যক্তি অন্যায়ভাবে দাবী করিয়া বসিল, যে বলরাম ঠাকুর তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং রাধাবল্লভজীর সেবায়েতের পদে তাহাদেরই ন্যায্য অধিকার। নিরীহ রঘুদেব একান্ত

*শম্ভু ঘোষাল এ সময়ে জীবিত ছিলেন কিনা তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। কারণ, প্রধানতঃ যে দলিল হইতে এই কাহিনী গৃহীত হইয়াছে তাহাতে লক্ষ্মণ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর ও ঘোষাল ভ্রাতৃদ্বয়ের দেবোত্তর প্রাপ্তির পর আর তাহাতে শম্ভুর নামের কোন উল্লেখ নাই।

বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। কাঁটালপাড়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রকাণ্ড গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল। কিন্তু বেশীদূর উহা অগ্রসর হইতে পারে নাই। সম্ভবতঃ রঘুদেব উকিলের সহায়তায় অথবা স্বয়ং মুর্শিদাবাদের মহারাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। মহারাজের উকিল শুকদেব রায় তদন্ত করিয়া কন্দর্পসিদ্ধান্ত ও গোপাল শর্ম্মার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দেন। গ্রামবাসী সকলেই একযোগে সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছিল যে, রঘুদেব ঘোষালই রাধাবল্লভজীউর একমাত্র সেবায়েৎ। সেই হইতেই রাধাবল্লভ ঠাকুর কাঁটালপাড়ায় আছেন, আর রঘুদেবের বংশধরগণই উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার সেবায়েৎ হইয়াছেন।

আমাদের উক্তির সমর্থন-কল্পে দলিলখানি আমরা পাঠকের জ্ঞাতার্থ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ ঠাকুর

তথাদস্ত হকিয়ৎ নামা বে ঘোষালের............৺সেবার হকিয়ৎ কারণ মরশিদাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত মহারাজের উকিল শ্রীসুকদেব রায়ের লিখনানুসারে শ্রীরামসথ রামনাথ মজুমদারের ভাই শ্রীযাদু মজুমদারের সমীখ্যে আমরা গ্রামের সকলে এই সমাচার লিখিতেছি। সন ১১০৮ তারিখ ১৭ অগ্রহায়ণ প্রথম বন্দরপুর গ্রাম হইতে নারায়ণ ব্রহ্মচারী ও তাঁহার শিষ্য শ্রীশম্ভু ঘোষাল্ ৺সমেত কাঁটালপাড়া গ্রামে আসিয়া রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের অধিকারে কাঁটালপাড়া গ্রামের মধ্যে দেবালয় করিলেন। বৎসর কয়েক শ্রীশম্ভুঘোষাল সমেত সেবা চালাইলেন পশ্চাৎ নারায়ণ ব্রহ্মচারীর পরলোক হইলে পরে লক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ও বলরাম ব্রহ্মচারী দুই ভাই রায়পুরের দেবালয় হইতে এখানে কাঁটালপাড়ার দেবালয়ে আসিলেন। বড় ব্রহ্মচারীর শ্রাদ্ধ করিলে পরে শ্রীশম্ভু ঘোষালের অনুজ যে যে স্থানে বৃত্তি আছে সকল দিয়া শ্রীশ্রী৺সেবাতে নিযুক্ত করিলেন। ঘোষাল মহাশয় সর্ব্বত্রের বৃত্তিবিধান লইয়া দেবালয়ের সেবা চালান। ইহার মধ্যে বৎসর দশ বাদে মধ্যম লক্ষ্মণ

ব্রহ্মচারীর পরলোক হইল। উত্তর ক্রিয়াদি শ্রীরঘুদেব ঘোষাল করিলেন। তৎপশ্চাৎ বলরাম ব্রহ্মচারী ঘোষালদিগের দুই ভাইকে পূর্ব্বরূপ সমস্ত সমর্পণ করিলেন। তদনুসারে ঘোষাল সেবা চালাইতেছেন। পরে বৎসর দশ বাদে বলরাম ব্রহ্মচারী অসুস্থ হইয়া শ্যান্তির কারণ ঘোষাল ও শ্রীশ্রী৺সমেত কোন্নগর গ্রামে শ্রীরঘুদেব ঘোষালের বাটীতে গেলেন। পরে দিবস কয়েক বাদে ব্রহ্মচারীর পুরোহিত শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী সাং কাঁটালপাড়া কোন্নগরে বলরাম ব্রহ্মচারীকে দেখা ও তদ্বার্ত্তা করিতে যাইলেন। পুনশ্চ দিবস কয়েক বাদে চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানে আসিয়া আমাদিগের সকলকে কহিলেন যে ছোট ব্রহ্মচারী শ্রীরঘুদেব ঘোষালকে পূর্ব্বরূপ এমত বৃত্তি বিধান দ্রব্য এমত যে যে স্থানে আছে এবং শ্রীশ্রী৺সেবাতে মকরর ছিলেন সেইরূপ বলরামও লিখিয়া দিলেন। আমার সমক্ষে শুদ্ধাচার ব্রহ্মচারীর পরলোক হইল, উত্তর ক্রিয়াদি ঘোষাল করিলেন। কন্দর্প সিদ্ধান্ত ও গোপাল শর্ম্মা দুইজন আচম্বিতে মিথ্যা বিরোধী হইয়া শ্রীশ্রী৺সেবার ধ্বংস করেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীরা বর্ত্তমান কন্দর্পসিদ্ধান্ত ও গোপাল শর্ম্মা এই দুইজনকে ৺সেবা করিতে দেখি নাই এবং কন্দর্পসিদ্ধান্ত ও গোপাল শর্ম্মা শিষ্য নন। আমরা ঘোষাল বই আর কাহারও সেবায়েৎকারীকে জানি না।

ইতি সন ১১৩৮ তাং ১লা পৌষ।

ইসাদি সাং কাঁঠালপাড়ায়

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ	শ্রীপ্রাণবল্লভ শর্ম্মণঃ	শ্রীলোকনাথ শর্ম্মণঃ
শ্রীরামনারায়ণ সেন বৈদ্য	শ্রীদাতারাম নাগ	শ্রীনন্দরাম মণ্ডল
শ্রীশ্যামসুন্দর শর্ম্মণঃ	শ্রীমনোহর শর্ম্মণঃ	শ্রীশিবরাম শর্ম্মণঃ
		শ্রীরামেশ্বর মালি
শ্রীকৃষ্ণরাম শর্ম্মণঃ	শ্রীরামনাথ শর্ম্মণঃ	
শ্রীখেলারাম পাটারী	শ্রীনন্দরাম ঘোষাল	

সাং ভাটপাড়া

শ্রীবীরেশ্বর শর্ম্মণঃ	শ্রীবাণেশ্বর শর্ম্মণঃ	শ্রীরাজারাম শর্ম্মণঃ
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ শর্ম্মা	শ্রীনন্দদুলাল শর্ম্মা	

সাং নৈহাটী

শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষাল	শ্রীরাজবল্লভ ঘোষাল	শ্রীরামকান্ত ঘোষাল
শ্রীবিষ্ণুরাম ঘোষাল	শ্রীশ্রীমহল দেবশর্ম্মণঃ	

শ্রীদুর্গারাম ঘোষাল শর্ম্মা
শ্রীরাম রাম ঘোষাল

এই দলিল হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, দান সম্বন্ধীয় উক্ত পত্র ইংরাজী ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু দান হইয়াছিল ইহারও বহুপূর্ব্বে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণনানুযায়ী রাধাবল্লভের ইতিহাস তিনশত বৎসরের অধিক প্রচলিত, ইহা কিয়দংশে অত্যুক্তি হইলেও, সত্যমূলক এই কাহিনী যে দুইশত বৎসরের উপর হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত দানকার্য্যের পরে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে শ্রীকেশব দাস, মনোহর দাস ও রঘুনাথ দাস নামীয় তিন ব্যক্তি যে আরও একখানি দানপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা মুড়াগাছা পরগণার লক্ষ্মণপুর ও দোগাছা মৌজা যে দেবোত্তর বলিয়া রঘুদেবকে দান করা হইয়াছে, জানিতে পারিতেছি। আমরা এই পত্রখানিও প্রকাশ করিলাম। এই কেশব ব্রহ্মচারীর দানই এই পরিবারের ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্তির প্রচলিত কাহিনী। অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন যে, কেশব ব্রহ্মচারী দানের বহুপূর্ব্বেই বলরাম রঘুদেবকে রাধাবল্লভ

এবং দেবালয় দান করিয়া গিয়াছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পরগণাদিও দেবোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন।

দানপত্রটীর লিখনবিধি এইরূপঃ—

বলরাম ও ৺বিজয় রাধাবল্লভ ঠাকুর

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রঘুদেব ঘোষাল চরণেষু

পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে ৺ব্রহ্মচারী গোসাঁইরা ক্রমে তিন ভাই বর্ত্তমানে তুমি শিষ্য শ্রীশ্রী৺সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেবালয় বৃত্তি, ভূমিবৃত্তি ও নগদবৃত্তি যে যে খাস তাহাদিগের ছিল সে সব ধন তোমায় লিখিয়া দিয়াছেন। তাহাদের পরলোক হইলে তুমি সর্ব্বত্র দখলিকার হইয়া সেবা করিতেছ। অতএব পরগণা মুড়াগাছা মৌজা দোগাছা ও লক্ষ্মণপুর দেবোত্তর আছে তাহার মধ্যে মালগুজারী দোগাছি পঞ্চান্ন টাকা ছয় আনা লক্ষ্মণপুর ১৩৸০ একুণে ৬৯৶০ যে যে তরফের সেইখানে মালগুজারী করিবেন তাহা সেওয়ায় গ্রাম হাসমাগুর চণ্ডাল সংলগ্ন হাসিল পতিত জঙ্গল দেবোত্তর আছে আর পরগণা দেবোত্তর বৃত্তিভূমি যে আছে তোমাকে দিলাম। আবাদ জঙ্গল করিয়া শ্রীশ্রী৺সেবা করিবেন। এতদর্থে পত্র দিলাম। সন ১১৩৭, ১লা ফাল্গুন।

ইহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত (১১৭০ সাল ইং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ) অন্যান্য দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি রঘুদেবের অধিকারে আসিতে থাকে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, রঘুদেব ঘোষাল মহাশয় দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। রঘুদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার দৌহিত্র রামহরি (জামাতা রামজীবনের পুত্র)। এই রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের এক পৌত্রের নাম যাদবচন্দ্র এবং এই যাদবচন্দ্রেরই অন্যতম পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের এই গ্রন্থের নায়ক।

বহু পূর্ব্ব হইতেই যে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুর কাঁটালপাড়ায় অধিষ্ঠিত আছেন, অনেক পারসী ও উর্দ্দু দলিলেও তাহা উল্লিখিত আছে।

এই সব দলিলগুলি বঙ্কিমের কনিষ্ঠ স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র রক্ষা করিয়াছিলেন। একখানি দলিল সম্রাট মহম্মদ শাহের সময়কার। তাহাতে পরওয়ানা স্বরূপ সকলকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে বহুদিন হইতে দোগাছি ও লক্ষ্মণপুর পরগণা যে রঘুদেব ঘোষালের দখলে আছে, তাহা হইতে তাঁহাকে যেন কেহ বাধা না দেয় বা বঞ্চিত না করে। ১১৪৭ সালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কাজী খাজা জইনুদ্দিন এই হুকুমনামা দিয়াছিলেন। উহার বহু পূর্ব্ব হইতেই উক্ত পরগণাদ্বয় দেবসেবায় প্রদত্ত হইয়াছিল এবং তাহা যে খুব পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নে বাঙ্গালা এবারত করিয়া দলিলখানি প্রদান করিলাম ঃ—

"চুঁ পরগণা দরমা পরগণা হাবেলিসহর ও পরগণা মুড়াগাছা ও পরগণা আম্বওয়া ওগয়রাহ বেদানন্দ চুঁ বলরাম ব্রহ্মচারী সাং মৌজে কাঁটালপাড়া মোতালকা পরগণা হাবেলিসহর রঘু ঘোষাল নাম সেবক লক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী বেরাদর কাঁলা গুঁদরা জানসিন খোদ মুকরর নামোদা তফ্‌বিজনামা রাধাবল্লভ মূলরাম ও নন্দরাম ঠাকুর রাজাসেওয়া ও দরোবস্তখানা বাড়ী ওগয়রা দেবত্তর ও বরহমুরর পরগণা হাবেলিসহর ও মৌজে দোগাছি ও লক্ষ্মণপুর দেওবর মুতালকা পরগণা মুড়াগাছা ওয়াজাবাজা বরহমু ররবরদ পরগণা মজকুর ওববত পরগণা আমোয়াৎ ওগয়রা ওজিরগিরি সাহাদির ওয়ারিয়া বামোহরকাজী নবিস্তাদাদা কোয়ওকরদা শাঁরা কলমি মিগরদদ্‌ আহদে হিচওয়াজা মোজাহেম্‌দ এহোয়ান ঘোষাল মজকুদ নাম্নমায়েৎ তা মুসিয়েলেহ মোয়াফিক্‌ নবিস্তা বহমমবারী মজকুর বা আমল আবুর্দা বাসাদ দরসাৎ তাকীদ ওয়াবিস্তা হাসবুল মসতুর বা আমল আরন্দ ফিরতারীখ ওন জমাদি লাওয়ল, সন ১১, জলুস।"

এই রঘুদেব ঘোষাল নিজেও একজন কৃতী ও উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। দানলাভ ভিন্ন উপার্জ্জনের দ্বারাও তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁহার কেমন যেন একটা ঔদাসীন্য ছিল, তাই উপার্জ্জন ও দান হইতে যাহা কিছু

পাইতেন তাহার অধিক পরিমাণই রাধাবল্লভের সেবায় ব্যয়িত হইত।

রাধাবল্লভের কৃপায় সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া রঘুদেব রাধাবল্লভের একটি সুন্দর ত্রিতল দেউল নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। এই মন্দির-গাত্র নানা কারুকার্য্যে খোদাই করা হয়। সেরূপ সুন্দর ও সমুন্নত সৌধ সে সময়ে দক্ষিণ বঙ্গের অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হইত না। মন্দিরের গায়ে এক জায়গায় লেখা ছিল—

"বাণসপ্ত কলাশকে
রঘুদেবেন মন্দিরম্।"

অর্থাৎ মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল ১৬৭৫ শকে। এখন ১৮৬৬ শক, সুতরাং মন্দিরটীই প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু সেই উন্নতকায় বিষ্ণু মন্দিরের চিহ্ন এখন নাই। এখন যে মন্দির দেখা যায় তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র ১২৫৭ সালে (ইং ১৮৫০) তৈয়ার করাইয়াছিলেন। রঘুদেব সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরই শিষ্য, এবং তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায়ই জীবন যাপন করিতেন, কিন্তু রাধাবল্লভের সেবায়েত নিযুক্ত হইবার কালে তাঁহাকে গুরুর আদেশেই দারপরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। রঘুদেবের কোন পুত্র সন্তান নাই তাঁহার তিনটি কন্যা ছিলেন। সন্তান-ভাগ্য সম্বন্ধেও রঘুদেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। রঘুদেবের ন্যায় তিনিও অপুত্রক ছিলেন, তাঁহারও তিনটি কন্যা জন্মে, এবং রঘুদেবের কনিষ্ঠা কন্যার ন্যায় তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যারও কোন পুত্রসন্তানাদি হয় নাই। প্রকৃতিতেও বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটা রঘুদেবেরই মত ছিলেন। তাই অনেকে মনে করিতেন, রঘুদেবই যেন আবার বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন।

রাধাবল্লভের মন্দির, বিগ্রহ ও তাঁহার সেবা সম্বন্ধে একাধিক ঐতিহাসিক ও লেখক অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের

মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে বর্ণনাত্মক বিবরণটি দিয়াছেন তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক। এখানে একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে। খুব জাঁকালো নিত্য ভোগ হয়। রোজ দশ সের চাল রাঁধা হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি, মুড়াগাছা পরগণায় রাধাবল্লভের বড় একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হ'তে তাঁহার সেবা চলে। অনেক গরীব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়।"*

বস্তুতঃ এই রাধাবল্লভের সেবা এত জাঁকালো ছিল যে বঙ্কিম-লেখনী স্বরচিত উপন্যাসের অন্তরালে পর্য্যন্ত তাহার বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হয় নাই। বঙ্কিমের ভ্রাতুষ্পুত্র সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র সাহিত্যরত্ন জ্যোতিষচন্দ্র বলিতেন, "বিষবৃক্ষের সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্র দত্তের ঠাকুর বাড়ীর যে বর্ণনা আছে, এই রাধাবল্লভের শ্রীমন্দিরের নিত্য ব্যাপারের ছায়াপাত তাহাতে বেশ একটু আছে।"† নগেন্দ্রের বৈঠকখানা, পূজার দালান, ঠাকুর দালান, অন্দর মহল প্রভৃতির ছবি যে রাধাবল্লভের মন্দির ও চাটুয্যে বাড়ীরই ছায়া, তাহা নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর বর্ণনা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

"এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা।.........ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বার রক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম 'কাছারী বাড়ী'। উহার পার্শ্বে "পূজার বাড়ী"। পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার

*নারায়ণ—১৩২২ বৈশাখ (বঙ্কিমস্মৃতিসংখ্যা) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়" শীর্ষক প্রবন্ধ।

† ব্রহ্মবিদ্যা ১৩৩৪, ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা—পৃ ৩৪।

দালান; আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চক বা চত্বর। মধ্যে বড় উঠান। এ মহলে কেহ বাস করেনা। দুর্গোৎসবের সময় বড় ধুমধাম হয়, কিন্তু এই উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান, দরদালান, পায়রায় পূরিয়া উঠিয়াছে। কুঠারী সকল আসবাবে ভরা—চাবি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুর বাড়ী—সেখানে বিচিত্র দেব মন্দির, সুন্দর প্রস্তর বিশিষ্ট "নাটমন্দির"। তিনপাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারীদিগের থাকিবার ঘর এবং অতিথি-শালা। সে মহলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা, চন্দনতিলক বিশিষ্ট পূজারীর দল, পাচকের দল; কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক করিতেছে। দাসদাসীরা কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সহিত কলহ করিতেছে। অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া দিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও ঊর্দ্ধবাহু এক হাত উচ্চ করিয়া দত্তবাড়ীর দাসী মহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছে। কোথাও শ্বেত শ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষমালা দুলাইয়া নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ককণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক কাটিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে। মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে এবং নাসিকা দোলাইয়া, "কথা কইতে যে পেলেম না—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে পেলেম না" বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও বৈষ্ণবীরা বৈরাগিরঞ্জন রসকলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে তালে "মধো কানের' কি "গোবিন্দ অধিকারীর" গীত গায়িতেছে। কোথাও কিশোর বয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্দ্ধ বয়সী

বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে। নাটমন্দিরের মাঝখানে পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা লড়াই, ঝগড়া, মারামারি করিতেছে এবং পরস্পর মাতাপিতার উদ্দেশে নানাপ্রকার সুসভ্য গালাগালি করিতেছে। এই তিন মহল সদর, এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর।"

বঙ্কিম-বর্ণিত নগেন্দ্র দত্তের পূজার দালান ও ঠাকুর বাড়ীর বর্ণনা কাঁটালপাড়ার রাধাবল্লভের বাড়ী সম্বন্ধে যে অতিরঞ্জিত উক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, পাঠক এখনও সে চিত্র স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে পারেন। বিশেষতঃ "নবজীবন" সম্পাদক সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এ সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা হইতেও উহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছেন—

"আমাদের ওপারে রায়বাহাদুরের বাড়ী ছিল যাত্রাগান ও মহোৎসবের মিলন মন্দির—এতদঞ্চলের একরূপ টাউনহল। পালা-পার্ব্বণ তো ফাঁক যাইবেই না, অন্য সময়েও উৎসব আছে। দুর্গোৎসবে কৃষ্ণনগর ঘুর্ণির উৎকৃষ্ট শশী পাল ঠাকুর গড়িবে। উৎকৃষ্ট চিত্রকর চুঁচুড়ার মহেশ ও বীরচাঁদ সূত্রধর চিত্র করিবে। প্রতিমা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। জগমোহন স্বর্ণকারের চণ্ডীর গানে উচ্চ কণ্ঠে 'মা' 'মা' রবের মোহিনী শক্তি, অথবা নীলকমলের প্রসিদ্ধ রামায়ণ গান। যাত্রার সঙ্গে মদন অধিকারীর তুক্কো বা গোবিন্দ অধিকারীর কালীয়দমন গান; দাশরথি রায়ের কথার ছটা-ঘটা, সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়ির সুরে তালে মাখামাখি গান; ফরাসডাঙ্গার জগৎমোহিনী ঢপ; বর্দ্ধমানের সহচরী ও যাদুমণির কীর্ত্তন; মধুকানের গান—এইরূপ ছোট-বড়-মাঝারি কত গানই প্রায়ই হইত। এক ধরণীর কথকতাই ক্রমাগত তিনমাস চলিয়াছে। এ সকলের কত পরিচয় দিব। আর তাঁহার ভবনে প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভজীউ ও তাঁহার নিত্য সেবার কথা

কত বলিব ? বঙ্কিমের বাল্যাবস্থায় এই বিগ্রহের ও অতিথি সেবার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। এখনও অনেকটা আছে।"*

পালাপার্ব্বণ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও একটি সুন্দর চিত্তাকর্ষক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে চাটুয্যে পরিবারের ঠাকুরবাড়ীর ও তৎসংক্রান্ত পূজা-পার্ব্বণাদির, আমোদ প্রমোদ ও মেলা এবং রঙবেরঙের তামাসা প্রভৃতির একটি সুন্দর ও সুস্পষ্ট আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে।*

রাধাবল্লভের রথ হইত, দোল হইত, বার মাসে তের পর্ব্ব হইয়াও অন্যান্য অবশিষ্ট পর্ব্বগুলি পর্য্যন্ত বাদ যাইত না। বাড়ীর সম্মুখেই দক্ষিণ দিকে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা নাটমন্দির। সেখানে একাদিক্রমে অনেকদিন পর্য্যন্ত বেশ জমাট ভাবে সুন্দর কথকতাও হইত। শাস্ত্রী মহাশয় নিজেও শিশু বয়সে তাঁর টোলের পণ্ডিতের সহিত এই সবে মাঝে মাঝে যোগদান করিতেন। একবার চাটুয্যে বাড়ীতে ধরণী কথকের কথকতা হইয়াছিল, শাস্ত্রী মহাশয়ের সেই ব্যাপারটা বরাবর বেশ মনে ছিল। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যায় আসর গমগম্ করিত, কিন্তু গণ্ডগোল হইত না। আসরে বঙ্কিমচন্দ্রেরা চারি ভাই উপস্থিত থাকিতেন। মুগ্ধ নীরবতার মধ্যে কথা চলিত, আসরের সকলেই স্থির অচঞ্চল— কেবল কথকঠাকুরের বাণী ও মাঝে মাঝে লোকেদের 'বাহবা বাহবা বেশ' প্রভৃতি ধ্বনিতে এক এক সময় সেই নীরবতায় ছেদ পড়িত। শাস্ত্রী মহাশয় তখন শিশুজনিত অজ্ঞতার জন্য কথকতার বিষয় বিশেষ বুঝিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু কথা যে বেশ জমিত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে কাহারও বিশেষ কষ্ট হইত না।

*নব পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন'—১৩১৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা "বঙ্কিম শীর্ষক প্রবন্ধ"

সর্ব্বাপেক্ষা জাঁকালো হইত রথের ব্যাপারটি। বহুপূর্ব্ব হইতে রথ ছিল কাঠের। এখন সেটি পিতলের তৈয়ারী। † কাঁটালপাড়ায় গেলে রাধাবল্লভের মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এখনও উহা পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও সেই রথই টানা হয়।

†রথখানি আগাগোড়া পিতলের তৈয়ারী নয়—প্রকৃতপক্ষে উহা কাষ্ঠনির্ম্মিত। কাঠের রথ হিসাবেই লোকে প্রথমে ইহাকে জানিত—পরে পিতলের পাত মোড়াই করা হয়। রথখানি প্রস্তুত হইয়াছিল তমলুকে। বঙ্কিমের জ্যেষ্ঠ সহোদর যখন তমলুকের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন তিনি ঐ রথটি তৈয়ারী করাইয়া নৌকাযোগে রূপনারায়ণ ও গঙ্গা বাহিয়া কাঁটালপাড়ায় পাঠাইয়া দেন। তথাকার গঙ্গার ঘাটে রথসহ নৌকা আসিয়া পৌছিলে ধূমধামের সহিত সেই রথ শ্রীমন্দিরের সমীপস্থ করা হয়। তখন রথের লৌহনির্ম্মিত ঠাট মাত্র তৈয়ারী হইয়াছিল। তমলুকের কারিগরেরা কাঁটালপাড়ায় আসিয়া রথের উপর পিতলের পাত মোড়াই করিয়া দেয়। তৎপরে শ্যামাচরণ রথযাত্রার দিনে পিতৃদেবের দ্বারা সে রথের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন। রথখানির মাঝের চূড়ার তলদেশে একটি পিতল-ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লেখা আছে :—

বেদবস্বশ্ব ভূমানে শকে সংস্থাপিতঃ।

তখন ১৭৮৪ শক চলিতেছিল অর্থাৎ বাঙ্গলা ১২৬৯ সাল ও ইং ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ। এই বৎসরেই রথটি প্রথম চলে। এই রথযাত্রার দিনই শ্যামাচরণ যাদবচন্দ্রকে দিয়া নবনির্ম্মিত পঞ্চরত্ন মন্দিরে এক শিব প্রতিষ্ঠা করান।

শিবঃ সমন্দিরো যাদবেশ নাম যাদব শর্ম্মনা

যাদবচন্দ্র কর্ত্তৃক একটি পুষ্করিণীও সেই দিনেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশের বহু কেন্দ্র হইতে বহু নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ এই সেবার কার্য্যে মিলিত হইয়াছিলেন।··· ভারতবর্ষে রেল ব্যবসায়ের ইতিহাসেও এই দিনটি অত্যন্ত স্মরণীয়। কারণ এই দিবসেই প্রথম ই-বি-রেলওয়ে নৈহাটীর পথে চালিত হয়। রেলওয়ে 'নৈহাটী' ষ্টেশনটি এই রথ তলার অতি সন্নিকটে।

আজও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় প্রতি রথযাত্রা তিথিতে এই রথযাত্রার একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

রাধাবল্লভের রথ

ইহার উত্তর দিকে যাদব চট্টোপাধ্যায়ের বাটী। পূর্ব্বদিকের একতলায় বড় বৈঠকখানায় পূর্ব্বে চারি ভ্রাতা বসিতেন। আর একটী ছোট বৈঠকখানাও আছে। দোতলার যে অংশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বঙ্কিম থাকিতেন।

বছরের সকল সময়েই রথখানি পূর্ব্বে গোলপাতা ছাউনিতে রাখিয়া দেওয়া হইত। মন্দিরের সাম্‌নে যে গুঞ্জঘর ও নাটমন্দির তাহার দক্ষিণ দিকে অনেকটা খোলা জমি আছে, সেখানে নয়দিনব্যাপী প্রকাণ্ড একটা মেলা বসিত।* মেলার বিষদ বিবরণ দিতে গিয়া আমরা পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহিনা, তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ণাঙ্গ একটা মেলায় যাহা কিছু আবশ্যক, রাধাবল্লভের রথের মেলায় তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। তেলেভাজা ও ঘিয়েভাজা খাবারের দোকান হইতে সুরু করিয়া নানাবিধ মনোহারী জিনিষ এবং গাছের কলমের দোকান পর্য্যন্ত থাকিত। টানের দুইদিন 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'এর একটা খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। ঐ দুদিনই লোকের ভিড় হইত খুব বেশী—মাঝের সাত দিনও জনতা কম হইত না।

মেলায় দৈনন্দিন স্মারকলিপির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণের বস্তুটি ছিল পুতুল নাচ। প্রকাণ্ড একটা দোচালার মধ্যে এই পুত্তলিকা-অভিনয় হইত। অভিনয়ের বিষয়বস্তু অধিকাংশই পুরাণ হইতে গৃহীত;— সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন এই সব। উপরন্তু মামলার একটা সঙ্‌ও ছিল। উচ্চ আসনে জজ সাহেব বসিয়া আছেন—চারিপার্শ্বে পেস্কার, উকীল ও পেয়াদা প্রভৃতি; কাঠগড়ায় আসামী গম্ভীর মুখে দণ্ডায়মান। মোকদ্দমা আরম্ভ হইল, জবানবন্দী হইল; জজ সাহেব রায় দিলেন—ফাঁসীর হুকুম। শেষকালে ফাঁসীও হইল। এই সময় ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিতে ঝুলিতে আসামীর কাপড়ের ভিতর হইতে যে একরকম পদার্থ বাহির হইত, দেখিয়া ছেলের দল হাসিয়া খুন হইত। আরও অনেক রকমের সঙ ছিল—আহ্লাদে পুতুল। সব সময় তাহার মুখে একগাল হাসি লাগিয়াই আছে।

* এই জমি এখন রেলওয়ে কোম্পানী অধিকার করিয়াছে।

শ্রীমন্দিরের বাহিরে আটচালা মন্দিরের পূর্ব্বদিকেই গুঞ্জবাড়ী।* গুঞ্জবাড়ীতে রথের সময় বিগ্রহকে লইয়া যাওয়া হইত।

রাধাবল্লভের গুঞ্জবাড়ী ছিল একখানি বড় পাঁচচালা ঘর। ঠাকুর সেখানে রথের সময়ে নয়দিন অবস্থান করিতেন। †† দিনের বেলায় পুরুষেরা আসিয়া বিগ্রহ দর্শন করিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রে তাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না; একমাত্র শিশু রমণীগণের ঠাকুর দেখিবার অনুমতি মিলিত।

রথযাত্রা উপলক্ষে রাধাবল্লভ ঠাকুরকে নানা রঙের অনেক বিচিত্র বিচিত্র চমৎকার পোষাক পরানো হইত। বিগ্রহের পরিধেয় দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যাইত। রাধাবল্লভের পূজারী নীলমণি ঠাকুর একজন নামকরা বেশকার ছিলেন। কৃষ্ণকালী, কলঙ্কভঞ্জন, কালীয়দমন, গোষ্ঠবিহার, বস্ত্রহরণ, রাসলীলা, রাধিকারাজা, রামপূজা, "সত্যভামার তুলাব্রত," নৌকাবিহার, প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ সাজ পুরাণাদি বর্ণিত লীলাবিশেষ অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হইত। তা'ছাড়া ফুলের গহনা, ফুলের মুকুট, ফুলের সাজেরও ব্যবস্থা ছিল। বৈষ্ণব ভক্তেরা বিগ্রহের এই সমস্ত সাজ দেখিয়া ভক্তি-গদ-গদ কণ্ঠে বলিত, 'মরি মরি! বেটাকে যে সাজেই সাজাও, তাতেই শোভা করে!'

বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরের এই বিভিন্ন বেশ দেখিতে বন্ধুদের সহিত গুঞ্জঘরে আসিতেন এবং যৌবনাবস্থায়ও এই সমস্ত সাজ দেখিয়া

---

* গুঞ্জবাড়ীর প্রথাটি বাঙ্গালীরা পুরীর অধিবাসীদের হইতে ধার করিয়াছে। গুঞ্জ শব্দ তামিল 'গুণ্ডিচা'র অপভ্রংশ—ইহার অর্থ কুঁড়ে ঘর।

†† আটচালা, গুঞ্জবাড়ী, গোষ্ঠপিঁড়ি এখনও আছে। গুঞ্জঘরের দক্ষিণে একটী বকুল গাছের পার্শ্বেই পাকা ভিত আছে। গোষ্ঠের সময়ে ঠাকুরকে সেখানে আনা হয়। বকুল গাছটী এখন শুষ্ক, পত্রহীন।

গুঞ্জাঘর
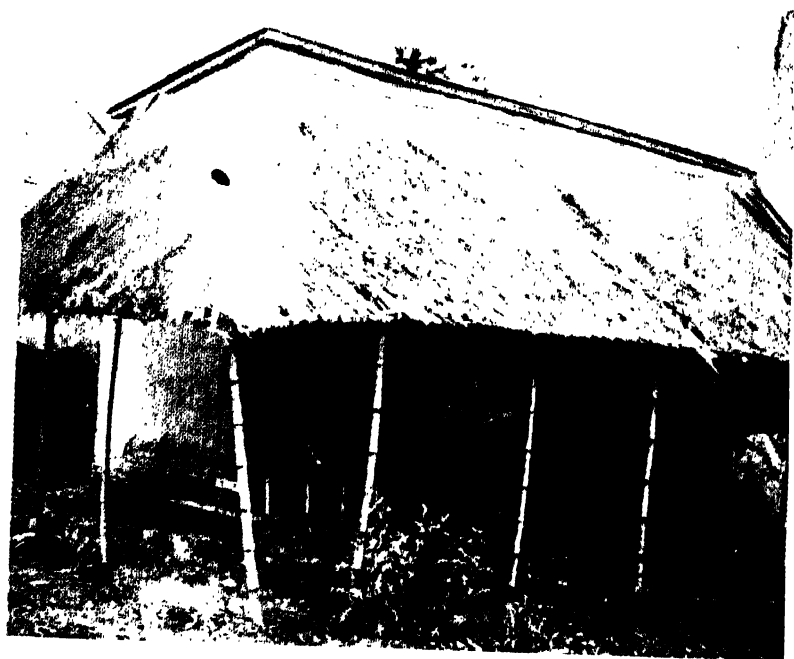
ইটের ঘর ও ছাদ্। চারিদিকে চারিখানি ছনের চালা। রথের সময় ঠাকুরকে নয় দিনে নয় রকম বেশ পরান হয়। ইহার পশ্চিমে আটচালা এবং পিছনে ঠাকুরের ভোগের ঘর।

আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। একবার এই সময় তিনি বেশকারকে বলিয়াছিলেন ঃ—

'দেখো নীলমণি, আমাদের এমন সুন্দর ঠাকুরটিকে যেন সাজাতে গিয়ে ভেঙ্গো না।'

এই সমস্ত সাজ বঙ্কিমের হৃদয়ে এতই রেখাপাত করিয়াছিল যে, সত্যভামার তুলাব্রতের সাজের চিত্রটি তিনি তাঁহার 'বিষবৃক্ষের' নায়িকা সূর্য্যমুখীর চিত্রগৃহে সন্নিবেশিত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। "বিষবৃক্ষে"র 'স্তিমিত প্রদীপ' অধ্যায়ে একটী দৃশ্যাবতরণ হইয়াছে, যে তুলাদণ্ডের একদিকে প্রৌঢ় বয়স্ক শ্রীকৃষ্ণ অপর দিকে নানারত্নাদিসহ সুবর্ণরাশি ; কিন্তু যে দিকে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন তাহাই ভূমি স্পর্শ করিতেছে, আর সত্যভামার মুখ বিষণ্ণ। এই চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন—"যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। স্বামীর সঙ্গে সোণা রূপার তুলনা !"

এইতো গেল আনন্দের ও শিল্পানুরাগের কথা। ভক্তির হিসাবেও পূর্ব্বেই বলিয়াছি চাটুয্যেরা মনে করিতেন, "রাধাবল্লভ ঠাকুর আমাদের সাক্ষাৎ নারায়ণ।" গৃহদেবতার প্রতি চাটুয্যে বংশের ও দেশের যাবতীয় পরিবারের ভক্তি এতই প্রখর ছিল যে এ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী লোকমুখে রচিত হইয়া গিয়াছে। এই ধরণের কাহিনীগুলি সাধারণতঃ অলৌকিক ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত, তাহা সত্যই প্রকৃত। গল্পটী এইরূপ ঃ

পত্নীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ যাদবচন্দ্র একবার তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, বৃন্দাবন আর জয়পুরে গোবিন্দ দর্শনই তাঁহার প্রধান কাম্য ছিল। স্বকামনা পূর্ণ করিতে তিনি প্রথমে বৃন্দাবনে মন্দিরে আসিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। বৃন্দাবনের গোবিন্দের তিনি

দর্শন পাইলেন না। প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় তিনি দেখিলেন যে তাঁহাদের মন্দিরেরই রাধাবল্লভ ঠাকুর বৃন্দাবনের ঠাকুরকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—

"তুমি এখানে আসিয়াছ আমাকে দেখিতে? আমি কি সেখানে নাই?"

বিস্ময়ে শঙ্কায় বৃদ্ধ যাদবচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। আর এক দিবসও তিনি বৃন্দাবনে রহিলেন না, সেই দিনই তীর্থদর্শন-বাসনা ত্যাগ করিয়া অনতিকাল মধ্যে কাঁটালপাড়ায় ফিরিয়া আসিয়া রাধাবল্লভের প্রাঙ্গণে লুটাইয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর, আমি তোমায় ছেড়ে কেন গিয়েছিলাম? তুমিই তো আমার সব!" এই ঘটনার পর কাঁটালপাড়া ছাড়িয়া আর কখনও তিনি কোথাও যান নাই। গঙ্গাযাত্রার পূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী ভাগীরথি তীরে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে বাহিরে আনয়ন করাও প্রথমে সকলের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

পেন্‌সন্ লইয়া গৃহে অবস্থানকালে যাদবচন্দ্র নিয়তই পূজার দালানে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া প্রায় সর্ব্বদাই ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক প্রভৃতির সহিত শাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু তাঁহার বসিবার স্থানের একটা বিশেষত্ব ছিল। পূজার দালানের পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালে তাঁহার ইচ্ছামত একটা জানালা বসান হইয়াছিল। পাঠক কাঁটালপাড়া দর্শন করিয়া এই জানালাটা দেখিয়া আসিবার কথাও ভুলিবেন না। প্রেমিক যাদবচন্দ্র কখনও তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে চোখের আড়াল করিতে চাহিতেন না। সেই জন্যই যেন তিনি পূর্ব্বদিকের জানালাটার সাহায্যে তাঁহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতেন—

"অবিরত অভিমত, আদর যত মত
দগ দগ করয়ে পীরীত"।

রাধাবল্লভ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকীয় সংস্কার কিরূপ ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই রাধাবল্লভের নাম হইলেই প্রাপ্ত বয়সেও বঙ্কিম কিরূপ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিতেন এই সম্বন্ধে একটী অলৌকিক অথচ সত্য ঘটনা উল্লেখ করিব। আনুমানিক ১৮৭৭ কি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে একবার একটি সুবর্ণ বণিক শ্রেণীর প্রৌঢ়া মহিলা রথের সময় রাধাবল্লভ দর্শন করিতে আসেন। প্রথামত ঠাকুরকে সেই দিন খুব ঘটা করিয়া সাজানো হইয়াছিল। ঠাকুর ছিলেন গুঞ্জ ঘরে। সকলেই ঠাকুর দেখিয়া মুগ্ধ ও অভিভূত হইতেছিল, কিন্তু মহিলাটি সম্বন্ধে হইল এক অঘটন ব্যাপার। গুঞ্জ ঘরের দ্বারে আসিয়া মহিলাটি রাধাবল্লভকে চোখে দেখিতে পাইলেন না। ব্যাপারটির মধ্যে কাহারও কোন কৌশল কিছুই ছিল না—মহিলাটীর দৃষ্টিশক্তিও বেশ প্রখর ছিল, উপরন্তু বিগ্রহ ও তাহার মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ৩।৪ হাতের। কিন্তু তথাপি সে দেখিতে পাইল না। উপস্থিত অন্যান্য দর্শকদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাহারা সকলেই অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। সকলের মুখেই রব উঠিল, "হায় হায়! অদ্ভুত ঠাকুরের একি অপূর্ব্ব লীলা!"……এ সময় বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র চুঁচুড়ায় কাজ করিতেন—উভয় ভ্রাতাই তখন প্রত্যহ বাড়ী হইতে আফিস করিতেন। বঙ্কিমও এসময়ে বন্ধুজনসহ বাড়ীতেই ছিলেন। কলরব শুনিয়া সকলেই গুঞ্জঘরে ছুটিয়া আসিলেন। প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া, বঙ্কিমও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন—সহসা তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা সরিল না। ব্যাপারটা তাঁহার ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত বিচারশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটও কম অপ্রত্যাশিত নহে।

তখন রাধাবল্লভের পূজা হইতেছিল। কিছু পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনা ফিরিয়া আসিল। আত্মসংবরণ করিয়া তিনি পূজারীকে ডাকিয়া বলিলেন—

"রাধাবল্লভের চরণে একটা ফুল দাও তো !"

ফুল দেওয়া হইল। বঙ্কিম রমণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এইবার দেখোতো বাছা !"

রমণী উত্তর করিল, "আমি ফুল দেখিতেছি, কিন্তু ঠাকুর কই ?

বঙ্কিম প্রশ্ন করিলেন, "কিসের উপর ফুল দেখিতেছ ?

—"কালো একটা পাথরের উপর।"

কালো পাথরটি রাধাবল্লভের পদ্মাসন। এই পদ্মাসনের উপর ঠাকুরের চরণ স্থাপিত। ফুল দেওয়া হইয়াছিল তাহারই উপর। প্রৌঢ়া রমণী এই পদ্মাসনও দেখিয়াছিল, ফুলও দেখিয়াছিল, কিন্তু দেখিল না কেবল সেই দুর্লভ চরণ-যুগল। অভাগিনী করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দর্শকবৃন্দের চোখের পাতাও অশ্রুসিক্ত হইল। বঙ্কিমের নয়নও শুষ্ক রহিল না।*

ঘটনাটি অন্যলোকের মুখে শুনিলে আমরা হয়তো ইহা আজগুবি বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের চোখের উপর যখন এ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তখন আর ইহা বিশ্বাস করিতে আমাদের কোনরূপ কুণ্ঠাই থাকিতে পারেনা। বঙ্কিমচন্দ্র এ কাহিনী তাঁহার অনেক বন্ধুকে মুখে মুখে বলিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও এ কাহিনী তাঁহার মুখ হইতেই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন।

সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে নাকি একদিন রাধাবল্লভের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসপূর্ণ-কণ্ঠে কি এক জেরা করেন। কণ্ঠের

---

*ঘটনাটির সারাংশ "ব্রহ্মবিদ্যা" ১৩৩৪ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত "কাঁটালপাড়ার শ্রীরাধাবল্লভ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার লেখক স্বয়ং জ্যোতিশচন্দ্র।

ভঙ্গিতে বঙ্কিম প্রথমে সম্ভবতঃ একটু মনঃক্ষুন্নই হইয়াছিলেন, কিন্তু তারপরই সহাস্যকণ্ঠে জবাব দেন, "একটা কথা মনে পড়ে, অক্ষয়, তোমাদের চুঁচুড়ার একটি সুবর্ণ বণিকের মেয়ে এসেছিল একবার রাধাবল্লভকে দেখ্‌তে। এসে—"ইহার পরই তিনি কাহিনীটীর অবতারণা করেন। ঘটনাটি বলিবার সময় বঙ্কিম রীতিমত কাঁদিতে লাগিলেন,—আর বলা হইলনা। তাঁহার বিগ্রহ-ভক্তিতে অক্ষয়চন্দ্রের হৃদয় ভাবে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।*

রাধাবল্লভের সংস্পর্শে ও প্রভাবে পরিবারের সমস্ত আবহাওয়াই ছিল ভক্তি ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। এই আবহাওয়ায় বাস করিয়া, কথকতা কীর্ত্তন শুনিয়া, রথযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা, রাসলীলা প্রভৃতি পূজা-পার্ব্বণ দেখিয়া, যাত্রা, কবি, দান, ভোজন প্রভৃতি আনন্দোৎসবে সর্ব্বদা যোগদান করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে শিশুকাল হইতেই যে ধর্ম্মের বীজ রোপিত হইয়াছিল, আর উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া সেই বীজ কালে যে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কী ?

অক্ষয়চন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন—

—"বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষার আর এক উপকরণ তাঁহাদের ভবনে প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভজীউ ও তাঁহার নিত্য সেবা।

"বঙ্কিমের বাল্যাবস্থায় এই বিগ্রহের এবং অতিথিসেবার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল, এখনও অনেকটা আছে। সেই সুন্দর বিগ্রহ ও তাঁহার ঐকান্তিক সন্দর্শনে অভ্যস্ত বঙ্কিমচন্দ্র বয়সকালে কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হইয়াছিলেন।

"কেবল কৃষ্ণভক্তি নহে। শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস তিনি আপনার গ্রন্থমধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন, সে তো সকলেই জানেন ; আমি

*নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন ১৩১৯, ভাদ্র।

বলিতেছি এই প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অলৌকিকত্বেও তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন।”

রাধাবল্লভ ঠাকুর ওতপ্রোতভাবে বঙ্কিমের হৃদয়ে যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বঙ্কিমের বিভিন্ন গ্রন্থেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বিষবৃক্ষের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। “সীতারামের” লক্ষ্মীনারায়ণজীউই বঙ্কিমচন্দ্রের রাধাবল্লভ। বঙ্কিমচন্দ্র যে ঠাকুরকে কিরূপ মনে করিতেন, এখানে তাহার কিছু আভাস আছে। ফকির জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

“তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?”

সীতা ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা!

ফকির—ইনি থাকেন কোথা? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন? না, আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতারাম—ইনি সর্ব্বব্যাপী; সর্ব্বঘটে, সর্ব্বভূতে আছেন।

“প্রচার” হইতে উদ্ধৃত।

আর ভগবদ্গীতা “সীতারামের” ছত্রে ছত্রে। সীতারামের ন্যায় বঙ্কিমও রাধাবল্লভকে ডাকিতেন—“নাথ! দীননাথ! অনাথনাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পুণ্যময়ের আশ্রয়! পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না!”

সীতারাম তৃতীয় খণ্ড ২১ পরিচ্ছেদ

অতঃপরে বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে ‘বিশ্বরূপ দর্শন’ অধ্যায় হইতে গীতার কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই ভগবদ্প্রীতি ও গীতার প্রতি অনুরক্তি যে কেবল কথার কথা, তাহা নয়। ইহার প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহার একটী আত্মীয়ের স্মৃতিকথাই উদ্ধৃত করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের এক দরওয়ান ছিল। তাঁহাকে লোকে পাঠক

আটচালা বা নাচঘর (পশ্চিমদিক্ হইতে)

ইহারই পূর্ব্বদিকে গুপ্তঘর, দক্ষিণদিকে গোষ্ঠপিঁড়ি, উত্তরদিকে বাড়ী এবং পশ্চিমদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানাঘর।

বলিয়া ডাকিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহা 'সীতারাম' রচনার কিছু পূর্ব্বের ঘটনা। জ্যোতিশচন্দ্র লিখিতেছেন —

"পাঠক একদিন পূজায় বসিয়া গীতার একাদশ অধ্যায়োক্ত অমৃত নিঃস্যন্দিনী স্তোত্রমালা ভক্তিগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছিলেন। তিনি সংস্কৃত বুঝিতেন মাথামুণ্ডু, এমন কি, দেবনাগরও বুঝি চিনিতেন না। কিন্তু বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ তাঁহার আবৃত্তি মন্দ হইত না। তাহাতে আবার ভক্তির উচ্ছ্বাস সে শ্লোকগুলিকে মধুময় করিয়া তুলিতেছিল। আমি তাহা শুনিতে শুনিতে "আনন্দমঠের" পাণ্ডুলিপি লুকাইয়া পড়িব বলিয়া কাকার বৈঠকখানায় যাইতেছিলাম। তখন পাঠক মহারাজের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল,—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরুষ পুরাণ
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

বায়ুযমো৾গ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥

"এমন সময় আমি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিলাম। ঢুকিয়াই দেখি, আর কেহ নাই, কেবল কাকা একখানি কৌচে শুইয়া আছেন, তাঁহার উভয় চক্ষু মুদ্রিত, মুখ-সংলগ্ন সট্‌কার নল নিঃশব্দ, তিনি যুক্তকর বক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়া অনন্যচিত্তে সেই ব্রাহ্মণোচ্চারিত স্তব শুনিতেছেন। মুখে অদ্ভুত ভাব; কি সুন্দর, কি পবিত্র! আমি সভয়ে সসম্ভ্রমে পিছাইয়া বাহিরে আসিলাম। সেই দৃশ্যে—সেই দৃশ্যে কেন তাঁহার পূর্ব্বের ও পরের ওরূপ কয়েকটী ছোট ঘটনাদিতেও আমি অল্প বয়সেও

বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, কাকার ভিতরে একটা প্রবল ভক্তিস্রোত গিরিনিরুদ্ধকল্লোলিনীবৎ প্রচ্ছন্ন আছে।"

কৃষ্ণে ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দ মঠে" সত্যানন্দকে দিয়া শ্রীকৃষ্ণের দশাবতার স্তোত্র আওড়াইতেছেন, "কৃষ্ণকান্ত উইলে" নিশাকরকে ঋষিকেশ—নিযুক্ত পথে অগ্রসর করাইতেছেন, এবং "দেবীচৌধুরাণীতে" প্রফুল্লকে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আবার আহ্বান করিতেছেন।

এই কৃষ্ণভক্তিতেই তিনি গীতার ব্যাখ্যা করিতেছেন, প্রকৃত কৃষ্ণকথিত হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এবং কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ করিয়া অনুশীলন-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন। আর এরূপ প্রচারের জন্যই ধর্ম্মপ্রাণ রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে apostle of culture বলিয়া অভিহিত করিতেন।

বস্তুতঃ রাধাবল্লভের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র "শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে" ঈশ্বরত্বের আরোপ করিয়াছেন—

"ন কারণাৎ, কারণাদ্বা কারণা কারণাজ্জচ।
শরীর গ্রহণংবাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম॥

কারণ থাক্ আর নাই থাক্, ধর্ম্মত্রাণের জন্য তাঁহার শরীর গ্রহণ হইয়াই থাকে।

আমরা পরবর্ত্তী খণ্ডে বঙ্কিমের কৃষ্ণভক্তি ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্র

দ্বিতীয় অধ্যায়—পিতামাতা

বঙ্কিমচন্দ্র দক্ষের সন্তান। "সঞ্জীবনী-সুধায়" তিনি লিখিয়াছেন—

"অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত গঙ্গানন্দের ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ সর্ব্বেশ্বরও একজন অবসথী ছিলেন। 'অবসথ' নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি এই আখ্যা প্রাপ্ত হন—

> নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানৈঃ কল্প মহীরুহঃ।
> অবসথীতি বিখ্যাতো যস্মাবসথং পালনাৎ ॥

সর্ব্বেশ্বর কতকগুলি চতুষ্পাঠীও করিয়াছিলেন। 'অবসথে'র আর একটী অর্থ—টোল। পূর্ব্বে বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ অবসথী উপাধিতে ভূষিত হইতেন। এই সর্ব্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ দক্ষের অধস্তন নবম পুরুষ। বঙ্গাধিপতি রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ কাণ্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন, দক্ষ তাঁহাদের অন্যতম। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণই বাঙ্গালা দেশের রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ। ইঁহারা সকলেই এক

এক জন ছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তার মধ্যে দক্ষের আবার বেদে অসাধারণ অধিকার ছিল এবং তাঁহার বংশধরগণও অনেকেই তাহাদের এই আদিপুরুষের গুণাবলী হইতে বঞ্চিত হন নাই; বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তাঁহারাও অনন্যসাধারণ 'দক্ষতা' প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। সামাজিক অনুশাসনে দেবীবরের প্রভাবে কেহ কুলীন, কেহ শ্রোত্রীয়, কেহ বংশজ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষের সন্তানাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন ও যাজন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তিরই অনুসরণ করিয়াছেন।

গঙ্গানন্দ হইতে রামজীবন ষষ্ঠ পুরুষ—

রামজীবনই রঘুদেব ঘোষালের কন্যা রোহিণীদেবীকে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হন। ঘোষালের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যা রোহিণীদেবীকে সমস্ত বিষয় দানপত্র করিয়া দেন।*

---

*বঙ্কিমচন্দ্রও উইল করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎ কুমারীকে প্রায় সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি দিবার জন্য স্ত্রীকে নির্দ্দেশ দিয়া যান॥

এখানে দক্ষের সন্তান রামজীবনের বংশাবলী প্রদান করিলাম।
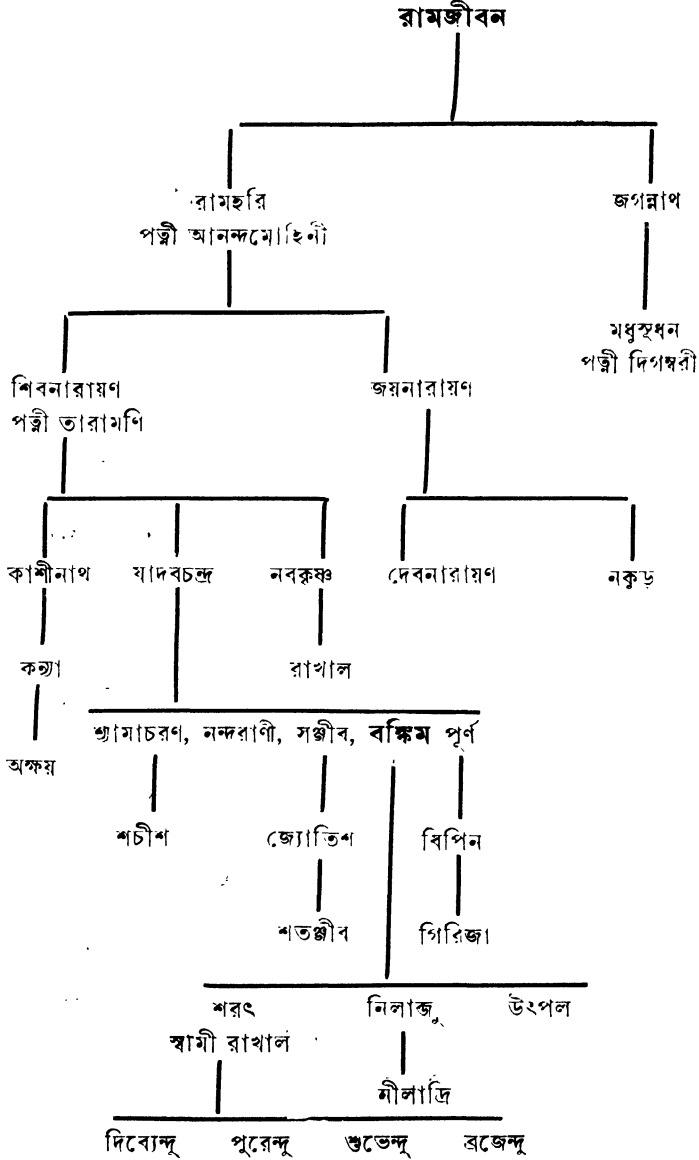
রামজীবনের পুত্র রামহরি মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটাল-পাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রামহরিরই প্রপৌত্র।

রামহরির স্ত্রী আনন্দমোহিনী দেবী কাঁটালপাড়ায় স্বামী-সহমরণ করিয়া 'সতী' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

গঙ্গার উভয় তীরস্থ স্থানসমূহে একদিকে যেমন 'ফুলে' ও 'বল্লভী' মেলের নানাশ্রেণীর কুলীনগণ বাস করিতেন, আবার বিশিষ্ট ভক্ত ও গুণী ব্যক্তি এই সমস্ত অঞ্চল উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। হালি-সহরের সাবর্ণ চৌধুরী, খড়দহ ও শান্তিপুরের গোস্বামী বংশ, তেলিনী-পাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ এবং ভক্ত রামপ্রসাদ, ব্রহ্মানন্দ কেশব, কবিকুল-শেখর ঈশ্বরগুপ্ত, মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গঙ্গাতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামটীও ছিল ব্রাহ্মণপ্রধান। রামহরি ও তদীয় ভ্রাতা জগন্নাথ চাটুয্যের অবস্থা মোটের উপর সমৃদ্ধই ছিল, কিন্তু তুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের অধিকাংশ সম্পত্তিই মামলা মোকদ্দমায় নষ্ট হইয়া যায়।

তাই শিবনারায়ণের প্রথম জীবন কিছু তুঃখেই অতিবাহিত হয়। দেবোত্তর হিসাবে যে বিশাল সম্পত্তি রঘুদেব ঘোষাল তাঁহার দৌহিত্র গণের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অতি অল্পাংশই শিবনারায়ণের ও তাঁহার সহোদরের করায়ত্ত হইয়াছিল। এদিকে জ্ঞাতি ও প্রতিবেশিগণ তাঁহার নির্ব্বিরোধ স্বভাবের সুবিধা গ্রহণ করিতে এতটুকু শৈথিল্য করিত না। এই সময়ে আবার দখল সম্পর্কীয় আইন বলবৎ হইয়া আসে। এই আইনের দরুণই শিবনারায়ণ আরও বিশেষভাবে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তখন স্বত্ব সাব্যস্ত হইত সর্ব্বাগ্রে দখলের জোরে। যেখানে অন্য কোনও দলিলাদির অস্তিত্ব থাকিত না, সম্পত্তির দখলকারীই প্রকৃত স্বত্ববান বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। বলবান

ও অসদাচারীর ব্যক্তির নিকটে ইহা বড়ই সুবর্ণ সুযোগ ছিল। "জোর যার, মুলুক তার"—একথার সার্থকতা তখন খুব উপলব্ধি হইত। শিবনারায়ণের জ্ঞাতিরাও সেই সুযোগের অপব্যবহার না করিয়া তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি কাড়িয়া নিয়াছিলেন। শিবনারায়ণ বড়ই খাঁটি মানুষ ছিলেন। নির্ধন হইলেও কাহাকেও তোষামোদ করিতে পারিতেন না, অথবা অভাবে পড়িয়াও কাহারও দ্বারস্থ হন নাই। আত্মীয়গণ তাঁহার উপর অত্যাচারের ভয় দেখাইলেও তিনি সর্ব্ববিষয়ে অবিচলিত থাকিতেন। সত্যকথা বলিতে অথবা অপরের ত্রুটী দেখাইয়া দিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। এখানে তাঁহার নির্ভীক চরিত্রের একটু পরিচয় দিব।

শিবনারায়ণ একদিন ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। এমন সময়ে কতিপয় জ্ঞাতি জনকয়েক লাঠিয়াল সহ তাঁহার বাড়ী চড়াও করিয়া বসে। উদ্দেশ্য ছিল যে, জোর করিয়া তাঁহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইবে, আর আবশ্যক হইলে তাঁহার মাথা ফাটাইয়া দিতেও দ্বিধা করিবেনা। বৃদ্ধ প্রথমে কিছুই বলেন নাই; নিতান্ত নির্ব্বিকার চিত্তেই তামাক টানিতেছিলেন। লোকজন ডাকিতে বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা করেন নাই। এদিকে তাহাদের আস্ফালনও ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত লোকদের সম্মুখে আসিয়া পূর্ব্ববৎ ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন "ওহে বাপুরা, অনেকদিন পৃথিবীতে আসিয়াছি, অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আর বেশীদিন থাকিবার ইচ্ছাও নাই। তোমাদের সাহসে কুলায়, তোমরা এই বুড়ার মাথাটি লাঠিতে গুঁড়া করিয়া দাও, তোমাদের পাপের ভার আরও পূর্ণ করিয়া যাও।"

আক্রমণকারিগণ তাঁহার ভীমকান্ত মুখমণ্ডলে পূর্ব্বাপর গাম্ভীর্য্য ও প্রসন্নতার ছবি দেখিয়া ভীত ও লজ্জিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই নির্ভীক ও নির্ব্বিকার বৃদ্ধই বঙ্কিমের পিতামহ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন "পিতামহ ঠাকুর ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তি। শিক্ষার হিসাবে তাঁহার অতি সামান্য শিক্ষা হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। কিন্তু জীবনে তিনি কখনও মিথ্যা বলেন নাই, বা কাহাকেও ভয় করিতেন না। তাঁহার স্পষ্টবাদিতায় প্রতিবেশিবর্গ বিরক্ত হইলেও, উচিত কথা বলিতে তিনি কখনও বিরত হন নাই। কেহ যাচ্ঞা করিলে তিনি ঘরের ঘটি-বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া প্রার্থীর অভাব পূর্ণ করিতেন। কিন্তু দান করিতেন অত্যন্ত গোপনে। তিনি অত্যন্ত পূতচরিত্রের লোক ছিলেন।"

শিবনারায়ণ পরোপকারী ছিলেন ও প্রতিবেশিদের খুব ভাল-বাসিতেন। অপরকে না দিয়া কোন ভাল জিনিষ খাইতে পারিতেন না। প্রাপ্তবয়সে তিনি পুত্রের নিকট যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখিতেন, তাহার দুই একখানি পাঠককে উপহার দিব।*

চিঠি কয়খানি সরল ও আন্তরিক উক্তিতে পরিপূর্ণ।

প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বাবাজীবনেষু মোকাম বর্দ্ধমান।

প্রাণাধিক প্রিয়তম পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন বিশেষ বাবাজীউর মঙ্গল ও দীর্ঘ আট সদা সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতেই অত্র সনাতন তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। একদফা আমার

*এ বাড়ীর কেহই চিঠিপত্রে বৎসর উল্লেখ করিত না।

রিণ আদি হওণে জন্য তোমাকে ভার অন্নায় করিয়াছিলাম তাহাতে মুক্ত হইয়াছি, আর বাকী যাহা আছে সে তোমার তুমি নানারূপে বিধাতা ৺ দিয়াছেন। লিখিয়া জানাইবা অতএব আমবাগান ছাড়িয়া দিলে আমি অতোষ্ট মনোকষ্ট পাই, কারণ এই যে কাহাকে কাহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফল অর্পণ করিয়া থাকি শ্রীশ্রী৺দিগের ভোগে লাগে এবং আমার আত্মাকে কিছু কিছু দিয়ে থাকি। তাহা বঞ্চনা হইলে কেমন কষ্ট অতেষ্ট হইবেক। তুমি বিদেশস্থ পরে এ বাগান তোমার ইহাতে অন্যথা নাই তুমি বাটী আইলে যাহা ভাল হয় করিবা। আর একদফা ৺সেবার কারণ লিখিয়াছ মাসড়া খরচ ৫ টাকায় হয়না ৮৲ টাকা কম হয়না। নগদ নাই এবং আঠ মাস জ্বালানী খরিদ করিতে হইবেক। অন্য অন্য বৎসর মুড়াগাছা গমনাগমন শক্তি ছিল তাহাতে হাওলাত বরাত করিয়া ৩০।৪০৲ টাকা আনিতাম এ বৎসর মুড়াগাছা গমন শক্তি নাই। ইহাতেই সে বিষয় হইল না ৺দোগাছা ইজারা শ্রীযুক্ত রামকুমার মুখোপাধ্যায়কে ৪০৫টা দিয়া গিয়াছে। তেইশ টাকা কষ্ট দেওনের কথা ছিল আমি অশক্ত থাকিয়া তাহার নিকট যাইতেছি প্রাণাধিক রামচাঁদ ভাইজীউ বাটী থাকিলে এ বিষয় সম্পন্ন হইত। এক্ষণে যে তুমি ভরসা যাহা করহ তাহাই হইবেক অন্য অন্য বিষয়ে মিথ্যা। অধিক লিখিব। পত্রের দোষ লইবানা। আটকোষ্টে লিখিলে পড়িতে পারিবা। ইহা জবানমেতি ৯ই ফাল্গুন।

আশীর্ব্বাদলিপি শ্রীশিবনারায়ণ শর্ম্মণঃ

পুঃ তোমার পরিবার বালক স্ত্রিলোক সদা সর্ব্বদা ইহাদের একত্রে উচিৎ হয়না। তোমাকে সকল বিষয়ে বিধাতা ৺দান করিয়াছেন আমি প্রাচীন আর অর্থহীন তোমার অন্নদাস হইয়া রহিয়াছি। অতএব আমি যে কয় দিবস বাচিয়ে থাকিব তোমার কল্যাণে ভোগ করিব।

প্রাণাধিক প্রিয়তমেষু—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞানঞ্চ বিশেষ বাবাজীউর মঙ্গল সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতেই অত্র সন্তোষ ২৫ বৈশাখের তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাতো হইলাম। ৺সেবার কারণ বড়ই চিন্তিত ছিলাম

তাহাতে সে চিন্তা তুমি দূর করিয়াছ। ৺গোষ্ঠযাত্রা ৫ টাকা খরচ হইয়াছে আর এক টাকা দিওনে যাইবে। গোষ্ঠের খরচ বাকী ২ টাকা দখিনাদিগের নিত্য সেবার খরচ মাহে ৫ টাকা ও ছেনান যাত্রা ও চন্দন যাত্রাদিগের তুমি না দিলে সেবা করিতে পারি নাই। ৺সেবার কারণ দরমাহা ৭ টাকা দিবা ইহাতে ৺সেবা হইতে পারে। আমার একটী গরু ও এক দাসী আছে ইহাদিগের আহারাদি দিতে হইতেছে একারণ দরমাহা আট টাকা আমাকে দিলে খরচপত্র চলে। আমি অত্রবর্ষ আমার গমনাগমন রহিত এই ৮ টাকা……অতএব শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় বাবাজীউকে আমার মাসকাবারির টাকা বরাত লিখিবে। তবে বেকসুর টাকা পাইতে পারিব— অধিক কি লিখিব। যে টাকা তুমি দিবা খত বরাত মুনাফা লিখিয়া দিবা যাহাতে ভালো হয় তাহাই করিবা। অধিক কি লিখিব তোমার পুণ্যের মধ্যে ইহা জানিবা।

আশীর্ব্বাদলিপি তাং ৩১ বৈশাখ

তোমাকে নিয়ত আশীর্ব্বাদ করিয়া কামনা করি তোমাকে ৺ সর্ব্বতোভাবে বড় করিয়াছেন এবং আরো করিবেন তোমার কোলে আমার ৺ ইচ্ছায় পতন হয় এমত ভাবনা।

* * * * *

পিতার নিকট পুত্রের কোন পত্র পাই নাই, তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুত্র বিশেষ পিতৃবৎসল ছিলেন। হইবারই কথা। যাদবচন্দ্র ছিলেন বিরাট পুরুষ—যেমন পিতৃমাতৃ ভক্তিতে তেমন ভক্তি ও হৃদয়বত্তায়। তিনি বিশেষ কৃতী পুরুষ ছিলেন। পাঁচটাকা বেতনের মুন্সিগিরিতে ঢুকিয়া ক্রমে ডেপুটী কালেক্‌টার হইয়া মাসে ৫০০৲ পর্য্যন্ত রোজগার করিতে সমর্থ হন। তিনি সমস্ত বিষয়সম্পত্তি উদ্ধার করেন এবং বাড়ীতে বিরাট উৎসবাদির ব্যবস্থাও তিনিই করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র পিতাকে 'দেবীচৌধুরাণী' উৎসর্গ করিবার সময় লিখিয়াছেন—

আটচালা ও গোষ্ঠঘর (দক্ষিণ দিক্ হইতে)

অদূরবর্ত্তী রেলওয়ের তারের বেড়ার দক্ষিণে বেদী দেখা যাইতেছে। ঐ বেদীই গোষ্ঠপিঁড়ি নামে অভিহিত। বেদীর পাশেই যে প্রকাণ্ড বকুল গাছটী আছে, তাহা এখন শুষ্ক ও পত্রবিহীন। তাহার পার্শ্বে উত্তর-পশ্চিমে প্রকাণ্ড আটচালা। গোষ্ঠপিঁড়িতে গোষ্ঠমেলার সময়ে ঠাকুরকে আনিয়া সাজ করিয়া বসান হয়। আটচালাটির চারি চাল আজকাল সাধারণতঃ খুলিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়।

"যাঁহার কাছে প্রথমে নিষ্কামধর্ম্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিষ্কামধর্ম্মই ব্রত করিয়াছিলেন, যিনি এখন পুণ্যফলে স্বর্গারূঢ়, তাঁহার পবিত্র পাদপদ্মে এই গ্রন্থ ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।"

পিতার সম্বন্ধে বঙ্কিম আর একটু সামান্য পরিচয় দিয়াছেন— "কৃষ্ণকান্তের উইলে।" সপ্তবিংশতিতম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে—

"কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু-সংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে," কেহ বলিল, "একটা দিক্‌পাল মরিয়াছে," কেহ বলিল, "পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে।" কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট দান করিতেন, সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।"

এই কথা লিখিবার পরেও যাদবচন্দ্র ৩।৪ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তাই এখানে পিতার মৃত্যুর পরের সময়ের ভাবী স্মৃতির ছায়াপাত হইলেও, কথাগুলি যাদবচন্দ্র সম্বন্ধে খুবই খাটে। অন্যান্য বিষয়েও কৃষ্ণকান্তের সহিত যাদবচন্দ্রের সাদৃশ্য আছে। সময়ান্তরে পাঠককে তাহা নিবেদন করিব।

যাদবচন্দ্রের এই ছবি দেখিলেই পাঠকের মনে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে। তবে যাঁহারা তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিয়াছেন তাঁহাদের প্রদত্ত আলেখ্যও পাঠকবর্গের গোচরীভূত করা কর্ত্তব্য। বার্দ্ধক্যেও তাঁহার বিরাট পৌরুষ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্র দুর্গোৎসবের রাত্রির বর্ণনা সময়ে তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"তাহাদিগের সন্নিকটে একটি থামে ঠেস দিয়া পৃথক আসনে এক ব্যক্তি বসিয়া,—ইনি দেখিতে সাধারণ মানুষের মত নহেন—তাঁহাকে

দেখিলেই মনে হয়, তিনি যেন সকলের হইতে স্বতন্ত্র। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা, কোন মহাপুরুষের মন্ত্রশিষ্য, নিষ্কাম ধর্ম্মাবলম্বী। এই মহাপুরুষের বয়ঃক্রম তখন অশীতি বৎসরের অধিক হইয়া থাকিবে। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, দেহ না ক্ষীণ না স্থূল, অথচ বয়সোপযোগী বলিষ্ঠ, খড়্গের ন্যায় নাসিকা, চক্ষু দুইটী অতি তীব্র, মস্তক ও মুখমণ্ডল কেশহীন। কেবলমাত্র একখানি চাদরে গা ঢাকিয়া স্থিরভাবে সহাস্যমুখে বসিয়াছিলেন।"

চন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছেন—

"দুর্গারাম ও আমি বেলা ৯ ঘটিকার সময় পৌঁছিয়া দেখিলাম, সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে এবং পূজার দালানের প্রশস্ত রোয়াকে শ্রোতৃবর্গের মাথার উপরে আপন মস্তক প্রায় অর্দ্ধহস্ত উত্তোলিত করিয়া এক দীর্ঘকায় বিশালবপু বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। দুর্গারাম বলিলেন, "উনিই বঙ্কিমবাবুর পিতা, রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর"। আমার মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।...... বঙ্কিমবাবু এবং তাঁহার সহোদরদিগকে বড় পিতৃভক্ত দেখিয়াছি,—এই ভাবে বিভোর, "আমাদের পিতা অসাধারণ শক্তি ও মহত্ত্ব স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছেন।"

প্রদীপ ভাদ্র ১৩০৬

স্বর্গীয় তারক বিশ্বাসও তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"দূর হইতে দেখিলাম, ঠাকুর-দালানের মধ্যস্থলে তেজঃপুঞ্জ একটী সজীব দেবতার মূর্ত্তি বসিয়া আছেন।"

"Dacca Review"

এই যাদবচন্দ্র অত্যন্ত রাশভারী লোক ছিলেন—সর্ব্বদাই যেন তাঁহার মুখের উপরে প্রাবৃট্-মেঘের মত একটা থম্‌থমে ভাব বিরাজ

স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করিত। কিন্তু তথাপি তাঁহার রসগ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল অসীম অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার যথাযথ পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন— "যাদবচন্দ্রের ন্যায় রাশভারী লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। তথাপি তাঁহার রসপরিগ্রহ সকল বিষয়েই সমান ছিল। রাশভারী লোকের রহস্যে আস্বাদন—সেটি বড়ই অপূর্ব্ব পদার্থ! কেবল খাইতে-খাওয়াইতে নয়, তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যের রসও বিশেষ উপভোগ করিতে পারিতেন।" এ রস তিনি একাই উপভোগ করিতেন না,— বিপুল অর্থব্যয়ে আপামর সাধারণকেও সেই রস উপভোগ করিবার সুচারু সুবিধা করিয়া দিতেন। এই জন্য বঙ্কিম নিজেও বাল্যকাল হইতেই উৎকৃষ্ট যাত্রা, গান, কবি, কীর্ত্তন, কথকতার রস আস্বাদন করিবার অবাধ সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং সেরূপ সুবিধা পাওয়া সাধারণের কপালে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না।"

যাদবচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বাধ্যায়ে কিছু পরিচয় দিয়াছি। উহা এত গভীর ছিল যে, সাধারণ লোকে তাহা ধারণা করিতে পারে না। জ্যোতিশচন্দ্র "ব্রহ্মবিদ্যায়" একটী সান্ধ্য দৃশ্য বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—"উল্টা রথের সময় একবার রাধাবল্লভের সান্ধ্য টান হইবার পরে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হইয়াছে। ফিরিবার সময় একটু রাত্রি হইলে যখন পূজার মণ্ডপে উঠিবার জন্য সদর দরজার কাছে ঠাকুরের চতুর্দ্দোলা আসিয়া পৌঁছিল, তখন দেখা গেল দীর্ঘকায় কৌশেয়বাস পরিহিত, তুলসীর কণ্ঠিধারী নগ্নপদ বৃদ্ধ করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি যেন কতই ব্যাকুল রাধাবল্লভের সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁহার প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিয়াছে; তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ দেখা হয় নাই কিনা! তাই যেন তিনি গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার পথে তাঁহাকে দেখিবার জন্য গলবস্ত্র হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। এতক্ষণ ধরণী কথক মহাশয় সদলে কীর্ত্তন গাহিতেছিলেন, বৃদ্ধের সেই

ভাবোন্মত্ত আচরণ দেখিয়া তিনি বাদ্যভাণ্ড থামাইয়া দিলেন। কেবল উত্তর গোষ্ঠের একটি পদের মহড়া ধরিলেন—

—'ঐ না বেশে এসো আমার ঘরে।'

বৃদ্ধ নিস্তব্ধ, তাঁহার চক্ষু হইতে দরদরধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেছে। সকলে দেখিল এখানেও শ্রীবৃন্দাবনের লীলার পুনরভিনয় হইতেছে। বৃদ্ধ যেন ব্রজকিশোরী হইয়াছেন—তেমনি তাঁহার যুক্তকর, তেমনি তাঁহার গলবস্ত্র, তেমনি তাঁহার গলদশ্রু নেত্র, তেমনি তাঁহার কাতর ভাব, তেমনি তাতে প্রাণভরা নীরব আহ্বান!

গান চলিতে লাগিল। বৃদ্ধের মাথা হইতে সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া এক ভাব-তরঙ্গ বহিতে লাগিল। আর নীরব জনমণ্ডলী উন্মুখ হইয়া সে গান শুনিতে লাগিল—

"(কিবা) এই পথে আসিবে তুমি, দাঁড়ায়ে রয়েছি আমি,
তোমায় বঁধু নিয়ে যাবার তরে॥"

সেদিন রাধাবল্লভ যেন সত্যই শ্রান্ত হইয়াছিলেন, পাথর-দেবতার সর্ব্বদেহেই যেন সত্য সত্যই স্বেদবিন্দু দেখা গেল। তিনি যেন সত্যই রাধিকার সেবা লইবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছেন।

রাধাবল্লভ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন; আর সকলে সজলনয়নে শুনিতে লাগিল সেই গান—সেই মোহমন্ত্র-মাথুরের সেই অমৃতসিঞ্চিত শ্রীরাধার নিবেদন পদ—

"এসো এসো বঁধু এসো, আধ আচরে বস
একবার নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি
অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা সনে মিলাইলা বিধি হে॥"

বৃদ্ধ শান্ত হইলেন।

যাদবচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। তাঁহার জন্ম শকাব্দ ১৭১৬।৮।১৭।৫৯ *

যাদবচন্দ্র ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রায় একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন; এবং রাজা রামমোহন রায়ের পরলোকপ্রাপ্তির সময় উভয়েরই প্রাপ্তবয়স। হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ-নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবও যাদবচন্দ্র অপেক্ষা মাত্র দশ বৎসরের বড় ছিলেন।

যাদবচন্দ্র দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার প্রথমা স্ত্রী গৌরমণি নিঃসন্তানা অবস্থায় লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়া পত্নী দুর্গাসুন্দরীর গর্ভে তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্রগণের সকলের নামই সর্ব্বজনবিদিত—তাঁহার কন্যার নাম ছিল নন্দরাণী। পিতার মৃত্যুকালে সকল সন্তানই জীবিতাবস্থায় ছিলেন।

যাদবচন্দ্র ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ডেপুটী কালেক্টর—সহানুভূতি, তেজস্বিতা ও কর্ম্মদক্ষতায় সকলেই তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিত। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিতেন, "কাঁথি মহকুমার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তদীয় পুত্রগণের নাম এখনও লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে; কেননা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাজনামুঠা পরগণার বন্দোবস্তের সময়ে সাধারণ লোকের বিস্তর হিত করিয়াছিলেন। একদিন আমি বঙ্কিমকে বলিয়াছিলাম—'এখনও মাজনামুঠার সকল লোকেই তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করে'।

"তাহাতে বঙ্কিম সলজ্জ ও স্মিতমুখে উত্তর করেন—'কর্ত্তাদের দয়ার জন্য লোকে ভালবাসিত। আমরা বিচার করিয়া কড়া শাস্তি, দিতাম, তাতে লোকে কর্ত্তার সঙ্গে তুলনা করিয়া আমাদের নিন্দা করিত।"

প্রদীপ ১৩০৬ বৈশাখ

*ঠিকুজি আমাদের কাছে আছে।

যাদবচন্দ্র অনেক দিন কাঁথিতে থাকিয়া ডেপুটী কালেক্টারের কাজ করিয়াছেন। হিজলী কাঁথিতে যাদবরাম রায় নামে একজন প্রাতঃ-স্মরণীয় আদর্শ জমিদার ছিলেন। বঙ্কিমের পিতৃদেবকেও নানাগুণে বিভূষিত দেখিয়া স্থানীয় লোকে আখ্যা দিলেন "যাদবরাম ডিপুটী।"

যোগেশচন্দ্র বসু বিদ্যানিধি প্রণীত "বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-চিহ্ন"

সেকালের হাকিমী চাকরিতে মানসম্ভ্রম ও ক্ষমতার প্রাচুর্য্য ছিল। কিন্তু যাদবচন্দ্র ধর্ম্মপথে থাকিয়াও চাকুরিতে অনেক বিষয় করিয়া যান ; আর সে বিষয়ের অধিকাংশই যাগযজ্ঞ, পূজা-প্রতিষ্ঠাও দানধ্যানাদির কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল। বাড়ীর ক্রিয়াকাণ্ড সমূহের অধিকাংশই তাঁহার সময়েই সবচেয়ে বেশী জাঁকালো করিয়া অনুষ্ঠিত হইত। চাটুয্যে বাড়িখানা সর্ব্বদাই যেন আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইত। কিন্তু ব্যয় বাহুল্যের জন্য জীবনে তাঁহার ঋণ কখনও পরিশোধ হয় নাই। সে ঋণের কাহিনী এ পুস্তকে পাঠক অনেকস্থানে পাইবেন।

মহাপুরুষগণের জীবনচরিত পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, এক অদৃশ্য মঙ্গলময় হস্ত সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে বিপদের পঙ্কিল গহ্বর হইতে উদ্ধার করেন। চাটুয্যে পরিবারেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই! যাদবচন্দ্রের জীবনে একাধিক অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়া ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। শুনিয়াছি—বঙ্কিমের জীবনেও এইরূপ দুই-একটী ঘটিয়াছিল। যাহা হউক বঙ্কিমের জীবনারম্ভের পূর্ব্বকার ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, জাতিগঠনের ভারও বঙ্কিমের হস্তেই সমর্পণ করিবার জন্য যেন পূর্ব্বজন্ম হইতেই সব আয়োজন চলিতেছিল। বহু সাধনা, বহু তপস্যা, বহু আয়োজন ধারাবাহিক চলিবার পর চাটুয্যে পরিবার—চাটুয্যে পরিবার কেন—বঙ্গমাতাই বঙ্কিমরত্ন প্রসব করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ যে অদৃশ্য শক্তি জীবনের প্রথম অবস্থায়ই যাদবচন্দ্রকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, প্রথম যৌবনারম্ভেই তাঁহাকে মন্ত্রঃপূত করিয়া দেবোৎসর্গীকৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই কিন্তু অলক্ষ্যে বঙ্কিমেরও তত্ত্বাবধান করিতেন। বঙ্কিম হয়তো এতটা পূর্ব্বে জানিতেন না; কিন্তু পরিবারের সকলেই যে সেই অদৃশ্য শক্তির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! সঞ্জীবচন্দ্রকে দেখিয়াছি---বিদেশ-ভীত একমাত্র পুত্রকে সেই অদৃশ্য শক্তির দোহাই দিয়া সর্ব্বদাই তিনি উৎসাহিত করিতেছেন :

"যিনি অভাবনীয় কৌশলে তোমায় চাকুরী দেওয়াইয়াছেন, তিনিই অচিন্ত্যনীয় কৌশলে তোমায় রক্ষা করিবেন। তিনি এখন তোমার সহায়, কাজেই তোমার কোন ভাবনা করিবার কারণ নাই। তোমার বড় ভয়, এইজন্য সেই Spiritual interference কোথাও ভয়ানক স্থানে লইয়া গিয়াছেন, কারণ তোমার সেই ভয় ছাড়াইবেন।"

এই অভাবনীয় কৌশল বা Spiritual interference কী, পাঠককে জানানো কর্ত্তব্য।

পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"আমাদের পিতৃদেব প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সেকালে প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। এই গল্পগুলি এখানে বিবৃত করিতে আমার সাহস হয় না; কেননা ঐগুলি অলৌকিক ঘটনায় জড়িত। তবে এইরূপ ঘটনাতে বুঝা যায় যে, সাধারণের ধারণা ছিল, পিতৃদেব বাল্যকাল হইতেই দেবভক্ত ছিলেন এবং দেবতাও তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বোধ হয় এই ভক্তির জন্যই ভগবান তাঁহাকে অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই এক মহাপুরুষের দ্বারা দীক্ষিত করিয়াছিলেন।"

নারায়ণ ১৩২২ ভাদ্র

এক্ষণে কি অচিন্ত্যনীয় সৌভাগ্যবলে যাদবচন্দ্র গুরু-কৃপালাভ করিয়াছিলেন, সেই ঘটনাটি আমরা লিপিবদ্ধ করিব। ঘটনাটি কল্পনা-প্রসূত নহে, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাকে প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা জ্ঞান করিয়াই তাঁহাদের নিজস্ব রচনার মধ্যে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত কথা এবং ব্যাপারাদি অনুধাবন করিয়া আমাদেরও দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, গল্পটী একেবারে সত্য। বিভিন্ন স্থানে যাঁহারা এ বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে (১) ৺হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (২) ৺ললিতচন্দ্র মিত্র (৩) যাদবেশ্বর তর্কালঙ্কার (৪) পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও (৫) শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।* সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষায় যাদবচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র পূর্ণচন্দ্র যে আখ্যানটী উজ্জ্বলভাবে বিবৃত করিয়াছেন আমরা সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ও প্রামাণ্য বলিয়া মনে করি। পূর্ণচন্দ্র ঘটনাটি এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

যাদবচন্দ্রের যখন বয়স পোনের কি ষোল, অশুচি বস্ত্রে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিবার জন্য পিতা শিবনারায়ণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। নারায়ণগড়ের নিকট এক পুষ্করিণীর তীরে বিশ্রামকালে বস্ত্র ও সঙ্গে টাকাকড়ি যাহা ছিল তাহা অপহৃত হইয়া যায়। এই সময় তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাশীনাথ জাজপুরে নিমকীর দারোগার কাজ করিতেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার

*১ পুরোহিত—১৩০১ জ্যৈষ্ঠ
২ মানসী—১৩১৬, শ্রাবণ পৃঃ ২৭৯ বঙ্কিমের পিতৃকাহিনী
৩ নারায়ণ—১৩২২ শ্রাবণ
৪ নারায়ণ—১৩২২ ভাদ্র
৫ বঙ্কিমজীবনী—১ম সংস্করণ পৃঃ ১৪

এতদ্ব্যতীত কাঁটালপাড়ার রামপণ্ডিত মহাশয় (বঙ্গদর্শনের সহকারী কার্য্যকারক) ও নন্দরাণীর পৌত্র শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৈলাসের পুত্র বর্ণিত তথ্যও আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

পিসতুতো ভাই ভজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় থাকিতেন।* প্রায় মাসাধিককাল সেই দস্যু-তস্কর-সঙ্কুল প্রদেশে হাঁটিতে হাঁটিতে যাদবচন্দ্র জ্যেষ্ঠের কাছে আসিয়া উপস্থিত হন। পিতাও অভিমানী পুত্রের পিছনে দুইজন বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়াছিলেন—কিন্তু তাহারা তাঁহার সন্ধান পায় নাই। কাশীনাথ পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন—তাঁহার যত্নে বালক যাদবও পারসিক ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিতে লাগিলেন। দুই তিন বৎসর পরে কাশীনাথ ছুটি নিয়া বাড়ী আসিলে যাদবই তাঁহার স্থানে একজন প্রধান কর্ম্মচারীর সহায়তায় জ্যেষ্ঠের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কিছু ইংরাজিও পড়িয়াছিলেন। †

ইতিমধ্যে যাদবের একদিন ভয়ানক জ্বর হইল এবং ক্রমে বেগ এমনই ভীষণাকার ধারণ করিল যে সেই অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহার নাড়ি ক্রমশঃই ছাড়িয়া আসিতে লাগিল, বাঁচিবার আর কোনরূপ আশা রহিল না। ভজকৃষ্ণ প্রভৃতি আত্মীয়েরা তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া সৎকারের জন্য বৈতরণী তীরে লইয়া আসিলেন। নদীর তীরে সকলেই স্বর্ণকান্তি কিশোরের মৃতপ্রায় দেহ ঘিরিয়া হায় হায় করিতেছে, এমন সময় সহসা সকলের দৃষ্টি গিয়া পড়িল একটি নৌকার উপর। নৌকাখানি তীরের দিকেই আসিতেছিল—

*জাজপুরে কাশীনাথের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ঐখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অদ্যাপি উহা 'কাশীনাথ মন্দির' বলিয়া খ্যাত। দেশের অনেক লোক তাঁহার নিকট থাকিয়া প্রতিপালিত হইত—তিনি সকলকেই এক একটি চাকুরী দিয়াছিলেন—ভজকৃষ্ণ বাবুও একটি পাইয়াছিলেন।

† পুরোহিত ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ ৬৭ পৃঃ

ক্ষণকাল পরেই সেটি ঘাটে আসিয়া লাগিল—ছইয়ের ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন এক জটাজুটধারী, ঘন কৃষ্ণশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী সৌম্যকান্তি এক সন্ন্যাসী। ভিড় ঠেলিয়া চিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে সকলে সন্ন্যাসীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল—তাঁহার দীর্ঘ তেজঃপুঞ্জ দেহ, হস্তে ত্রিশূল, পায়ে খড়ম, বক্ষে যজ্ঞোপবীত। জনতা তাঁহাকে মনে করিল কোন ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ,—বালকের প্রাণরক্ষার্থই এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন। ভজকৃষ্ণ তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'রক্ষা করুণ, বালকের প্রাণরক্ষা করুন, সাধুবাবা!"

সন্ন্যাসী যাদবের মুখের চাদর তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন—"আহা ছেলেটি কি সুন্দর, কি সুন্দর!" পরে বলিলেন, "ইহাকে কেন জীবন্ত দগ্ধ করিতে আনিয়াছ, এ তো মরে নাই, দেখিতেছ না জীবনের লক্ষ্মণ এখনও বর্ত্তমান?" এই বলিয়া তিনি উষ্ণ দুগ্ধ আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। অতঃপর তিনি যাদবের মাথা হইতে নাভি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ দুই হস্ত চালনা করাতেই মৃতদেহ পাশমোড়া দিয়া উঠিল। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে যাদবের জ্ঞানলাভ হইল এবং দুগ্ধ পান করাইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাকে বাসায় আনা হইল। মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে যাদবের সুস্থতা ফিরিয়া আসিলে সন্ন্যাসীকে যাইতে দেখিয়া কি মনে করিয়া শয়নাবস্থাতেই সাধুর পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপুরুষ আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, তুমি সুস্থ হইয়াছ।"

যাদব বলিলেন, "তাহাতো বুঝিতেছি, তবে আমার একটি ভিক্ষা আছে।

—"কি ভিক্ষা, বেটা?"

যাদব—যদি আমার প্রাণদানই করিলেন, তবে আমায় দীক্ষিত করুন !

মহাপুরুষ একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একটি দীক্ষার দিন ধার্য্য করিয়া বলিলেন, "বৎস, অমুকদিন তুমি স্নাত হইয়া থাকিও, আমি তোমাকে আসিয়া দীক্ষা দিব।"

তিনি উপস্থিত হইলেন এবং যাদবচন্দ্রের আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন—'না তোমার ভাল করিয়া স্নান হয় নাই; চল বৈতরণী হইতে তোমাকে স্নান করাইয়া লইয়া আসি।"

স্নানান্তে বাসায় আসিয়া উভয়েই একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন। দ্বাররুদ্ধ হইল, সকলেই অভুক্ত অবস্থায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দীক্ষাশেষে দ্বার খুলিয়া বহুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী নিষ্ক্রান্ত হইলেন, কিন্তু সকলে দেখিলেন, যে খড়ম পায়ে দিয়া তিনি আসিয়াছিলেন, তাহা আর এখন তাঁহার পায়ে নাই। ভজকৃষ্ণ ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন যাদব একটি আসনে বসিয়া দিব্য হাসি হাসিতেছেন, আর তাঁহার কোলে একটি গামছা বাঁধা পুঁটলি রহিয়াছে। তিনি দেখিতে চাহিলেও যাদব তাহা দেখাইলেন না, পুঁটলীটি বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলেন। উহাতে সেই সন্ন্যাসীর পায়ের খড়ম ও পৈতা ছিল। প্রতি প্রত্যুষে যাদব সেই খড়ম ও পৈতা পূজা করিতেন ও সেই সঙ্গে সন্ধ্যা আহ্নিক জপ করিতেন। ১৮ বৎসর হইতে ৮৬ বৎসর পর্য্যন্ত যাদব নিত্য উহার পূজা করিয়াছিলেন। সরকারী কাজে বাহিরে গেলেও উহা সঙ্গে লইয়া যাইতে কখনো তিনি ভুলিয়া যাইতেন না। কিন্তু তাঁহার গুরুদেবের প্রসঙ্গ ও সেই খড়ম ও পৈতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা তিনি কোনদিন কাহারো সহিত করিতেন না। এ বিষয়ে কিছু লিখিয়াও রাখিয়া যান নাই।

মৃত্যুশয্যায় তিনি এই খড়ম ও উপবীত উপস্থিত পুত্রত্রয়ের (সঞ্জীব, বঙ্কিম ও পূর্ণচন্দ্র)* ও জ্যোতিষচন্দ্র প্রভৃতি পৌত্রের কাছে দিয়া বলেন, "এই খড়ম পূজা করিবার জন্য আমি গুরুদেবের নিকট চাহিয়া লইয়াছিলাম আর এই উপবীত গুরুদেব গলা হইতে খুলিয়া দিয়াছিলেন—তোমরা আমার মৃত্যুর পর ইহা অতলস্পর্শে নিক্ষেপ করিবে।" পুত্রগণ তাহা হুগলীর নীচে যোড়াঘাটের সন্নিকটে, যেখানে গঙ্গার জল খুব গভীর সেখানে পাথর বাঁধিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে খড়মের বৌলা হাতীর দাঁতের তৈয়ারী এবং সে জাতীয় খড়ম কলিযুগে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নয়। আর উপবীত দেখিয়া বঙ্কিম বলিয়াছিলেন সেটি তিব্বত দেশের গাছের ছাল, সুতা নহে। পৈতাটি তিন দণ্ডী ছিল, মধ্যস্থানে এক একটি গ্রন্থি দ্বারা আবদ্ধ উপবীতে প্রত্যেক দণ্ডীর উভয় পিঠে কি যেন লেখা ছিল, সে ভাষা বুঝা গেল না। বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, উহা তিব্বতী ভাষা। ভ্রাতাগণ অনুমান করিলেন তাঁহাদের পিতৃগুরু সামান্য মানুষ ছিলেন না। তিনি তিব্বতী পাহাড়ের একজন গুহাবাসী তাপস ছিলেন।

এ সম্বন্ধে শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিমজীবনীতে' দুই একটি উক্তি সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "অবশেষে ১২৮৭ সালে যখন তাঁহার পবিত্র দেহ গঙ্গাতীরে বহিয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন তাঁহার সঙ্গে পৈতা ও খড়মও গিয়াছিল। তিনটি জিনিষ এক চিতায় ভস্মীভূত হইল।" পূর্ণচন্দ্রের উক্তিই যে সত্য, এ বিষয়ে আরও অকাট্য প্রমাণ আছে। যাদবচন্দ্র পরলোক গমন করেন ১৮৮১ সালের

*শ্যামাচরণ পিতার মৃত্যুসময়ে রাজকার্য্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

জানুয়ারী মাসে। তার শ্রাদ্ধান্তে কর্ম্মস্থানে যাইবার পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামাচরণ জ্যোতিশচন্দ্রকে ১৮।২।৮১ তারিখের চিঠিতে লিখিতেছেন—"তোমার ঠাকুর দাদার পূজার খড়ম জলে ভাসাইয়াছ কিনা ?"

মন্ত্র প্রদান করিবার পরে সেই হিমালয়বাসী সন্ন্যাসী যাদবচন্দ্রকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসেন—"তোমার চারিটী পুত্র-সন্তান হইবে। সকলেই সম্মানসূচক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন এবং তন্মধ্যে একজন চিরকালের জন্য বংশ গৌরবান্বিত করিবেন, এবং তুমি (যাদব) নিজে প্রপৌত্রের মুখ দেখিয়া পরলোক গমন করিবে।"

সেই প্রসিদ্ধ 'একজন'ই বঙ্কিমচন্দ্র।

যাদবচন্দ্র নিজেও পৌত্রী শরৎকুমারীকে বরাবর গল্পচ্ছলে বলেন ঃ—

"তোর বাবাই আমার বংশোজ্জ্বলকারী সন্তান।"

যাদবের গুরুকৃপালাভও রাধাবল্লভের কৃপায়ই হইয়াছিল, আর এই সন্ন্যাসীরও প্রত্যেকটী কথাই সত্যে পরিণত হইয়াছে।

এই সন্ন্যাসী-ঘটিত ব্যাপার বঙ্কিমলেখনীর উপরে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যে এই মহান চরিত্র প্রায় পুস্তকেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "চন্দ্রশেখরে" রমানন্দ স্বামী যোগবলে শৈবলিনীর পুনর্জ্জন্ম আনয়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু "আনন্দমঠের" চিকিৎসক যেন সত্যই যাদবচন্দ্রের জীবনের ন্যায় জীবানন্দের মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছিলেন। রমানন্দ স্বামী ও চিকিৎসক উভয়েই ছিলেন পরমযোগী ত্রিকালজ্ঞ তাপস, তবে চিকিৎসক যেন সত্যই সেই মহাপুরুষ। 'আনন্দমঠে' বর্ণিত আছে* ঃ

*আনন্দমঠ ৪র্থ খণ্ড—(৭ম পরিচ্ছেদ)

যুদ্ধান্তে জীবানন্দের দেহ না পাইয়া শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর সকরুণ ধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। শান্তি চাহিয়া দেখিল—এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—সম্মুখে প্রকাণ্ডাকার জটাজূটধারী মহাপুরুষ।

শবরাশি নাড়িয়া সেই মহাবলবান পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল, সেই জীবানন্দের দেহ। শান্তি সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, "কাঁদিও না মা, জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া উহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ী দেখ।"

শান্তি শবের নাড়ী টিপিয়া দেখিল, কিছুমাত্র গতি নাই; সেই পুরুষ বলিলেন—"বুকে হাত দিয়া দেখ।"

শান্তি হৃদপিণ্ডে হাত দিয়া দেখিল কিছুমাত্র গতি নাই; সব শীতল।

সেই মহাপুরুষ আবার বলিলেন, "নাকের কাছে হাত দিয়া দেখ—কিছুমাত্র নিঃশ্বাস বহিতেছে কি?"

শান্তি দেখিল, কিছুমাত্র না।

মহাপুরুষ বামহস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন, বলিলেন, "তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ! তাই বুঝিতে পারিতেছ না—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে। আবার দেখ দেখি।"

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে। বিস্মিত হইয়া হৃদপিণ্ডের উপরে হাত রাখিল—একটু ধক্ ধক্ করিতেছে। নাকের আগে অঙ্গুলি রাখিল—একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে! মুখের ভিতর অল্প উষ্ণতা পাওয়া গেল। শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল,

"প্রাণ কি ছিল? না আবার আসিয়াছে?"

তিনি বলিলেন "তাও কি হয় মা! তুমি উহাকে বহিয়া পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে? আমি চিকিৎসক, উহার চিকিৎসা করিব।"

শান্তি অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন—

"তুমি উহাকে লইয়া গিয়া, রক্ত সকল ধুইয়া দাও। আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।"

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া রক্ত ধৌত করিল। তখনই চিকিৎসক বন্য লতাপাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন। তারপর, বারংবার জীবানন্দের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল।...শান্তি বলিল "এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই! কাহাকে প্রণাম করিবে?

জীবানন্দ বলিলেন "শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ। আমার শরীরে আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—।

এই চিকিৎসকই যেন যাদবচন্দ্রের প্রাণদাতা সন্ন্যাসী।

এই চিকিৎসকই সত্যানন্দকে জ্ঞানলাভ করিবার পর হিমালয়-শিখরে নূতন মাতৃমূর্ত্তি দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইনিই আবার 'সীতারামের' গঙ্গাধর স্বামী পরমযোগী ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। জ্ঞানী চাঁদশা ফকিরও সর্ব্বভূতে সমদর্শী। ইঁহারা সকলেই প্রকৃত সিদ্ধ মহাপুরুষ।

অন্যান্য পুস্তকেও যাদবচন্দ্রের প্রাণরক্ষার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, এবং সন্ন্যাসী চরিত্রেরও ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সে সকল সন্ন্যাসী উক্ত জ্ঞানী সন্ন্যাসীদের তুলনায় বোধ হয় নিম্নতর শ্রেণীর। বিষপান করিয়াও 'আনন্দমঠের' কল্যাণী সন্ন্যাসীর ঔষধে বাঁচিয়াছিল—সন্ন্যাসীর কৃপায় রজনীর অন্ধত্ব মোচন হইয়াছিল এবং সংসার-ত্যাগী গৈরিক

বসন পরিহিত জনৈক ব্রহ্মচারী মুমূর্ষা সূর্য্যমুখীর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। যাদবচন্দ্রের ন্যায় তাঁহারও একটু দুগ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল। 'মৃণালিনীর' মাধবাচার্য্য, 'আনন্দমঠের' সত্যানন্দ এবং 'দেবী চৌধুরাণীর' ভবানী পাঠক তিনজনই কর্ম্মসন্ন্যাসী, দেশ রক্ষার্থে প্রাণোৎসর্গ করিয়াছেন। আর 'দুর্গেশনন্দিনীর' অভিরাম স্বামীও ছিলেন হিন্দুরাজ্যের পরমশুভার্থী। প্রতি চরিত্রই বঙ্কিমের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। পক্ষান্তরে তান্ত্রিক কাপালিক যে শক্তি-পূজার জন্য নরবলির আয়োজন করিত, সেই বিপরীত দিকটিও "কপালকুণ্ডলায়" প্রদর্শিত হইয়াছে। এই চরিত্রও তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ক্রমে তাহাও বিবৃত করিব। এবং আমরা পরে দেখাইব যে, কাপালিকের ক্রমসাধনার পরিণতিই 'চন্দ্রশেখরের' রমানন্দ স্বামী ও একেবারে সম্পূর্ণ পরিণতি 'আনন্দমঠের' চিকিৎসক বা মহাপুরুষে।

স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহোদয়ের স্মৃতিকথা হইতে (প্রদীপ ১৩০৬) বুঝিতে পারা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী সম্বন্ধে সব কথাই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ পিতার ন্যায় তিনিও এ প্রসঙ্গে আলোচনায় বিরত থাকিতেন। তবে এ সম্বন্ধে আর একটী বিষয় ভাবিবার আছে। অভিরাম স্বামী, কাপালিক, মাধবাচার্য্য চরিত্র যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে রচিত। কিন্তু চিকিৎসক ও গঙ্গাধর স্বামী মৃত্যুর পরে রচিত। পরবর্ত্তী চরিত্র দুইটী রচিত হইবার পূর্ব্বে অপর একটী অদ্ভুত ঘটনা বঙ্কিমলেখনী আরও সচেতন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রও পূর্ণচন্দ্র উভয়েই এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটি রামপণ্ডিত মহাশয়ের কথায়ই বিবৃত করিতেছি* :

---

*স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর ৺মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, জয়পুর মহারাজার কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্য এম, এ, ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্ এ, মহাশয় ৺রামপণ্ডিত মহাশয়ের কাছে শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

"যাদব বাবুর ঐহিক জীবন দান করিবার পরে যখন পারত্রিক জীবনেরও তিনিই কাণ্ডারী হইলেন, সেই সময়ে গুরুদেব বলিয়া গিয়াছিলেন "যাদব, আমি তোমার সহিত আরও দুইবার দেখা করিব। একবার মধ্যে এবং একবার জীবনের অন্তিমসময়ে।"

"মধ্যে একবার কোন একটী পাহাড়ে তাঁহার সহিত দেখাও হয়।

"যাদব বাবুর কোষ্ঠীতে ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু লেখা ছিল। তিনি সেই বিশ্বাসে ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতেন এবং মধ্যমপুত্র সঞ্জীবকে ডাকিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাছে রাখিয়াছিলেন।

একদিন সঞ্জীব বাবু পূজার দালানে অভ্যাসমত কিছু লিখিতেছিলেন। রাম পণ্ডিত মহাশয় ও কীর্ত্তি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা (নকুড়চন্দ্র) সেখানে ছিলেন। এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসী ৺রাধাবল্লভের মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'এ মন্দির কাহার?' নকুড় বাবু বলেন—

'এ মন্দির যাদববাবুর, তিনি ঐ দিক্‌কার পূজার দালানে (সদরে)।'

তখন ঐ সন্ন্যাসী উভয় প্রাঙ্গণের মধ্যবর্ত্তী দ্বার দিয়া একেবারে যাদব বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

যাদববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে এবং কি জন্য আসিয়াছেন?'*

সন্ন্যাসী—ক্যা বেটা তোম্ হাম্‌কো পচানা নেহি? তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই?

যাদব—আজ্ঞে, না।

---

*বাবু নরেশ মুখোপাধ্যায় বলেন "সন্ন্যাসীকে সাধারণ লোক মনে করিয়া তাঁহার হাতে একখানি সিকি দিয়াছিলেন।"

সন্ন্যাসী—আসিবার কথা ছিল, তাই আসিয়াছি। যাহাহউক তোমার একটী পুত্রের পৌত্র হইবে।

এই বলিয়া একটী মাদুলি* দিয়া তিনি পুনরায় ৺রাধাবল্লভের আঙ্গিনা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসী যখন সদর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যান তখন যাদব বাবু আবার তাঁহাকে দেখিতে পান। তখন, "তোমরা কে নিকটে আছ, শীগ্গীর এস" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করেন। রাম পণ্ডিত প্রভৃতি সকলে সেখানে উপস্থিত হইলে তিনি বলেন—এই সন্ন্যাসী যিনি এখন গেলেন, তাঁহাকে যেখান হইতে হউক ফিরাইয়া আন।" তাঁহারা রেল লাইন পার হইয়া যখন রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর নিকটে চৌমাথায় আসিলেন তখন আর সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

তার পরে রাম পণ্ডিত ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন। তাহাতে যাদব বাবু অত্যন্ত পরিতাপের সহিত বলিলেন, "আমি পাপী, আমি উঁহাকে চিনিতে পারিব কেন? আমি মোহ বশতঃ উঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ইনিই আমার গুরুদেব।"

এই বলিয়া সকল ঘটনা বলিলেন।†

রাম—সে কি, তিনি আপনার গুরু কিরূপে হইলেন? ইনি তো যুবাপুরুষ। ঘটনা ত প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বের

যাদব—আমি বৈতরণীতে তাঁহাকে ঐ অবস্থাতেই পাই। আমার শেষ সময়ে তাঁহার আমার সহিত দেখা করিবার কথা ছিল, তাই আসিয়াছিলেন।

* মাদুলিটী কিছুদিন পরে ভ্রমক্রমে বাড়ীর লোক হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন

† গুরু সম্বন্ধে যাদবচন্দ্রের এই প্রথম বিবৃতি।

তাহার পর দিন পূর্ণ বাবুর পৌত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে যাদববাবু একখানি স্বর্ণালঙ্কার সহ ঔষধ ধারণ করাইয়া দেন, সেই দিনই তিনি জ্বরাক্রান্ত হন। এবং ৪।৫ দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।*

এ বিষয়ে পূর্ণচন্দ্রও লিখিয়াছেন—

"পিতৃদেবের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার গুরুদেব যে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুশয্যার প্রলাপে ব্যক্ত হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই প্রলাপে বলিতেন—'আমি এমনই পাপী যে, আমার গুরুদেব আসিলেন, আমি তাঁহাকে চিনিলাম না।' অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, সত্য সত্যই একজন সাধুবেশধারী সন্ন্যাসী নাকি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

নারায়ণ ১৩২২, ভাদ্র।

পূর্ব্বোক্ত উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রও সমর্থন করিয়াছেন। স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত লিখিতেছেন—"বঙ্কিমবাবুর পিতৃদেব পূজনীয় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন সন্ন্যাসী গুরু বা উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি একবার তাঁহার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার মৃত্যু-ঘটনার ঠিক সাত দিন পূর্ব্বে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার অঙ্গীকার করিয়া যান। এই অঙ্গীকার মত যাদববাবুর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। যাদববাবুর কোন পীড়ার সময় এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। এই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিম আরও অনেক কথা বলিয়াছেন।......"

১৩০৬, প্রদীপ।

---

* যাদব দেখিবেন বলিয়া একটু গড়িমসি করিতেছিলেন। কিন্তু কন্যা নন্দরাণী কাছে লইয়া আসেন। যাদব বলেন "আঃ পাপিষ্টি, এনেছিস ?"

কালীনাথ বাবুর কথা স্বর্গীয় ললিত মিত্রের* উক্তিতেও সমর্থিত হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীর সহিত বঙ্কিম-জীবনের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে কিনা? এ সম্বন্ধে জ্যোতিশচন্দ্র স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন—

'বঙ্কিমের পরলোক প্রাপ্তির কয়েক মাস পূর্ব্বে পিতামহের শ্রীগুরুদেব প্রেরিত জনৈক সন্ন্যাসী হিমাচল লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

প্রকৃত ঘটনাটী পূর্ণচন্দ্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার কথাই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে একদিন রবিবার গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ও আমি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছি এমন সময়ে এক ব্যক্তির সহিত বাটীর সামনের গলিতে দেখা হইল তাঁহার পরিধানে মালকোঁচামারা গেরুয়া ধুতি, গায়ে গেরুয়া জামা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ী। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া হিন্দি ভাষায় বলিলেন, "আপনি কি বঙ্কিম বাবু? আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

বঙ্কিচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন?

গেরুয়াধারী উত্তর করিল—'আমি তিব্বত হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানের কোন ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।"

বঙ্কিম। সে দেশের কোন ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ নাই।

গেরুয়াধারী। আপনার নাই, আপনার পিতার ছিল।

---

* ললিত বাবু প্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র

তখন বঙ্কিম তাঁহাকে সম্মানের সহিত গৃহে লইয়া গেলেন। সদর মহলের তেতলার একটি ঘরে (যে ঘরে বসিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেন) প্রবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন। আমি দোতালার বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলাম। রাত্রি প্রায় আটটার সময় দুয়ার খুলিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ঐ ব্যক্তির সহিত কি কথোপকথন হইয়াছিল এবং উনি কে ?"

কোন উত্তর পাইলাম না।

পূর্ণচন্দ্রের উক্তি রামপণ্ডিত মহাশয়ের স্মৃতিকথায়ও সমর্থিত হইয়াছে। উহাতে লিপিবদ্ধ আছে—

"বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বঙ্কিম একে সন্ন্যাসী-ভক্ত, তাহাতে রুদ্ধদ্বার-কক্ষে সন্ন্যাসীর সহিত প্রায় দুইঘণ্টাকাল কথোপকথনে মগ্ন। পাছে সন্ন্যাসীগ্রস্ত হন এই ভয়ে তাঁহার স্ত্রী স্বয়ং দরজা ঠেলিতে লাগিলেন। বঙ্কিম বিরক্ত হইয়া দরজা খুলিয়া দেন। কিন্তু কি কথা হয় তাহা অপ্রকাশ। কিছুদিন পরেই তাঁহার জ্বর হয়…"

ব্রজেন্দ্র সুন্দর বলেন—

"রাজলক্ষ্মী দেবী কথোপকথনের কথা বলিতে পীড়াপীড়ি করিলে বঙ্কিম অগত্যা উত্তর করেন, "আচ্ছা বলিব, বৈশাখী পূর্ণিমার পরে তোমাকে বলিব।" কিন্তু নশ্বর দেহধারী বঙ্কিমের নিকট সেই বৈশাখী পূর্ণিমা আর সমাগত হয় নাই।

রামপণ্ডিত মহাশয় বলেন—

"বঙ্কিমের মৃত্যুর পর এক সন্ন্যাসী পূর্ণ বাবুর সহিত দেখা করেন। তিনি বলেন 'আমি যাদব বাবুর গুরুর শিষ্যের শিষ্য। যাদবের গুরু এখনও বর্ত্তমান, তিনি মানসসরোবরে। তাঁহার শিষ্যকে তিনি

বঙ্কিম বাবুর কাছে নিজের কিছু বক্তব্য বলিবার* জন্য পাঠান। আমি আপনারা কেমন আছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।”

বঙ্কিমের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই হরিসাধন বাবুও লিখিয়াছেন (পুরোহিত জ্যৈষ্ঠ ১৩০১— পৃঃ ৮০):

“আমরা শুনিয়াছি মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত নিভৃত গৃহে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের কি কথোপকথন হয়, তাহা বঙ্কিম বাবু প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। এইরূপ জনশ্রুতি, তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে নাকি এইরূপ একজন সন্ন্যাসী দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব রহস্য নিহিত আছে।”

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ঘটনাবলী অনুধাবন করিলে স্বতঃই ধারণা জন্মে যে, যাদবের প্রাণরক্ষা, দীক্ষা ও ভবিষ্যদ্বাণী, বঙ্কিমের জন্ম, বঙ্কিমের কার্য্যাবলী, বঙ্কিমের মৃত্যু সবই যেন এক মহাশক্তির প্রভাবে প্রতিভাত। এ ঘটনাবলী অলৌকিক হইলেও অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি।

কিন্তু যাদবচন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের ছিল তাহার পত্নী দুর্গাসুন্দরী।

নরেশচন্দ্র ও শচীশচন্দ্র বলেন “বঙ্কিমের মাতা সাতিশয় স্থূলাঙ্গী ছিলেন। কিন্তু এরূপ উন্নত-হৃদয়া করুণাময়ী শান্ত মূর্ত্তি ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।” জ্যোতিশচন্দ্র বলিতেন ঠাকুরমার কথা ছিল—“দাদা, যাহার যা সহে, তাহা করা ভাল, যাহা সহে না, তা করা ভাল নয়। আমরা গৃহস্থ লোক, আমাদের বাবুয়ানীতে কাজ কি?”

দুর্গা দেবী শিক্ষিতা ছিলেন না বটে, কিন্তু বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তিতে পাকা গৃহিণী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ‘দেবীচৌধুরাণীতে’ ব্রজেশ্বরের মাতার চরিত্রে নিজের মায়ের কতকটা আভাস দিয়াছেন।

* এই ঘটনাই পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রজেশ্বরের মায়ের মত তিনিও নাকি পা ছড়াইয়া পাকা চুল তুলাইতেন। যশম, খাঁদি, নথ ও বাউটীও নাকি সেইরূপ পরিতেন। তিনি লালপেড়ে কাপড় পরিতেই ভাল বাসিতেন। পাঠককে নিম্নে সেই চরিত্রের পরিচয় দিতেছি।

"যখন গিন্নী ঠাকুরাণী হেলিতে দুলিতে বাউটীর খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্ত্তামহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা, তখন কর্ত্তামহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; হাতে মুখে জল দেওয়া হইয়াছে, হাত মুখ মুছা হইতেছে। দেখিয়া কর্ত্তার মনটা কাদা করিয়া ছানিয়া লইবার জন্য গৃহিণী ঠাকুরাণী বলিলেন—

'কে ঘুম ভাঙ্গাইল? আমি এত ক'রে বারণ করি, তবু কেউ শোনে না।'

কর্ত্তা মহাশয় মনে মনে বলিলেন—"ঘুম ভাঙ্গাইবার আঁধি তুমি নিজে—আজ বুঝি কি দরকার আছে?" প্রকাশ্যে বলিলেন "কেউ ঘুম ভাঙ্গায় নাই। বেশ ঘুমাইয়াছি—কথাটা কি?"

গিন্নী মুখখানা হাসি-ভরাভরা করিয়া বলিলেন "আজ একটা কাণ্ড হ'য়েছে, তাই বল্‌তে এসেছি।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া এবং একটু একটু নথ ও বাউটী নাড়া দিয়া—কেননা বয়স এখনও পঁয়তাল্লিশ মাত্র।"

অন্যত্র আছে—

"কর্ত্তা মহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন। গৃহিণী ব্যজনহস্তে ভোজন পাত্রের নিকট শোভামানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারীধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে।"

আর একস্থানে আছে—

"আমরা স্বীকার করি, গিন্নী এবার বড় গিন্নীপনা করিয়াছেন। যে সংসারের গিন্নী গিন্নীপনা জানে, সে সংসারে কারও মনঃপীড়া

থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি ?”

দেবীচৌধুরাণী ৩য় খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক, এই ব্রজেশ্বর-জননীই রক্ত মাংসের দেহঘটিত বঙ্কিমচন্দ্রের গর্ভধারিণী দুর্গাঠাকুরাণী। ইনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাদবচন্দ্রের গৃহ অলঙ্কৃত করিয়া ‘মেদাস্বস্তি’ ব্যারামে ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমের জননী সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই তাঁহার মাতামহ বংশের কিছু পরিচয় একান্ত আবশ্যক। দুর্গামণি দেবী স্বনামধন্য পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কন্যা। হুগলীতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একটী প্রকাণ্ড চতুষ্পাঠী ছিল। তাহাতে অনেক ছাত্রের ভরণপোষণ হইত। ইনি অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বয়ং ‘গীতগোবিন্দ’ ও ‘মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের’ টীকা করিয়াছিলেন। পূর্ণচন্দ্র বলেন “আমাদের মাতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ব্যয়ে ও বহু যত্নে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি সেকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখনতো বটেই। বঙ্কিম বাবুর সংস্কৃতের দিকে বড় ঝোঁক দেখিয়া আমাদের মাতুল ঐ সমস্ত গ্রন্থ তাঁহাকে দিয়াছিলেন।”

নারায়ণ, ভাদ্র, ১৩২২

জাতীয় মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির অদ্ভুত প্রতিভার উৎস কোথায়, তাহা দেখাইবার জন্য বংশ পরিচয়টা একটু দীর্ঘ হইয়াছে। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে মহামানবের জন্ম কখনও আকস্মিক হয় না। বহু শতাব্দী, বহু যুগ যুগান্তর হইতে তাঁহার আবির্ভাবের আয়োজন চলিতে থাকে। আর নানারূপ বিরাট শক্তির পারি-পার্শ্বিকতায় সেই শক্তির উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। “আকরে

পদ্মরাগানাং জন্ম কাঁচমনেঃ কুতঃ।" রামচন্দ্রের আবির্ভাব ভগীরথের বংশেই হইয়াছিল, প্রতাপসিংহের জন্মও রামচন্দ্রের বংশেই হয়, আর নেপোলিয়ানেরও জন্ম হয় যোদ্ধ-বংশেই। পরবর্ত্তী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও জন্মগ্রহণ করেন এক অতি প্রতিভাশালী বংশে। একজন বিখ্যাত চরিত লেখক সত্যই লিখিয়াছেন—

"Great men are not accidents. Great works are not accomplished in a single day. Both are the products of adequate causes. The great man springs from an ancestry competent to produce him. He is the final flower and the ultimate outcome of converging herilditary forces that culminate at last in the full production of his splendid and exceptional personality. The great work which it is his mission to perform in the world is never wholly of his own inception."

"মহাত্মাগণের আবির্ভাব সহসা হয় না। মহৎ কাজ সম্পাদনও একদিনেই সম্ভব হয় না। এই উভয় সংঘটনই উপযোগী ঘটনা পরম্পরার শেষ ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহাপ্রাণ ব্যক্তি যে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, সে কেবল তাহার নিজের উদ্ভাবিত কার্য্যই নহে, উহা পূর্ব্বানুগামী অবস্থা সমূহের চরম পরিণতি মাত্র।"

আমরা দেখিয়াছি যে, এই বংশের আদি পুরুষ দক্ষ ছিলেন অসাধারণ বেদবিদ্ পণ্ডিত, এই বংশেই দুইজন অবসথী জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশের রামজীবন ছিলেন পূতচরিত্র, শিবনারায়ণ তেজস্বী, বদান্য ও স্পষ্টবাদী, যাদবচন্দ্র দেবানুগৃহীত, নিষ্কলঙ্ক, উদ্যোগী

পুরুষ সিংহ। আর স্বয়ং রাধাবল্লভজী এই বংশের সন্তানগণকে বরাবর আশ্রয় দিয়াছেন। তাই এই বংশই যে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির যোগ্যক্ষেত্র হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

যাদবচন্দ্রের চারিপুত্রই সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। চারিজনই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতেন।……তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণের জন্ম-গ্রহণের ৮ বৎসর পরে সঞ্জীবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারও প্রতিভা বড় কম ছিলনা। চন্দ্রের ন্যায় উহা স্নিগ্ধ কিরণাভা বিকীরণ করিত। প্রকৃতিদেবী কিন্তু কেবল সেটুকু দিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। আবার তিনি চারি বৎসর পরে রবিকরোজ্জ্বল প্রতিভার অবতার বঙ্কিম-চন্দ্রের ন্যায় সুসন্তান প্রসব করিয়া আপনার কার্য্যের গৌরব আপনিই নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন—দেখিয়া পরিতৃপ্তি উপভোগ করিলেন। বঙ্কিমের জন্মভূমি উজ্জ্বল হইল, বাঙ্গালী আবার মানুষ হইবার সন্ধান পাইল, আর আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসী সম্মিলিতকণ্ঠে জয়োল্লাস করিয়া উঠিল, **"বন্দেমাতরম্"**

বঙ্কিমচন্দ্র

তৃতীয় অধ্যায়—শিশুকাল ও শিক্ষা

ইংরাজী ১৮৩৮ অব্দে ২৬শে জুন, সন ১২৪৫ সালের ১৩ই আষাঢ় মঙ্গলবার রাত্রি ৯টা ৩ মিনিটে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীর পশ্চাৎদিকের একটি প্রকোষ্ঠে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম তারিখ ১৭৬০শক ২।১২।৩৯।৩১ ।*

বঙ্কিমের রাশি ছিল সিংহ, নক্ষত্র মঘা। তিনি শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে ভূমিষ্ঠ হন্।

বঙ্কিমের পিতা বোধ হয় অগ্রেই বুঝিতে পারিয়া ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন।

বঙ্কিমের জন্মরাত্রি প্রাবৃটের নিশা হইলেও আকাশ তখন মেঘমুক্ত ছিল। দ্বিপ্রহরের আহারের পরেই বঙ্কিমজননী প্রসববেদনা অনুভব করেন, আর সন্ধ্যা সমাগমে সেই বেদনা দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠে।

---

*জন্ম তারিখ সম্বন্ধে অনেকেই ভুল করিয়াছেন। দিবোন্দুসুন্দর (বঙ্গদর্শন ১৩১৮ আষাঢ়) ও শচীশচন্দ্র বলেন ১৭৬১ শকাব্দা ২৭শে জুন, ১৩ই আষাঢ়। বাবু অমরেন্দ্রনাথ রায় বলেন ২৭শে জুন, ১৩ই আষাঢ়, কোথাও বা ২৭শে জুন ১১ই আষাঢ়। 'বঙ্কিম সংখ্যায় শনিবারের চিঠি' দিয়াছিল রবিবার ২৭ জুন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর সঠিক তারিখটী নির্ণয় করিয়াছেন (১৩৪৫, ২৭ আষাঢ় মঙ্গলবারের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' দ্রষ্টব্য।)

জন্ম-পত্রিকা পাঠক পরিশিষ্টে পাইবেন।

বঙ্কিমের জন্মের পূর্ব্বে অদ্ভূত শঙ্খধ্বনি হইয়াছিল। সেই শঙ্খ-ধ্বনি শ্রবণে গ্রামের অনেকেই পুত্র হইয়াছে মনে করিয়া দেখিতে যান। কিন্তু যাইয়া দেখেন শিশু তখনও ভূমিষ্ঠ হয় নাই। এই শঙ্খধ্বনি কোথা হইতে আসিয়াছিল বা কে করিয়াছিল কেহ বুঝিতে পারেন নাই।*

বঙ্কিম যখন জন্মগ্রহণ করেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া সবে ইংলণ্ডের সিংহাসনারূঢ়া হইয়াছেন, আফগানযুদ্ধে বৃটিশ রাজনীতিকগণ বিব্রত হইতেছেন, আর পঞ্চনদের শৌর্য্যভাস্কর রণজিৎসিংহ ক্ষমতাগর্ব্বে ইংরাজ-ভীতি সঞ্চারে সমর্থ হইলেও রুগ্নশয্যায় তখন মৃত্যুপথ-যাত্রী। পশ্চিমাকাশে ভারতের গৌরবতপন যখন অস্তগিত হইতেছিল, পূর্ব্বগগনে বঙ্কিম-সূর্য্য তখন উদিত হইতে লাগিল। পঞ্চনদে ভাঙ্গন ধরিল, বঙ্গদেশ গড়িবার বীজ প্রাপ্ত হইল। শতদ্রু, ইরাবতী থমকিয়া দাঁড়াইল, আর ভাগীরথী কলকলনাদে নাচিতে নাচিতে এই শুভবার্ত্তা সাগরবক্ষে বহন করিয়া আনিল। এই সন্ধিক্ষণেই বঙ্কিমের আবির্ভাব।

পাঁচ বৎসর বয়সে বঙ্কিমের হাতেখড়ি হয়। মাদ্রাল নিবাসী কুলপুরোহিত বিশ্বম্ভর ঠাকুর হাতেখড়ি দেন। বঙ্কিম শিশু বয়স হইতেই ধীর, শান্ত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাবী ছিলেন। গুরু মহাশয় হাতেখড়ি দিয়া ক, খ, লিখিয়া দিলেন। আর দ্বিতীয়বার দেখাইতে হইল না, একদিনেই তিনি ক, খ, গ, ঘ, ঙ, অ, আ, আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও পিতার সঙ্গে বীরসিংহ হইতে কলিকাতা আসিতে নয় দশটা মাইলষ্টোন দেখিয়া পিতাকে বলিয়াছিলেন "বাবা এইবার আমার ইংরাজী গণনা সম্পূর্ণ শেখা হইয়াছে।"

*দিব্যেন্দুসুন্দর রচিত 'বঙ্কিম কথা'—সমালোচনী ১ম বর্ষ, পৃঃ ২৭৬

পৈত্রিক বাটী

দক্ষিণ দিক্ হইতে দেখিলে পশ্চিমে রেলওয়ে গেট্ (এখন নাই), সম্মুখের দোতলা অংশে বঙ্কিমবাবু থাকিতেন তাহার পূর্ব্বে সহোদরগণের বৈঠকখানা ছিল, পশ্চিমে স্ত্রী-মহল। দোতলার নীচে খিড়কীর দরজা, এই দরজা দিয়াই ঝি বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিতে আসিত। ক্রসচিহ্নিত স্থানে একখানা ঘর ছিল, এই ঘরেই বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম বর্ণমালাও শীঘ্র শীঘ্র শিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এতাদৃশ মেধা দেখিয়া গুরুমহাশয় নাকি একদিন বলিয়াই ফেলিলেন, "বাপু, এ রকম করে যদি শিখে ফেলো, তা হ'লে আমি ক'দিন তোমাকে পড়াতে পারবো ?" বঙ্কিম চলিয়া যাওয়ার পরে কোন ছেলের প্রশংসা করিতে হইলে গুরুমহাশয় বলিতেন— "বঙ্কিম যেমন ছিল, এওবা সেইরকম হয়।*"

বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের পাঠশালায় শিক্ষা ও গুরুমহাশয় সম্বন্ধে একটু একটু পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন—"আমার মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র এই বেত্রপাণি দৌবারিকের হস্তে সমর্পিত হন। গুরুমহাশয় যদিচ সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি হাট বাজার করা ইত্যাদি কার্য্যে তাঁহার মনোনিবেশ বেশী ছিল, কেননা তাহাতে উপরিলাভের সম্ভাবনা। সুতরাং ছাত্রও বিদ্যার্জ্জনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। লাভের ভাগটা গুরুরই গুরুতর ছিল।†"

অতঃপরে মায়ের সঙ্গে উভয় ভ্রাতা মেদিনীপুর যান। কিন্তু শীঘ্রই আবার তাঁহাদিগকে বাড়ী আসিতে হয়। পরবর্ত্তী বিবরণে বঙ্কিম নিজেই লিখিয়াছেন—

"কিছুদিন পরে আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়া আসিতে হয়। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছুদিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন "গুরুমহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন; কেননা, আমাকে ক, খ শিখিতে হইবে। কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই

*সখা ১৮৯৪, জানুয়ারী পৃঃ ৫

† "সঞ্জীবনী সুধা"

সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের* হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আটমাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেইখানে তিন চারি বৎসর কাটিল।"

শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য অত্যন্ত মন্দ ছিল। তিনি সর্ব্বদাই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িতেন। অনেক সময় আত্মীয়স্বজনকে তাঁহার জীবনের আশা বিসর্জ্জন করিতে হইত। শারীরিক দৌর্ব্বল্য-হেতু তিনি কখনই বালক-সুলভ ক্রীড়া কুর্দ্দনে যোগদান করিতে পারেন নাই। কাঁটালপাড়া গ্রামের মধ্যে তাঁহার মত শান্ত ছেলে আর ছিলনা। যাহা হউক পরিজনবর্গের উদ্বেগের মধ্যে তাঁহার জীবনের প্রথম কয়েকটা বৎসর এইরূপেই কাটিয়া গেল।

মেদিনীপুরে

অনুমান ১৮৪৫।১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র জননী ও অগ্রজ সঞ্জীবের সহিত মেদিনীপুর যান এবং এবার তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়।

মেদিনীপুরের উপত্যকাভূমি, বিশাল বৃক্ষসমন্বিত শালবনরাজি, স্বল্পতোয়া পার্ব্বত্য নদীর শোভা, আর অপূর্ব্ব শোভাময়ী প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী তীরস্থ আম জাম সমন্বিত কাঁটালপাড়ার সৌন্দর্য্যে ঘোরতর পার্থক্য! এখানে স্বভাবের ভিন্ন এক রূপ প্রতিভাত হইয়া বঙ্কিমের কবি-নয়ন সার্থক করিল। জলবায়ু সম্বন্ধেও উভয় স্থানের ঘোরতর পার্থক্য—মেদিনীপুর উত্তাপ প্রপীড়িত শুষ্ক ভূমি আর কাঁটালপাড়া

*পাঠশালার এইরূপ পণ্ডিতগণের ছবি বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যের' "গ্রাম্য কথায়" অঙ্কিত করিয়াছেন। 'ভুক্ত' শব্দের ধাতু-প্রত্যয়, পণ্ডিতের ছাত্রের গালে চপেটাঘাত, ভোঁদার মায়ের সঙ্গে পণ্ডিত মশায়ের তর্ক, ভোঁদার মায়ের এক বাখারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূতছাড়া করিবার কথা—পাঠকের মনে থাকিতে পারে।

মেদিনীপুর জিলা-স্কুল

এই স্কুলে বঙ্কিমচন্দ্র পড়িতেন ; এখন উহাতে কলেজ বসে

সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা। প্রবাসে বসিয়া জন্মভূমির অনন্তরূপ বারম্বার কবিনয়নে প্রতিভাত হওয়াই স্বাভাবিক।

এই সময়ে মেদিনীপুরের একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়* ছিল; আর স্বনামখ্যাত মিঃ এফ, টিড্ ছিলেন উহার প্রধান শিক্ষক। সঞ্জীবচন্দ্র তখন তের বৎসরে পড়িয়াছেন এবং আসিয়াই এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন।

টিড সাহেবের খুব সুনাম ছিল। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষা দিতেন, শৃঙ্খলাও রাখিতেন চমৎকার।† ছাত্রগণ তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

সঞ্জীবের সঙ্গে বঙ্কিমও কখনও কখনও স্কুলে আসিতেন। সেখানে তাহার প্রতিভামণ্ডিত সুন্দর ছিপছিপে চেহারাখানি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"একদিন টিড সাহেব ক্লাশ পরিদর্শনে আসিয়া তাহার পরিচয় লইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের কথা বলিবার সময় তাঁহার যে এক বেলার মধ্যে বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, সে কথারও উল্লেখ করেন। টিড্ সাহেব শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং পরে তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান ও সতর্ক ছিলেন।"

*এই মেদিনীপুর স্কুল খৃষ্টীয় ১৮৩৪ অব্দে স্থাপিত হয়। ১৮৪০ সালে উহা জেলা স্কুলে পরিণত হয়—আর এখন উহা কলেজিয়েট্ স্কুল নামে খ্যাত।

†The Inspector who visited the school in Dec. 1845 says, "The more I examined into the discipline pursued and into Mr. F. Tydd's method of teaching, the more I am satisfied."

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় দেন। বস্তুতঃ পাঠে তাহার ক্ষিপ্রতা ও দ্রুত উন্নতি দেখিয়া শিক্ষকগণও বিস্মিত হইতেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া একবার জনৈক শিক্ষক বলিয়াছিলেন "এই ছেলেটী কি বস্তুতঃই শ্রুতিধর?" বঙ্কিম স্বয়ং লিখিয়াছেন যে যখন তাহার কেবলমাত্র একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম তখন তিনি রোলিয়াস্ সাহেবের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস, হিউমের ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক অতি যত্ন সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন।

(বঙ্গদর্শন ১৩১৮, শ্রাবণ পৃ: ১৫৩)

একথা যে, যথার্থই সত্য, তাহা বর্ত্তমান সময়কার মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও পুরাতন কাগজ হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

"While at the Midnapore Zilla School, he attracted notice for regular attendance and excellence in English and History."

বস্তুতঃ মেদিনীপুর জেলা স্কুলে তাঁহার ন্যায় মেধাবী ছাত্র আর ছিল না। মেদিনীপুরের শিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজের কথাও আছে। 'সখা' (১৮৯৪ জানুয়ারী) লিখিয়াছে—

"খৃঃ ১৮৪৬ অব্দে ইহার পিতা যখন মেদিনীপুরের ডেপুটী ছিলেন, সেই সময় ইঁহাকে সেখানকার ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। সেখানকার শিক্ষকেরা ইঁহাকে স্কুলে পাইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। বালককে পূরা এক বৎসর এক শ্রেণীতে রাখিতে হয় না—প্রতি ছয় মাস অন্তর এক এক ক্লাশ উপরে উঠাইয়া দিতে হয়, তবুও বালক যে ক্লাশেই উঠে, সেই ক্লাশেই সবার উপর হয়! সুতরাং

এইরূপে অতি উচ্চ শ্রেণীতে উঠিলে, এই বালকের মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে ইহার উপর ক্লাশে উঠা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।"

এই সমস্ত কথাগুলি যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরোক্ত কথাগুলি বাহির হয় বঙ্কিমের জীবদ্দশায়। তিনি এই সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কাছে নিজে বলিয়াছিলেন—"সখা নামক বালক পাঠ্য মাসিক পত্রে তাঁর বাল্যজীবনের যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা অনেকটা ঠিক। সত্য সত্যই কয় বৎসর তিনি বৎসরে দুইবার ক্লাশ প্রমোশন পাইয়াছিলেন। মধ্যম দৌহিত্র বার্ষিক পরীক্ষায় ক্লাশে প্রায় সব বিষয়ে প্রথম হইতেছে, অতএব সম্ভবতঃ তাঁর ছাত্রজীবনের গৌরব কতক সে রক্ষা করিতে পারিবে, সোৎসাহে এরূপ ভরসা করিয়াছিলেন।"

'সমালোচনী' প্রথম বর্ষ ১৩০৮-৯ পৃঃ ১৩

টিড্ সাহেব কিন্তু এই বিদ্যালয়ে অধিক দিন রহিলেন না। ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে তিনি ঢাকা বদলী হইয়া যান। এবং সিনক্লেয়ার সাহেব (Mr. Synclair) তাঁহার স্থানে হেড্মাষ্টার হইয়া আসেন Aug. 1847. মেদিনীপুরে বঙ্কিম টিড্ সাহেব ও মিঃ সিনক্লেয়ার ব্যতীত যে সমস্ত শিক্ষকদের নিকট পড়িয়াছেন তন্মধ্যে বৈকুণ্ঠ চাটার্জ্জি, ভোলানাথ ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন জানা যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। ক্ষেত্রমোহন পূর্ব্বে ঐ স্কুলেই অধ্যয়ন করিতেন। ১৮৪২ সালে জুনিয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ৮৲ মাসিক বৃত্তি লাভ করেন এবং পরে ১৮৪৪ সালে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ভোলানাথ ঘোষের নিকট বঙ্কিম ১।১ মাস মাত্র পড়িয়াছিলেন।

সিনক্লেয়ার সাহেব চলিয়া গেলে, মনস্বী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সংস্কৃত কলেজ হইতে আসিয়া ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হন। কিন্তু বঙ্কিম তাঁহার কাছে পড়েন নাই। তিনি ১৮৪৯ সালেই মেদিনীপুর ছাড়িয়া চলিয়া যান।

বঙ্কিমচন্দ্রকে টিড্ সাহেব ও তাহার পত্নী খুবই ভাল বাসিতেন। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্রকে বৈকালে টিড্ সাহেবের বিবি প্রায়ই লোক পাঠাইয়া লইয়া যাইতেন, বাসাও খুব কাছেই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন বৈকালে ঐ স্থানে যাইতেন। এই সময় মলেট্ নামক একজন সিভিলিয়ান মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। উভয় মেম সাহেবেরই পরস্পরের সহিত বিশেষ প্রণয় ছিল, মলেট্ সাহেবের বাসাও বঙ্কিমের বাসার নিকটেই ছিল। বঙ্কিম বসিয়া মেমসাহেবদিগের সহিত গল্প করিতেন, তাঁহাদের ছেলেরা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিত। কিন্তু বঙ্কিম দৌড়াদৌড়ি করিতে পারিতেন না।"

অল্প বয়স হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মসম্মান জ্ঞান খুব বেশী ছিল। ইতি পূর্ব্বে যে মলেট সাহেবের কথা বলিলাম, তাঁহার পরিবার সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"এইরূপ প্রায় তিন বৎসরকাল বঙ্কিম তাঁহাদের বাটীতে যাতায়াত করিয়াছিলেন। হঠাৎ একটা ঘটনায় যাতায়াত বন্ধ হয়। একদিন সন্ধ্যার সময় মলেট সাহেবের কুঠীর মাঠে টেবিল চেয়ার পড়িল, বিবিরা চা প্রস্তুত করিতে উঠিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে কুঠীর ভিতর হইতে একজন অপরিচিত সাহেব আসিয়া—আপনাদের ছেলেপেলেদিগকে ডাকিয়া লইয়া চা খাইতে গেলেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন না। বালক বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমানে আঘাত লাগিল, তিনি

তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন, পরে আর ঐ কুঠীতে যান নাই। ইহার কয়েকদিন পরেই যাদবচন্দ্র আলিপুরে (চব্বিশ পরগণা) বদলী হইলেন, এই সময় মলেট সাহেবের সহিত তাঁহার দেখা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কুঠীতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া সাহেব বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছিলেন।"

এইরূপে 'তিনচারি বৎসর কাটিবার পরে,' বঙ্কিমচন্দ্রকে মেদিনীপুর ছাড়িতে হয়। এ সময়ে যাদবচন্দ্র আলিপুরে বদ্‌লী হইয়া আসেন।

পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নূতন সেসন (Session) খুলিলে, তথায় ভর্ত্তি হইবেন, স্থির হইল। তাঁহার জন্য গৃহে একজন প্রাইভেট্ টিউটর নিযুক্ত হইল।" বঙ্কিম বলেন "পরীক্ষার অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আজি এ স্কুলে, কাল ও স্কুলে, আজি গুরুমহাশয়, কালি মাষ্টার, আবার গুরুমহাশয়, আবার মাষ্টার,—এইরূপ শিক্ষা বিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারুরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারে না।"

এরূপ পরিবর্ত্তনে সঞ্জীবচন্দ্রের ক্ষতি হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বেশী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

হুগলী কলেজ তখন 'মহম্মদ মহসীন কলেজ' নামে খ্যাত ছিল। সেসন তখন সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হইত। ১লা অক্টোবর হইতে আরম্ভ হওয়ার কথা থাকিলেও কার্য্যতঃ হইত পূজার ছুটীর পরে।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৪৯ সালের ২৩শে অক্টোবর কালীপূজার পরে ভর্ত্তি হন। আর তাঁহার বয়স ছিল তখন ১১ বৎসর চারিমাস ২৬ দিন।*

১৮৪৯ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৫৪এর এপ্রিল পর্য্যন্ত বঙ্কিম হুগলী কলেজের জুনিয়ার বিভাগে (স্কুলে) পড়েন। ১৮৫৪-৫৬ এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি সিনিয়ার বিভাগে (কলেজে) পড়েন। তৎপরে কলিকাতা গিয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগে ভর্ত্তি হন। এই অধ্যায়ে আমরা উক্ত দুইটী কলেজে লেখাপড়ায় বঙ্কিমের কৃতিত্বের পরিচয় দিব।

১। হুগলী কলেজে

হুগলীর স্কুল ও কলেজ একই বাড়ীতে হইত এবং পরস্পর সংস্পর্শযুক্ত ছিল।

স্কুল বিভাগের দুইটী উপ-বিভাগ ছিল—সিনিয়ার ও জুনিয়ার। সিনিয়ারে তিনটী শ্রেণী ও জুনিয়ারে ৪টী শ্রেণী ছিল। সিনিয়ার ডিভিসনে বেতন ছিল ৩৲ টাকা ও জুনিয়ার ডিভিসনে ২৲।†

১৮৪৯ অক্টোবর হইতে ১৮৫০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রথম বৎসরেই বঙ্কিম সাধারণ বিষয়ের কৃতিত্বের জন্য একটী পারিতোষিক

*Vide Admission Book of the Students of the Hoogly College, 1862.

No.	Name	Date of admission	Date of withdrawal	Remarks.
101	Bankim Chandra Chatterjee	23rd Oct. 1849.	12th July 1856.	Transferred to Presidency College.

১৮৪৯ সালে দুর্গাপূজা হয় ২৩শে সেপ্টেম্বর। একমাস ছুটী হয়। মেদিনীপুর স্কুলে পূজার ছুটী ছিল ৩৫ দিন।

† স্কুল বিভাগে মোট ৯টী ক্লাস বলিয়া রেকর্ডে পাওয়া যায়। বোধ হয় কোন কোন সেক্সনে ক্লাসের ন্যায়ই পড়া হইত।

প্রাপ্ত হন।* এই পুরস্কার লাভ হয় 'জুনিয়ার ডিভিসনের ফাষ্ট´ ক্লাস 'এ' সেক্‌সন' হইতে। বঙ্কিম সম্বৎসর এই শ্রেণীতেই ছিলেন কি ছয়মাস পূর্ব্বে নিম্নশ্রেণী হইতে এই ক্লাসে উঠিয়াছিলেন, ইহার সঠিক প্রমাণ নাই। ডবল প্রমোসনের বিষয়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।†

উক্ত শ্রেণীর (জুনিয়ার ডিভিসন ফাষ্ট´ ক্লাসএর) পাঠ্যতালিকাও বড় সহজ ছিল না। নিম্নে প্রদত্ত হইল –

Literature—Azimghur Reader, 2nd Poetical Reader,
Pinnock's Catechesipn of English History.

Grammar—Lennie's Grammar
upto 20th Rule of Syntax writing.

Arithmetic—Extraction of the Square Root, Vulgar Fraction.

Geography—Stewart's Geography, Europe, Asia and Africa.

Bengali—বাঙ্গালার ইতিহাসও জ্ঞানার্ণব।

পর বৎসর (১৮৫০—৫১) বঙ্কিম সিনিয়ার ডিভিসনের তৃতীয় শ্রেণীর 'এ' সেক্‌সনে পড়েন এবং এবারও সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় একটী পারিতোষিক লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী উমেশচন্দ্র শূরও পুরস্কার পান। ইনি ছিলেন 'বি' সেক্‌সনের ছাত্র। এই 'এ' ও 'বি' সেকসনের ছাত্রগণের মধ্যে কোন গুণপার্থক্য ছিল বলিয়া

*Report of the General Committee of Public Instruction 1849-50 p 105.

†হুগলীতে অধ্যয়নকালে ডবল প্রমোসনের স্বপক্ষেও কোন প্রমাণ উপস্থিত করা যায় না।

মনে হয় না। সেই বৎসর আর দুইজন ছাত্রও পুরস্কার পাইয়াছিলেন।*

পর বৎসর (১৮৫১-৫২) বঙ্কিম দ্বিতীয় শ্রেণীর 'এ' সেক্‌সন হইতে পুরস্কার না পাইয়াই প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পান এবং 'বি' সেকসনে পড়েন। কিন্তু এবার ১৮৫৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা না হইয়া পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে (১৮৫৪) হয়, কারণ 'অক্টোবর হইতে সেপ্টেম্বর' যে সেসন (সম্বৎসর) ছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া মে হইতে এপ্রিলে নির্দ্ধারিত হয়।† সুতরাং বঙ্কিম এবং তাহার সহাধ্যায়ীগণকে দেড় বৎসর পড়িয়া পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

১৮৫৪ সালের এপ্রিল মাসে জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় হুগলী কলেজ হইতে ৭৩ জন পরীক্ষা দেয়, (তন্মধ্যে 'বি' সেকসন হইতে ৩৫ জন) এবং মোট ৪৬ জন পাশ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন এবং ৭টা বিষয়ের মধ্যে এক Translation (অনুবাদ) ভিন্ন সব বিষয়েই তিনি প্রথম হন। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে নিম্নলিখিত ৭ জন ৮৲ টাকা হারে গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি পান ও পরের দুইজন (৮ম ও ৯ম)

---

*১৮৫০-৫১ এর মুদ্রিত Report এ তালিকা নাই; হস্তলিখিত annual report এর appendixএ (Dt. 3rd Oct 1851) Prizes বলিয়া নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় অংশ আছে—

Third Class Senior.

Bankim Chandra Chatterjee 'A' For General.

Amritalal Mitra 'A' Airthmetic.

Womesh Chandra Soor 'B' General.

Jadunath Mitra—Bengalee.

†এই বৎসরই কলেজ দেড় মাস গ্রীষ্মের ছুটি নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত হয় এবং সে বৎসর ১৬ই এপ্রিল হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত ছুটী ছিল।

জমিদারী বৃত্তি পান। গুণানুসারে তাহাদের নম্বর নিম্নে দেওয়া হইল। †

২৭৫$\frac{১}{২}$—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১)
২২৯$\frac{১}{৪}$—যাদবচন্দ্র রায় (২)
২২৮$\frac{১}{৫}$—রসিকলাল দত্ত (৩)
২২৫$\frac{৩}{৪}$—শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (৪)
২২২·৫—কুমুদচরণ বসু (৫)
২১৭—উমেশচন্দ্র শূর (৬)
২১০·$\frac{১}{৪}$—নবকৃষ্ণ রায় (৭)
২০৭·$\frac{৩}{৪}$—ভুবন মুখার্জ্জি (৮)
২০৭—দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি (৯)

২০৬$\frac{১}{৪}$—মহেন্দ্র মুখার্জ্জি এবং আরও কয়েকজন ছাত্র বৃত্তি পাওয়ার উপযুক্ত ছিলেন কিন্তু পান নাই।

শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ বীরচন্দ্র সেন পান ৯৩·৫

প্রথম ও দ্বিতীয়ের মধ্যে ব্যাকরণে বঙ্কিম পান ৪৫, যাদব ৪১, ইতিহাসে বঙ্কিম পান ৪১, যাদব ৩১, গণিতে উভয়ে ৩০, ভূগোলে বঙ্কিম পান ৪৬, যাদব ২১$\frac{১}{২}$, ইংরাজী সাহিত্যে বঙ্কিম ৪০, যাদব ৩৭, অনুবাদে বঙ্কিম ৩৪$\frac{১}{২}$, যাদব ৩৬$\frac{৩}{৪}$, মৌখিক পরীক্ষায় বঙ্কিম ৩৯, যাদব ৩২।

১৮৫৪ সালের জুনিয়ার বৃত্তিপরীক্ষার পাঠ্যতালিকা ঃ—

Prose—Selections from Goldsmith's Essays Cal. Ed.
Poetry—Selections from Pope, Prior and Akenside.
Political Reader No. III Pt. II (Last Ed.)
History—Knightley's Histoty of England Vol. I
Grammar—Crombie Part II

†Report of the General Committee of Public Instruction. Appendix D cccxxxlxp 1852—55. Result of the junior scholarship of the Hooghly College for 1853—54.

Geography and Map Drawing.
Mathematics—Euclid Books VI & XI
Algebra to the end of simple equations, Arithmetic.
Bengali—বেতাল পঞ্চবিংশতি 2nd Ed.
Bengali Grammar.

পরীক্ষা কয়মাস পিছাইয়া যাওয়ায় অতিরিক্ত ইংরাজী গদ্য, পদ্য, Grammar ও বাঙ্গলা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' দেওয়া হয়।

জুনিয়ার স্কলারশিপ্ পাশ করিবার পরে শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নামে আর একটী কৃতী ছাত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। বঙ্কিম, শ্রীকৃষ্ণ ও যাদব রায় প্রভৃতি কয়জনই কলেজের অর্থাৎ সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষার প্রথম বার্ষিক (চতুর্থ) শ্রেণীতে উন্নীত হন। অতঃপরে বাৎসরিক পরীক্ষায় (১৮৫৫) এবারেও বঙ্কিমই প্রথম হন ও তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তিটী বহাল থাকে। শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়েরও বৃত্তি থাকিয়া যায়। কিন্তু যাদব রায়, উমেশ শূর অপর সকলেই বৃত্তিচ্যুত হন। বঙ্কিম পান ৫০০ নম্বরের মধ্যে ২৭৬* আর শ্রীকৃষ্ণ ২৫৮.৫। তখন পর্য্যন্ত উভয়ে প্রায় সমানে সমানে যাইতেছিলেন।

সিনিয়ার স্কলারশিপের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় বঙ্কিম একেবারে "একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি" হইয়া পড়িলেন। পরীক্ষা হয় ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসে এবং মোট ১৩ জন পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তিধারী ছিলেন তখন মাত্র বঙ্কিম ও শ্রীকৃষ্ণ, আর

---

* বঙ্কিম সাহিত্যে ৭০এর মধ্যে পান ৩৯, দর্শন ও অর্থনীতিতে ৬০এর মধ্যে ৪৩, Pure Mathematics এ ১০০ মধ্যে ৪৯½, ঐ Mixedএ ৩৪, ইতিহাস ৭০এর মধ্যে ৫৬½, ইংরাজী রচনায় ৫০ মধ্যে ৩০, অনুবাদে ৫০ মধ্যে ২৪। Appendix LXXXIII Result of the Senior Scholarship Examination of the Hooghly College 1854-55.

যাদব রায় প্রভৃতি অন্যান্য সকলে স্কলারশিপ্ হইতে বঞ্চিত হইয়াও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার অধিকার পাইয়াছিলেন।

এবারেও বঙ্কিম সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া কুড়ি টাকা বৃত্তিলাভ করেন। তিনি মোট ৩৫৪'৮ নম্বর পান (Literature ৫৫, ইতিহাস ৮২, অঙ্কশাস্ত্রে ৬৭½ Natural Philosophyতে ৭৪'৩, অনুবাদে ৭৬)।

শ্রীকৃষ্ণ যদিচ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, তথাপি ২২৬'৯ নম্বর মাত্র পা'ন ও তাঁহার পূর্ব্বপ্রাপ্ত জুনিয়ার বৃত্তিটী বাজেয়াপ্ত হয়। আর যাদব রায় দশম স্থান অধিকার করিয়া মোটে ১৭৬'৬ পা'ন। উমেশ শূরের নাম পাওয়াই যায় না।

Senior Scholarship Examination-এর জন্য কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য একই ছিল ; কিন্তু সেখানে বঙ্কিম পড়েন নাই। বঙ্কিম যেখানে পড়িয়াছিলেন তাহার পাঠ্যতালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য* (প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর)

English—Addision (pp. 1—382) as far as No. 265.
Pope as contained in Richardson's selections.

Moral Philosophy—Aberocrombie's Moral feelings.

History—Keightley's Hist. of England Vol. II.

Physical Geography—Hughes' Physical Geography pp. 1-99.

Mathematics—I—VI X XI upto 21st Proposition, Algebra and Plane Trigonometry.

Surveying and Plan Drawing

Bengali—No fixed book in any class Only Translation and Grammar.

---

* General Report for 1855 p XIV

তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা এই : (D.P.I's letter 15.5.55)

For Second year Students.

English : Addison's Criticism of Milton; Johnson's Rasselas Bacon's Essays; Milton—1st and 2nd Books of Paradise Lost; Dryden's Absalom and Achitophel. Southey as much as is contained in Richardson's Selections.

History and Geography : The History of Rome to the death of Augustus. The History of England to the accession of James I (With the Geography of such countries as may be adverted to in the course).

Mathematics : Conic Sections

Mechanics as in Potter or Snowball.

Physical Science : Hughe's Physical Geography Chap. 1 to 9 Schoedler's Book of Nature, 1st Division pp 1 to 102 (including General Properties of matter, Phenomena of attraction, Phenomena of vibration as Sound, Heat and Light. Phenomena of Currents (as Electrcity and Magnetism).

Vernacular : Kadumburee

Bahyabustoor Suhit manub prukritir Sumbundha bichar Vol : 2.

(ভাবী) University Committeeর পরামর্শমতে Presidency Collegeএর General Branchএর জন্য এই পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তাহাই মফঃস্বলেও প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের সিনিয়র স্কলারসিপ্ পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর Mr. W. G. Young সাহেব হুগলী কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ Mr. Thwatesকে লিখিয়া পাঠান।
(No. 1091 from D. P. I. to Principal, Dated, 22nd May, 1856)

বঙ্কিম যে বৃত্তি পা'ন, তাহা সমস্ত বিষয়ে উচ্চতম শ্রেষ্ঠত্বের জন্য (Highest proficiency in all Subjects) আর এই বৃত্তিটী হুগলী কলেজেই দুই বৎসর (থার্ড ইয়ার ও ফোর্থ ইয়ারে) পাইবেন বলিয়া স্থির হয়।*

ঐ বৎসরে (১৮৫৬) প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১০ জন, হুগলী কলেজ হইতে ৭ জন, হুগলী মাদ্রাসা হইতে ৮ জন, কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে ৮ জন ও সংস্কৃত কলেজ হইতে ১০ জন পাশ হয়। অপর সকলে বৃত্তি পা'ন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের কৃতিত্বের জন্য, কিন্তু বঙ্কিম পা'ন সমগ্র বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্বের জন্য। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ২৫৲ করিয়া বৃত্তি পা'ন ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য, দেবেন্দ্র বসু ও যদুনাথ বসু।

পূর্ব্বোল্লিখিত সহাধ্যায়ীগণ ব্যতীত, হুগলী কলেজের সমসাময়িক ছাত্রগণের মধ্যে নরোত্তম মল্লিক, দ্বারকানাথ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতি ছাত্রগণের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথ (পরবর্ত্তী হাইকোর্টের বিচারপতি) খুব মেধাবী ও তীক্ষ্ণধী ছাত্র ছিলেন। বঙ্কিম কলেজ বিভাগে পড়িবার মুখেই দ্বারকানাথ (১৮৫৪) আইন পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে চলিয়া যান। হরচন্দ্র ঘোষ 'বেকনের সত্য' Bacon's truth অনুবাদ করিয়া পারিতোষিক

*Appendix c p 6. Report of General Committee of Public Instruction. Return of senior scholarships gained during the year.

পান, গঙ্গাচরণ সরকারও গদ্য ও পদ্য রচনায় খ্যাতি লাভ করেন, কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভার কাছে উভয়ের প্রভাবই ম্লান হইয়া যায়।† বঙ্কিমই সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন।

কলেজে বঙ্কিম Principal James Kerrএর কাছে সাহিত্য (Literature) পড়েন এবং Thwatesএর কাছে অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিখেন। Kerr ১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

স্কুলে পড়িবার সময় হেডমাষ্টার ছিলেন J. Graves এবং সেকেণ্ড মাষ্টার W. Brennand. গ্রেভস্ সাহেব কলেজেও ইতিহাস এবং ইংরাজী সাহিত্য পড়াইতেন। ব্রেনাণ্ড ১৮৫৩, মার্চ্চ মাসে ঢাকায় বদলী হন এবং তাহার স্থানে D. Foggo আসেন। ইনি কলেজে কিছুদিন Mathematics পড়ান।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর 'এ' সেক্সনে বাঙ্গালা ভিন্ন সমস্ত বিষয়ই পড়াইতেন—English, History, Mathematics & Geography. ব্রেনাণ্ড ঢাকা গেলে First classএ ঈশান বাবুই Geography ও Mathematics পড়াইতেন। বঙ্কিম স্কুলে তাঁহার কাছে পড়িয়াছেন, কিন্তু কলেজের (Second year class) দুই এক মাস মাত্র (১০-১-৫৬ হইতে) Sheodler's Book of Nature পড়িয়াছেন, কারণ ঈশান বাবু ৬-১১-৫৩ হইতে ৯-১-৫৬ পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজে First Assistant Teacher ছিলেন।

† College Centenary Report 1836-1936. Principal Zaekeria writes :— Hurro Ghose and Gunga Charan Sarkar were both thrown into the shade by another student of the College—Bankim Chandra. At College he was easily the best man of the year. pp. 52.

পূর্ব্বোক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালীও আবার তেমন সুন্দর ছিল। তিনি ইংরাজী পড়াইতেন এবং ছাত্রগণ তাহার নিকট পাঠ করিয়া ইংরাজী কাব্যাদির রস যথাযথভাবে উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেন।* বঙ্কিম তাঁহাকে বরাবর শ্রদ্ধা করিতেন।

স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিম ঈশান বাবুর ভাই মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পড়িয়াছেন। মহেশবাবুও Higher graded Service এ উন্নীত হন।

স্কুলে বঙ্কিম বাঙ্গলা পড়িতেন ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের কাছে। তন্মধ্যে বড়িশার জানকীনাথ তর্কভূষণ, গরিফার ভগচ্চন্দ্র রায় বিশারদ ও কুমারহট্টের গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র গোবিন্দ শিরোমণির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিরোমণি মহাশয়ই সুদীর্ঘকাল বঙ্কিমের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষার রীতিতে বঙ্কিমের মনে বাঙ্গলা ভাষায় প্রীতি জাগরিত হওয়া সম্ভব। তবে পণ্ডিত মহাশয়েরা যে সংস্কৃতমূলক

---

*ইনিই ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে higher graded service (বর্ত্তমান I.E.S.) পাইয়াছিলেন। অবসর লইবার পূর্ব্বে মাসে ৭৫০৲ টাকা পাইতেন।

ঈশান বাবু সম্বন্ধে পাঠক বিস্তারিত বিবরণ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ বিরচিত 'রঙ্গলাল' গ্রন্থে ৩২।৩৩ পৃষ্ঠায় পাইবেন। ইনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হিন্দু কলেজ ও জেনারেল এসেম্বলি ইনষ্টিটিউসনে সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ এবং গ্রীক ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে ইনিই প্রথম প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং পরে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ অধিকার করেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী শিক্ষা-বিভাগে এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। ইনি হুগলী কলেজের সংস্থাপকগণের অন্যতম।

বাঙ্গলার পক্ষপাতী ছিলেন, বঙ্কিমের তদানীন্তন রচনা দেখিয়া তাহাই অনুমিত হয়।

আমরা শিক্ষকগণের পরিচয়ও এখানে কিছু দিলাম বটে, কিন্তু বঙ্কিম প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকদের নিকটে বেশী কিছু শিক্ষা করেন নাই। বঙ্কিম নিজেই শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকট বলিয়াছিলেন—

"আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হ'তে শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কলেজে একআধটু শিখেছিলাম ঈশানবাবুর* কাছে। ক্লাশের পড়াশুনা কখনও ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত।"

বস্তুতঃ, বঙ্কিম ক্লাশের পড়া অপেক্ষা নিজেই অনেক বেশী বই পড়িতেন। হুগলী কলেজের লাইব্রেরীটী খুব বড় এবং এখানে বরাবর অনেক বই আছে। বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী হইতে সাহিত্য, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় পুস্তক পড়িয়া ফেলিলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাই বলিতেছিলাম যে, বঙ্কিমের বিদ্যা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার উপরেই নির্ভর করিত না। বাল্য ও যৌবনে তিনি সমস্ত বিষয়েই অসাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত 'সখা'তেও এইরূপ উক্তিই আছে—

"হুগলী কলেজে পড়িবার সময় কিন্তু ইনি বড়ই অমনোযোগী ছিলেন। পড়ার সময়েও হয়তো স্কুলের পুস্তকালয়ে গিয়া আলমারীর

*মনীষী অক্ষয় সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমের কোন কোন চরিতলেখক বলিতেছেন, হুগলী কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই বঙ্কিম ইংরাজী শিক্ষা করেন। আমি বলি, না।" কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, এ কথা ঠিক নয়।

স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(হুগলী কলেজের শিক্ষক)

ইনি বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব ভালবাসিতেন। তাঁহার নিকট প্রশংসা শুনিয়া একবার রাজার ছেলেরা কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

কোণে বসিয়া নানারকম পুস্তক পড়িতেছেন দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু পড়ার কথা জিজ্ঞাসিলেও কেহ ঠকাইতে পারিতেন না।"

প্রেসিডেন্সি কলেজে

সিনিয়ার স্কলারসিপ্ পরীক্ষায় পাশ হইবার পরে, বঙ্কিম তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। কিন্তু আইন পড়িবার জন্য প্রস্তুত হওয়ায়, ১৮৫৬ সালের ১২ই জুলাই তারিখে তিনি হুগলী কলেজ ছাড়িয়া দেন ও কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন-কথায় বঙ্কিম লিখিয়াছেন।*

"পিতৃদেব সঞ্জীবচন্দ্রকে একটী ক্ষুদ্র চাকুরী করিয়া দিলেন। এই পদ হইতেও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া যায়, কিন্তু আমি এ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইলাম। তিনি যে একটী ক্ষুদ্র কেরাণীগিরী করিবেন, ইহা আমার অসহ্য হইত। তখন নূতন প্রেসিডেন্সী কলেজ খুলিয়াছিল, তাহার Law Class তখন নূতন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে-কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া, কেরাণীগিরিটি পরিত্যাগ করাইয়া 'ল' ক্লাশে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্য্যন্ত রহিলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকুরি করিতে গেলাম। তিনি শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন, কিন্তু পড়াশুনায় আর মনোযোগ করিলেন না।"†

*বৃত্তি না পাওয়ার শ্রীকৃষ্ণের এইখানেই পড়া শেষ হয়। ইনি শুঁড়োর বিদ্যালয়ে হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন। বঙ্কিমের সঙ্গে ভূবন মুখার্জ্জি নামক আর একটী সহপাঠীও প্রেসিডেন্সি কলেজে আসেন। ৭৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

†সঞ্জীবের প্রাপ্ত সার্টিফিকেটাদিতেও দেখা যায় যে, সঞ্জীব তিন বৎসর 'ল' কলেজে পড়িয়া ১৮৫৯ সালে বি এল পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতিপত্র পাইয়াছিলেন, এমন কি ২৫৲ ফিও জমা দিয়াছিলেন।

বঙ্কিমের বৃত্তিটী ছিল দুই বৎসরের জন্য—হুগলী কলেজে। কিন্তু তখন আইনের ক্লাশ ছিল তিন বৎসরের জন্য তিনটী। সুতরাং তাঁহাকে তিন বৎসর মাসিক ১৩।০ হিসাবে বৃত্তি দেওয়ার আদেশ হইল। হুগলী কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র-বেতন দুই টাকা বেশী ছিল, সুতরাং এই দুই টাকাও বঙ্কিমকে মাস মাস বহন করিতে হইত। এ বিষয়ে অস্থায়ী অধ্যক্ষ মিঃ থেট্‌স এর নিকটে ডিরেক্টর বাহাদুর একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।*

হুগলী কলেজে আইন পড়িবার ব্যবস্থা ছিল না বলিয়াই বঙ্কিমকে কলিকাতা আসিতে হয়। বঙ্কিম নিজে ইহা অদূরদর্শিতার কার্য্য মনে করিতেন এবং এইজন্য তাঁহার পিতাকে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। কলিকাতা আসিয়া বঙ্কিম এই দুই বৎসর কাল নাকি বিশেষ কিছুই অধ্যয়নও করেন নাই বা শেখেন নাই। অন্ততঃ তিনি নিজে এইরূপইমনে করিতেন।

---

*In reply to your letter No 82 Dt. 28th instant, I have the honour to state that there is no objection to Bankim Chunder Chatterjee joining the Law Department of the Presidency College and there holding his senior scholarship provided that be pays as a tuition fee for the difference between the fee paid at the Presidency College and that paid at the Hooghly College viz Rs 2, a month.

2. As scholars in the Law Department are trained for three years in place of two, the monthly amount to be drawn by the holder will be (under the order of the Govt.) only ⅔ of its present amount i. e. it will be Rs 13/4/- Rupees Thirteen & annas four a month.

বঙ্কিমের কলিকাতা অবস্থানকালে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত* হয়, এবং সেই বৎসরেই প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা (Entrance Examination) গৃহীত হয়। বঙ্কিম ও যদুনাথ বসু, চন্দ্রমাধব ঘোষ, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি (স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জির পিতা), গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি প্রথম বিভাগে পাশ করেন।†

এই প্রথম বৎসরে ৩০টী বিদ্যালয় পরীক্ষায় যোগদান করে। ২৩শে মার্চ্চ ৫ টাকা করিয়া ফি জমা দিতে হয় ও ৬ই এপ্রিল পরীক্ষা হয়। ফল বাহির হয় ৪ঠা মে। ১১৫ জন প্রথম বিভাগে, আর ৪৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমের পরিচয় ছিল 'প্রেসিডেন্সি কলেজের' ছাত্র হিসাবে।

এণ্ট্রেস পরীক্ষার বিষয়গুলি একটু পরিচয় আবশ্যক।

English—Goldsmith and other Books.

সংস্কৃত—রঘুবংশ, কুমার সম্ভব।

History, Geography, Mathematics and Natural Philosophy.

প্রত্যেক বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে পরীক্ষার্থীর সাফল্য অসম্ভব বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছিল—"Candidates will not

*১৮৫৭ সালের দুই আইনে (Act II of 1857) ২৪ জানুয়ারী তারিখে বড়লাট লর্ড ক্যানিং বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেন। বড়লাট ছোটলাট উভয়েই কমিটীতে ছিলেন। আরও অনেকে ছিলেন; বাঙ্গালীদের মধ্যে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামগোপাল ঘোষ।

†তালিকা বর্ণানুক্রমিক থাকায় বঙ্কিম কোন্ স্থান অধিকার করেন, তাহা বলা সুকঠিন।

be apporved by the examiner, unless they show a completed knowledge of all subjects in which they are examined."

পরবর্ত্তী বৎসরে—১৮৫৮ অব্দে—প্রথম বি, এ, পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার বিষয় ছিল যেমন বিবিধ প্রকারের, কঠিনও ছিল তদনুরূপ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হয়—

I. English—Macbeth — Sheakespeare. Dryden এর Cymon and Iphigenia ও Flower and the Leaf. Addison's Spectator.

II. History—The Principles of the historic evidence as treated in Isaac Taylor's two works on, the subject, English History up to 1815. Elphinstones History of India. Ancient History of Greece and Rome.

[Historical questions will include geography of the countries to which they refer.]

III· Mathematics and Natural Philosophy—Arithmetic & Algebra, Geometry (I—VI) & 11th. Book to Prop. XXI, with deductions.

Conic Section.

Plane Trigonometry.

Mechanics — Force, Mechanical Powers, Centre of Gravity, General Laws of Motion, Motion of Falling Bodies

Hydrostatics, Hydraulics and Pneumatics

Optics—Reflection, Refraction, Formation of images by simple lenses.

Astronomy—Elementary knowledge of solar system including phenomena of the eclipses.

IV. Physical Sciences—Chemistry, Physics, (Heat, Light etc.) Animal Philosophy, Physical Geography.

V. Mental and Moral Science—

(a) Logic—Elements of Logic as contained in Whately or any similar work.

(b) Moral Philosophy—As contained in Wayland, Abercrombie or any similar work.

(c) Mental Philosophy—As contained in Abercrombie, Dr. Payne or any similar work.

VI. Sanskrit with Grammar—Kiratarganium, Iswar Sarma's two Grammars or that of Withams.

VII. Bengali—Batrees Sinhasan, Purush Pareksha, Mahabharatom Bk. 1—3 with Grammar,

Rammohon Roy's, Dr. Yates' or Shamacharan Sarkar's Grammar will be used in Examination.

এই বিষয়গুলি খুব দুরূহ হওয়ায় তদানীন্তন অধ্যাপকগণ বিশেষ যত্ন ও উৎসাহের সহিত ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তখন অধ্যক্ষ ছিলেন সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার সাটক্লিফ্ সাহেব (J. Sutcliffe). ইনি গণিত পড়াইতেন। বিখ্যাত কাউএল সাহেব (E. B. Cowell M.A. oxon LL.D. Edinburah) ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্র এবং Dr. H. Hallear পদার্থ-বিজ্ঞান পড়াইতেন। এই সমস্ত অধ্যাপকগণ কেবলমাত্র 'জেনারেল' বিভাগের ছাত্রগণকেই শিক্ষা দিতেন।

বঙ্কিম এই সমস্ত অধ্যাপকগণের নিকট হইতে শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়াও আইনের ক্লাসে পড়িতে পড়িতে পরীক্ষার মাত্র ২।৩ মাস পূর্ব্বে বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র ছাত্র ও শিক্ষক মহলে বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সাধারণ বিভাগে কিছুমাত্র না পড়িয়াও কোন ছাত্র বি,এ, পরীক্ষা দিতে পারে ইহা কোন অধ্যাপকেরও কল্পনার মধ্যেই আসে নাই। সাটক্লিফ্ ও কাউএল সাহেব এই অদ্ভুত কথা শুনিবার পরে, সেই 'অসম সাহসী' ছাত্রটীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে নানাভাবে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বঙ্কিমকে দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া তাঁহারা এইরূপ কথাও প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই যে, সত্যই যদি সে আইন বিভাগ হইতে পরীক্ষা দিতে প্রয়াস পায়, তবে কলেজের সাধারণ বিভাগের অপমান হইবে এবং তাঁহারা এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে বাধা দিতে নিশ্চেষ্ট হইবেন না।

নিরুপায় হইয়া বঙ্কিম তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার গ্রাপল সাহেবের (Mr. W. Grapel M. A.) কাছে গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। ইনি আইনের ক্লাশে 'জুরিসপ্রুডেন্স' সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন এবং বুদ্ধিমান ছাত্র বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বিলক্ষণ জানিতেন ও স্নেহ করিতেন। তাঁহার কাছে অধ্যক্ষ সাহেবের কোন আপত্তিই টিকিল না, বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি লাভ করিলেন।

সেবারে মোট ১৩ জন পরীক্ষার্থী হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষা দেন মাত্র ১০ জন। এপ্রিল মাসে (১৮৫৮) পরীক্ষা গৃহীত হয়, এবং যথাসময়ে ফল বাহির হইলে সকলেই সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, সাট্‌ক্লিফ ও কাউএল সাহেবের ছাত্রগণকে অতিক্রম করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

জেনারেল বিভাগ হইতে যাঁহারা বি, এ, পরীক্ষা দেন তাঁহাদের মধ্যে যদুনাথ বসু, ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য ও দেবেন্দ্র বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৬ সালে ইঁহারাও প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া বঙ্কিমের সহিত পাশ হন এবং প্রত্যেকে আসিয়া ২৫৲

হিসাবে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহারা সকলেই উক্ত অধ্যাপকগণের শিক্ষাদান ও সহায়তা লাভে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইহারা সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষার জন্য চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া শেষ করিয়াছিলেন; কিন্তু যদুনাথ ভিন্ন* সকলেই অকৃতকার্য্য হন, আর যদুনাথও হন বঙ্কিমের নীচে।

ফলাফল বাহির হইলে চতুর্দ্দিকে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। উক্ত অধ্যাপকগণ ইতিপূর্ব্বে বঙ্কিমের সাহস 'বাতুলতার' নামান্তর মনে করিলেও, এক্ষণে কিন্তু তাঁহার ধীশক্তির অজস্র প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। বঙ্কিমের প্রতিভা সম্বন্ধে চতুর্দ্দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

এখানে একটী কথার উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। পরীক্ষার বিষয় ও প্রশ্নাবলী অত্যন্ত কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য হওয়ায়, বঙ্কিম ও তাহার সহগামী যদুনাথ সাতটী বিষয়ের মধ্যে পাঁচটী বিষয়ে প্রশংসনীয় দক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হইলেও, মাত্র একটী বিষয়ে পাশোপযোগী নম্বর রাখিতে পারেন নাই; কিন্তু পরীক্ষক-মণ্ডলীর সুপারিসে সিণ্ডিকেট্ তাহাদিগকে বি, এ,

* Report of the General Committee of Public Instruction 57-58.

Appendix A. p. 182.

Six students of the Presidency College competed for the B.A Examination, of whom 4 were from the fourth or final year of the general department and two were from the final or third year of the Law Department and notwithstanding the difficulty of questions set by the University Examiners two have been passed in the 2nd Division, namely Bankim Chandra Chatterjee, Law Department andJa doonath Bose, General Department.

ডিগ্রীদানে বিফলকাম করেন নাই। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী দ্রষ্টব্য :

Minutes of the Syndicate, 1858
No. 4. 24th April 1858.

Present:—The Vice Chancellor, Mr. J. W. Colvile, Mr. Beadon, Dr. Duff, Mr. Ritchie, Mr. Young and Dr. Grant.

....

3. Read a letter from the University Board of Examiners in Arts stating that of the 13 candidates for the degree of B.A. three had been absent during the whole or a portion of the Examination and that of the others all had failed.

Read also a letter from the like Board recommending that two Candidates viz. Bankim Chandra Chatterjee and Jadoo Nath Bose who passed creditably in five of the six subjects and had failed by not more than seven marks in the seventh, might as a special act of grace be allowed to have their degrees being placed in the second Division, it being clearly understood that such favour should in no case be regarded as a precedent in future years.

Resolved that the two candidates mentioned be admitted to the degree of B. A.

এরূপ কঠিন প্রশ্ন আর কখনও যাহাতে না হয়, তজ্জন্য ডাক্তার ডফ্ প্রমুখ মনীষিগণ ১৮৫৮, ১২ই জুন তারিখে সিণ্ডিকেটের সভায় এই ভাবের একটী প্রস্তাবে নির্দ্দেশ দেন—

"That the Papers for the B. A. Examination should not contain so large a proportion of difficult questions."

কেবল নির্দ্দেশ নহে, বস্তুতঃই যে ইহার পর হইতে বি, এ, পরীক্ষার বিষয় ও প্রশ্নাদি আরও সহজ হয়, আমরা তাহার পঁচিশ বৎসরের পরের বিবরণী হইতেও জানিতে পারি।*

যাহা হউক প্রথম বি, এ, পরীক্ষায় আইন বিভাগ হইতে পাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

রেজিষ্ট্রার গ্রেপল, স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট (পরে লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর), সার বার্ণেস পিকক্ (পরে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম চীফ জাষ্টিস্)—উভয়েই তখন supreme council এর মেম্বর—ডাক্তার ডাফ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সকলেই বঙ্কিমের কৃতকার্য্যতায় খুব আনন্দিত হইলেন। তখন বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ছিলেন ইয়ং সাহেব (A.R. Young), ইয়ং সাহেব সিণ্ডিকেটের সভায় বঙ্কিমের গুণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাই পাশ করিবার পরেই কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রকেই তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বঙ্কিম পিতার সম্মতি ভিন্ন কোন মত

* Report by the Bengal Provincial Committee 1884 Page 14, Para 45.

The necessity for reducing the standard as the Court of Directors had advised was at once seen from the poor results of the first Examination in which only two Students of the Presidency College obtained degrees.

প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। ইতিমধ্যে পিতৃদেব যাদবচন্দ্রও পেন্সন লইয়া ১৮৫৭ সাল হইতে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম পিতার সহিত সাক্ষাত করিয়া সব কথা বলিলেন। ইয়ং সাহেব বঙ্কিমকে ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, বঙ্কিম এই চাকুরী গ্রহণ করিলে ছোটলাট বাহাদুরও খুবই খুসী হইবেন। অতঃপরে বঙ্কিম কি স্থির করিলেন, আমরা তাহা পরে বলিব।

হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে একবার গণিতাধ্যাপক বঙ্কিমকে জ্যামিতির একটী প্রতিজ্ঞা বোর্ডে বুঝাইতে দেন। সেইটী বুঝাইতে বঙ্কিম ৭০টী প্রতিজ্ঞার অবতারণা করেন, অধ্যাপক বালকের এই আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

['চিকিৎসা-তত্ত্ব ও সমীরণ' ৩১ চৈত্র ১৩০০]

বঙ্কিম হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে তিন বৎসর কয়েক মাসের মধ্যে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ভাটপাড়ার শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের টোলে মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি ও দুরূহ সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণখানি পড়িয়া সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই সংস্কৃত শিক্ষা তাঁহার অশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। ইহাতেই তিনি গীতা, উত্তর রামচরিত ও মহাভারতের সমালোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা কেবল বিদ্যামন্দিরের সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। তাঁহার প্রতিভাও ছিল যেরূপ বিরাট, শিক্ষাক্ষেত্রও ছিল সেইরূপ সুদূর-প্রসারিত। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই শিক্ষার কথাই বলিব।

বঙ্কিমচন্দ্র

চতুর্থ অধ্যায়—প্রকৃতির শিক্ষা

এই অধ্যায়ে আমরা বাল্য ও যৌবনকালে বঙ্কিমের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে পাঠককে পরিচিত করিতে চেষ্টা করিব। কেননা "স্রষ্টাকে না জানিলে তাঁর সৃষ্টির সকল রহস্যভেদ ও সকল রসভোগ সম্ভোগ হয় না। সেইরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি যাঁরা করেন, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া না জানিলে তাঁহাদের সৃষ্ট-সাহিত্যেরও সকল রহস্যভেদ ও সকল রস সম্ভোগ করা যায় না।··· বঙ্কিম-সাহিত্য বঙ্কিম চরিত্রের অভিব্যক্তি। ঐ চরিত্রকে যে না বুঝিল, এই সাহিত্যকে সে সত্যভাবে বুঝিতে পারিবে না।"

চরিত-চিত্র (বিপিনচন্দ্র পাল) নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২।

এগারো বৎসর বয়সে কাঁটালপাড়া থাকিবার পরে বঙ্কিম একরকম অভিভাবকশূন্য অবস্থায়ই বাড়ীতে থাকিতেন। কেবল বঙ্কিমের ধর্ম্মনিষ্ঠা জননী ভিন্ন আর বড় কেহ বাড়ী থাকিত না। এই জন্য তিনি প্রায় আপনার ইচ্ছামতই কার্য্য করিতেন। এমনকি শিক্ষক-দিগকেও উপেক্ষা করিতে ছাড়িতেন না। ফলে শাসনকর্ত্তা ও শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। এই জন্য পরিণত বয়সে বঙ্কিম অনেক অনুশোচনা করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"ক্লাসে কখনও থাকিতাম না।··· কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাক্‌তেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয়নি; নীতিশিক্ষা কখনও হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি, বলা যায় না।"

'সাধনা', শ্রাবণ, ১৮৯৪

এই অবস্থায়ও প্রকৃতির ক্রোড়ে বঙ্কিমের যে শিক্ষা হইয়াছিল আমরা এখন তাহারই আলোচনা করিব। কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"বাল্যে প্রকৃতি দেবীর ক্রোড়ে বসিয়া আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি, তাহাই অধিক প্রয়োজনীয় এবং এই শিক্ষাই উত্তরকালে অধিক উপকারে আসিয়াছিল।"

মেদিনীপুর হইতে কাঁটালপাড়ায় আসিবার পরে, বঙ্কিম নৈহাটী নিবাসী সদাশিব তর্কপঞ্চাননের কাছে উপনয়ন গ্রহণ করেন। ইঁহার সহোদর শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্যই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েয় পিতামহ। হরপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর নন্দের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল।

অতঃপরে ১১ বৎসর বয়সেই বঙ্কিমের বিবাহ হয়। কাঁটালপাড়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অনুমান দেড়মাইল দূরে নারায়ণপুর গ্রাম অবস্থিত। ব্রাহ্মণ প্রধান এই গ্রামে পলাধিদের বাসই অধিক। এই গ্রামে রামমোহন* চক্রবর্ত্তী নামে একজন সঙ্গতিপন্ন বংশজ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি স্বোপার্জ্জনে ও শ্বশুরের বিষয় ক্রয় করিয়া গ্রামে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রথম পুত্র

* রামমোহন-সম্পাদিত রেজিষ্টারী উইল তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ত্রিলোচনের পৌত্র সুবোধ বাবুর নিকট হইতে পাইয়াছি।

নবকুমার চক্রবর্ত্তীর কন্যা মোহিনী দেবীর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়। রামমোহন কুলীন নাত্‌নী-জামাতাকে অনেক যৌতুক দিয়াছিলেন বটে, তবে রায় বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে বিবাহ হইবার প্রধান কারণই ছিল—মেয়েটীর অপরূপ সৌন্দর্য্য।

৫।৬ বৎসরের বালিকাবধূ ঘরে আসিয়াছে, রথ দেখিয়া তাঁহার কত আনন্দ! সকলে কোলে পিঠে করিয়া নানারকম পুতুল ও পছন্দ মত জিনিষপত্র কিনিয়া দেন। মেয়েটী খুব বুদ্ধিমতী ও মিশুক ছিল, আর বঙ্কিমের সহিত তাঁহার গাঢ়প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু এই বালিকা ষোড়শবর্ষ বয়সেই বঙ্কিমের প্রাণে গভীর শেলাঘাত করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করে।

মোহিনী দেবী ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণা ও তন্বঙ্গী। বঙ্কিম তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশ নন্দিনীতে" সেই অলৌকিক রূপরাশি বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিলোত্তমাই* বঙ্কিমের জ্যোৎস্নাময়ী মোহিনী-প্রতিমা। তিনি লিখিয়াছেন—

"তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্‌ভ বয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তেন ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকা-ভাব ছিল। পাঠক! কখন কিশোর বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমলপ্রকৃতি কিশোরীর নব-সঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন? একবার মাত্র দেখিয়া, চিরজীবনমধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্‌ভ-বয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায় পুনঃ পুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণপথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎ-সম্বন্ধে কখন চিত্তমালিন্যজনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন?………

*দিব্যেন্দু সুন্দরের উক্তি "সমালোচনী ১৩০৮—০৯", পৃঃ ২৭৭, প্রথমবর্ষ

"সুগঠিত সুগোল ললাট, নিবিড়বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশ সকল······ পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস ? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবে না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত। সেই প্রশস্ত পরিষ্কার চক্ষে যখন তিলোত্তমা দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটীলতা থাকিত না। তিলোত্তমা অপাঙ্গে দৃষ্টি করিতে জানিতেন না, অর্দ্ধ দৃষ্টিতে কেবল স্পষ্টতা আর সরলতা; দৃষ্টির সরলতাও বটে, মনের সরলতাও বটে। তবে যদি তাঁহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ কোমল পল্লব ত্বখানি পড়িয়া যাইত, তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি করিতেন না। ওষ্ঠাধর দুইখানি গোলাবী, রসে টলমল করিত; ছোট ছোট, একটু ঘুরান, একটু ফুলান, একটু হাসি-হাসি; সে ওষ্ঠাধরে যদি একবার হাসি দেখিতে, তবে যোগী হও, মুনি হও, যুবা হও, বৃদ্ধ হও, আর ভুলিতে পারিতেনা। অথচ সে হাসিতে সরলতা ও বালিকা-ভাব ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

তিলোত্তমার শরীর সুগঠন হইয়াও পূর্ণায়ত ছিলনা; বয়সের নবীনতা প্রযুক্তই হউক বা শরীরের স্বাভাবিক গঠনের জন্যই হউক, এই সুন্দর দেহে ক্ষীণতা ব্যতীত স্থূলতা-গুণ ছিলনা। অথচ তন্বীর শরীর মধ্যে সকল স্থানই সুগোল আর সুললিত।"

বালিকাবধুর সম্বন্ধে এখানে বিবৃত করিবার বেশী কিছু উল্লেখযোগ্য নাই। এই বয়সে যেরূপ কথোপকথন হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইত। একের পুতুল, অপরের কবিতা ও লেখাপড়া লইয়া পরস্পরে মাঝে মাঝে কলহও হইত।

পিতামহ পৌত্রী ছাড়িয়া থাকিতে বড় কষ্ট পাইতেন, তাই প্রথমে বালিকা নারায়ণপুরেই অধিক থাকিতেন। বঙ্কিম কিন্তু বিরহ-ব্যথা

বড় সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রায় প্রতি রাত্রেই সকলে ঘুমাইলে 'তুছোট' লইয়া শ্বশুরবাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইতেন। মাঠের উপর দিয়া কোণাকুণি রাস্তায় বাড়ীর পশ্চাদ্দিক হইতে শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতেন। এবং সেখানেই রাত্রিযাপন করিতেন। কিন্তু এমনই কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন যে, আবার ভোররাত্রিতেই আসিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পড়িতে বসিতেন। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমকে পড়িতে দেখিয়া শুইতে যাইতেন। আর ভোরে আসিয়াও পাঠনিমগ্ন দেখিতেন। আশ্চর্য্য হইয়া তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন—"বঙ্কিম কি সারারাত জেগে পড়েছে ?"

কখনও কখনও এ কথার উত্তর দিত ভৃত্য। বঙ্কিমের মানস-নেত্র হইতে যে এই বাল্যস্মৃতি জীবনের কোন অবস্থায়ই বিলুপ্ত হয় নাই, পাঠক এই গ্রন্থে বহুস্থানে তাহার নিদর্শন পাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বয়সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সাংসারিক কার্য্যে প্রভুত্ব-শক্তি কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা আমরা তাঁহার নিজের কথায়ই ব্যক্ত করিব। "সঞ্জীবনী সুধায়" তিনি লিখিয়াছেন—

"সঞ্জীবচন্দ্রের হুগলী কলেজে পুনঃ প্রবিষ্ট হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। একদিন হেড্ মাষ্টার গ্রেবস্ সাহেব আসিয়া কোন্‌দিন কোন ক্লাশের পরীক্ষা হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র কলেজ হইতে বাড়ী আসিয়া স্থির করিলেন, এই দুইদিন বাড়ী থাকিয়া ভাল করিয়া পড়াশুনা করা যাউক, কলেজে যাইব না, পরীক্ষার দিন যাইব। তাহাই করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের ক্লাশের পরীক্ষার দিন বদল হইল—অবধারিত দিবসের পূর্ব্বদিন পরীক্ষা হইবে স্থির হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। বুঝিলাম যে, তিনি পরীক্ষা দিতে কলেজে যাইবেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন, কলেজে যাইবার সময় দেখিলাম,

তিনি উপরিলিখিত বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে একজনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন।···আমি তখন পরীক্ষার কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। কিন্তু ঐ ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ যুবকগণ সেখানে দলে ভারি ছিল, তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে, আমি অতিশয় দুষ্ট বালক ; কেননা লেখাপড়া করার ভাণ করিয়া থাকি এবং কখন কখনও গোয়েন্দাগিরি করিয়া সে সম্প্রদায়ের কীর্ত্তিকলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, আমি গল্পটা রচনা করিয়া বলিয়াছি। সরলচিত্ত সঞ্জীবচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পরীক্ষা দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। ইহাতে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন, যে তৎক্ষণাৎ কলেজ পরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না।”

বঙ্কিমের তখনকার চেহারা সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র বলেন—

“বঙ্কিমচন্দ্রকে তখন দেখিলে অসামান্য বলিয়া বোধ হইত। রূপবান বলিয়া নহে, তাহার মুখে অনির্ব্বচনীয় ভাব ছিল, সেইজন্য তাঁহাকে সকলেই লক্ষ্য করিত। তাঁহার বয়ঃক্রম দশ, এগার কি বার বৎসর হইবে। উপনয়ন হইয়াছে ; এমন কি বিবাহ হইয়াছে······ বালকটী গৌরবর্ণ, ক্ষীণদেহ, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত, মাথায় একরাশি কোঁকড়া কোঁকড়া কালচুল। নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত। চক্ষু দুইটী অসাধারণ উজ্জ্বল, বড় চঞ্চল এবং তাহার দৃষ্টি তীব্র। ঠোঁট দুখানি পাতলা ও চাপা ; তাহাতে সর্ব্বদা হাসি থাকিত—এমন কি তাঁর মৃত্যু সময়েও ঐ হাসি দেখিয়াছি।”

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আজন্ম রসিক। পূর্ণচন্দ্র “কথকঠাকুরের নাক বড় পেটুক” নামে একটী আখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন।*

---

*১৩২১ সাহিত্য শ্রাবণ পৃঃ ২৫৫

গল্পটী এই—এক কথকের নাক ছিল খুব লম্বা। খাওয়ার জিনিষও নাকের ভিতরে যাইত। কথকতা হইতেছিল, সহসা বঙ্কিম নিজের কাণ টিপিয়া দেখিলেন, কথকঠাকুরের কেবল নাকই নড়িতেছে। পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি সকলকে এই দৃশ্য দেখাইলেন, সকলেই বিশেষ কৌতুক অনুভব করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিয়াছিল। তখন হইতেই সকলে জানিল, "বঙ্কিম বড় দুষ্ট"। পূর্ণচন্দ্র বলেন "এইরূপ কথার দুষ্টামী বঙ্কিমের যাবজ্জীবনছিল ; বাল্যকালে কিংবা কোনও কালে বাক্যে ভিন্ন কার্য্যে কখনও তাঁহার দুষ্টামী ছিল না।"

যে কথকতার কথা বলিতেছিলাম—তাহার উপলক্ষ ছিল বঙ্কিম-চন্দ্রের পিতামহীর গঙ্গাযাত্রা। গঙ্গাতীরে দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন পর্য্যন্ত তিন সপ্তাহকাল কথকতা হয়। ঐদিনই পিতামহী স্বর্গারোহণ করেন। পূর্ণচন্দ্র বলিতেন—

"প্রতিদিন কথকতা শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি চেয়ার অথবা টুল লইয়া নদীতীরে বসিয়া থাকিতেন। পিতামহীর গঙ্গাবাস উপলক্ষে চেয়ার ও টুলের অভাব ছিল না। তিনি বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এখন আর তিনি রহস্যপূর্ণ বালক নহেন, সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গাম্ভীর্য্যশালী প্রবীণের স্বভাব পাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতামহীর গঙ্গাতীরে বাসকালে প্রথম দুই সপ্তাহ কৃষ্ণপক্ষ ও শেষ সপ্তাহ দেবীপক্ষ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন সপ্তাহ কাল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাগীরথীর তীরে বসিতেন; কখনও আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিতেছে—তাহাই দেখিতেন; কখনও বা আকাশে কাস্তের ন্যায় চাঁদ উঠিতেছে (দেবীপক্ষ) তাহাই দেখিতেন। সঙ্গীগণ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তারা গুণিত, দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিত, কিন্তু প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র একমনে ভাগীরথী তীরে সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য দেখিতেন।"

'ইন্দিরা'ও প্রথমে গঙ্গা দেখিয়া বলিতেছে—"আমি কখনও গঙ্গা দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল। গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়! তাহাতে ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর রৌদ্রের ঝিকিমিকি—যতদূর চক্ষু যায় ততদূর জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে—তীরে কুঞ্জের মত সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী, জলে কত রকমের কত নৌকা; জলের উপর দাঁড়ের শব্দ; দাঁড়িমাঝির শব্দ, জলের উপর কোলাহল; তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল। কত রকমের কত লোক কত রকমে স্নান করিতেছে। আবার কোথায় সাদা মেঘের মত অসীম সৈকতভূমি—তাতে কত প্রকারের পক্ষী কত শব্দ করিতেছে। গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী। অতৃপ্ত-নয়নে কয়দিন দেখিতে আসিলাম।"

পূর্ব্ব কথিত বাল্যস্মৃতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পুস্তকের নানাস্থানে অঙ্কিত করিয়াছেন—

"সন্ধ্যাগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টীকৃত হইল। প্রায়ান্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশসমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল……নাবিকেরা নৌকাসকল তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।"

মৃণালিনী

আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—"নবীন শরদুদয়ে ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূরবিসর্পিণী চন্দ্রকরপ্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিণী দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগমে প্রহ্লাদিনী।"

ভাগীরথী তীরে বঙ্কিমের বাসভূমি। এই পুণ্যতোয়া সাগরবাহিনী গঙ্গামাতাও বঙ্কিমের জীবন গঠনে কম সহায়তা করে নাই।

পূর্ণচন্দ্র আরও লিখিয়াছেন—

"এই গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটী অপ্রশস্ত খাল ছিল। বর্ষাকালে ভাগীরথীজলে উহা পূর্ণায়তন হইয়া পূর্ব্বদিকে একটী বিলে মিশিত। খালটী এমন অপ্রশস্ত যে, উভয় পার্শ্বের গাছের ডালের পাতায় পাতায় মিশিয়া ঐ খালের উপর পাতার ছাদ হইয়াছিল, সেজন্য খালটী সর্ব্বদা অন্ধকারময় থাকিত। বঙ্কিমচন্দ্রের স্কুলে যাইবার জন্য একটী ছোট ডিঙ্গী নৌকা ছিল। তিনি বর্ষাকালে প্রায় সর্ব্বদাই স্কুলের ছুটী হইলে, বাটীতে প্রত্যাগমন না করিয়া বরাবর ঐ নৌকাতে খালে প্রবেশ করিতেন। এই লেখক ঐ নৌকায় থাকিতেন; কেননা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঐ স্কুলে যাইতেন। তাঁহার নৌকা খালে প্রবেশ করিলে উহার উপরের পাতার ছাদ হইতে অসংখ্য পাখী উড়িত, চীৎকার করিত, আবার বসিত। খালের উভয় পার্শ্বে নিবিড় বন ছিল, তাহাতে নানাপ্রকার বনফুল ফুটিত। বর্ষার জলে গাছগুলি অর্দ্ধ নিমজ্জিত, নৌকা প্রবেশ করিবামাত্র উহার জলতাড়নে তাহারা নানাবর্ণের ফুলের সহিত হেলিত, দুলিত, নাচিত। বালক কবি তাহাই দেখিতেন, হাসিতেন; ক্ষণকালের জন্য তাহারা তাঁহার সঙ্গী হইত।

"তখন তাঁহার বয়স তের কি চৌদ্দ হইবে। একদিন গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সদর বাটীতে আসিয়া তাঁহার নৌকার মাঝিকে ও দ্বারবানকে উঠাইলেন (পূর্ব্বে ইহার বন্দোবস্ত ছিল)। পরে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিঃশব্দে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বর্ষাকাল, পূর্ণিমারাত্রি, চন্দ্রমা মধ্যগগনে বিরাজ করিতে-ছেন, নীলাকাশে অসংখ্য তারা জ্বলিতেছে, পৃথিবী আলোকময়ী, নিস্তব্ধ; একটা কুকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতে লাগিল। বালক কবির সেই অন্ধকারময় খালে বিচরণ করিবার

উপযোগী সময় বটে। বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসঙ্কোচে নৌকায় উঠিলেন; কিছুদূর ভাগীরথী বাহিয়া গিয়া খালে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে জলোচ্ছ্বাসে খাল পরিপূর্ণ ছিল। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার এইখানে বিচরণের কথা পৌরজনের মধ্যে কেহ জানিতে পারে নাই, কেবল তাঁহার অনুজ (এই লেখক) যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ঘরে শয়ন করিতেন, তিনিই জানিতেন, কিন্তু ভয়ে ঐ কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। অনুজ কিছুদূর তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

"তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের সাক্‌রেত, ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত 'সাধুরঞ্জন' ও 'প্রভাকরে' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নিশীথে এই খাল বিচরণ অতি অল্পদিনের মধ্যেই কলম-জাৎ হইল, যথা :—

"মহারণ্যে অন্ধকার গভীর নিশায়।
নির্ম্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায়॥
কাননের পাতা ছাদ নাচে শশী করে।
পবন দোলায় তায় সুমধুর স্বরে॥
নীচে তার অন্ধকার, আছে ক্ষুদ্র নদী।
অন্ধকার, মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি॥
ভীম তরুশাখা যথা পড়িয়াছে জলে।
কলকল করি বারি সুরবে উছলে॥
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি যেন বা স্বপন।
কলিকাস্তবকময় ক্ষুদ্র তরুগণ॥
শাখার বিচ্ছেদে কভু, শশধর-কর।
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে নীল জলোপর॥"

—ললিতা ও মানস।

"যে-গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈত্রিক বাটী, তাহার আশে পাশে বড় বড় গ্রাম, আর সম্মুখে অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে তিন চারিটি বড় নগর ছিল, তাহাতে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। সে কারণে দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন ভাগীরথীবক্ষে বড় সমারোহ হইত......

"......বঙ্কিমের যখন চৌদ্দ পনর বৎসর বয়ঃক্রম, তখন একখানি নৌকাতে বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতাদিগের সহিত ফরাসডাঙ্গায় ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে সন্ধ্যা হইল। ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে শ্মশানভূমিতে একটা শব দাহ হইতেছিল। নিকটে অনেকগুলি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া; একটী স্ত্রীলোক উন্মত্তার ন্যায় প্রজ্বলিত চিতাতে ঝাঁপ দিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু তাহার সঙ্গিনীগণ তাহাকে ধরিল। অবশেষে এই সদ্যোবিধবা স্ত্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল, সকলেরই এরূপ হইল। নৌকাতে অবস্থিতিকালে বঙ্কিমচন্দ্র সদ্যঃএকটী গীত রচনা করিলেন—গানটি আমাকে চুপি চুপি শুনাইলেন—কেননা তাঁহার অগ্রজেরা ঐ নৌকাতে ছিলেন। গানটী এই—

"হারালে পর পায় কি ফিরে মণি—কি ফণিণী, কি রমণী?"

নৌকাপথে বাল্যকাল হইতে বিচরণ করিয়াছেন বলিয়াই বঙ্কিম লিখিতে পারিয়াছেন—"নৌকাপথে কলিকাতা আসিতে দূর হইতে কলিকাতা দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলাম। অট্টালিকার পর অট্টালিকা, বাড়ীর গায়ের বাড়ী, বাড়ীর পিঠে বাড়ী, অট্টালিকার সমুদ্র—তাহার অন্ত নাই, সংখ্যা নাই, সীমা নাই। জাহাজের মাস্তুলের অরণ্য দেখিয়া জ্ঞানবুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। নৌকায় অসংখ্য অনন্তশ্রেণী দেখিয়া মনে হইল এত নৌকা মানুষ গড়িল কি প্রকারে?"

বঙ্কিম যে নৌকায় চড়িতে খুব ভালবাসিতেন, এ সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্রও লিখিয়াছেন—

"আমাদের গ্রামের আড়পারে হুগলী কলেজ, প্রায় সাত আট বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা চড়িয়া ঐ কলেজে যাইতেন। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই এক একদিন ছুটির সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেন কেমন রে, নৌকা ছাড়বি? মাঝি নৈহাটীর পাটনী, কখনও 'না' বলিত না, নৌকা খুলিয়া দিত। কোন কোন দিন ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে নৌকা ঘাঠে নিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কাল মেঘ দিগন্ত অন্ধকার করিত। নদীর জল কাল হইত। অল্পকাল মধ্যে প্রবলবেগে ঝড় উঠিত। ভীষণ তরঙ্গ সকলের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেনার রাশিতে যেন নদীর বক্ষে তুলার মাড় ডাকিত। যাঁহারা নদীবক্ষে ঝড়ে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন কি ভয়ানক দৃশ্য! বঙ্কিমচন্দ্র একদৃষ্টে ইহাই দেখিতেন। প্রকৃতির এই সর্ব্ব-সংহারিণী মূর্ত্তি তিনি অজ্ঞান হইয়া দেখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ পরিত্যাগ করিবার তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি ঐ কলেজে ভর্ত্তি হই, সুতরাং আমাকেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত এই বিপদে পড়িতে হইত।"

ঝড় তুফানের মধ্যে নৌকা সম্বন্ধে দুঃসাহসী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার 'সূর্য্যমুখী' স্বামীকে সতর্ক করিয়া লিখিতেছেন—

"দেখিও, নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও; তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিওনা।"

তাই বোধ হয় ঝড় দেখিয়া তাঁহার 'নগেন্দ্রনাথ' মাঝি রহমতউল্লাকে আদেশ করিয়াছিলেন "নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।"

'রাধারাণীর' দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ও বলিতেন "আমি সেদিন নৌকা পথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম। অপরাহ্ণে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে আসিয়াছিলাম।"
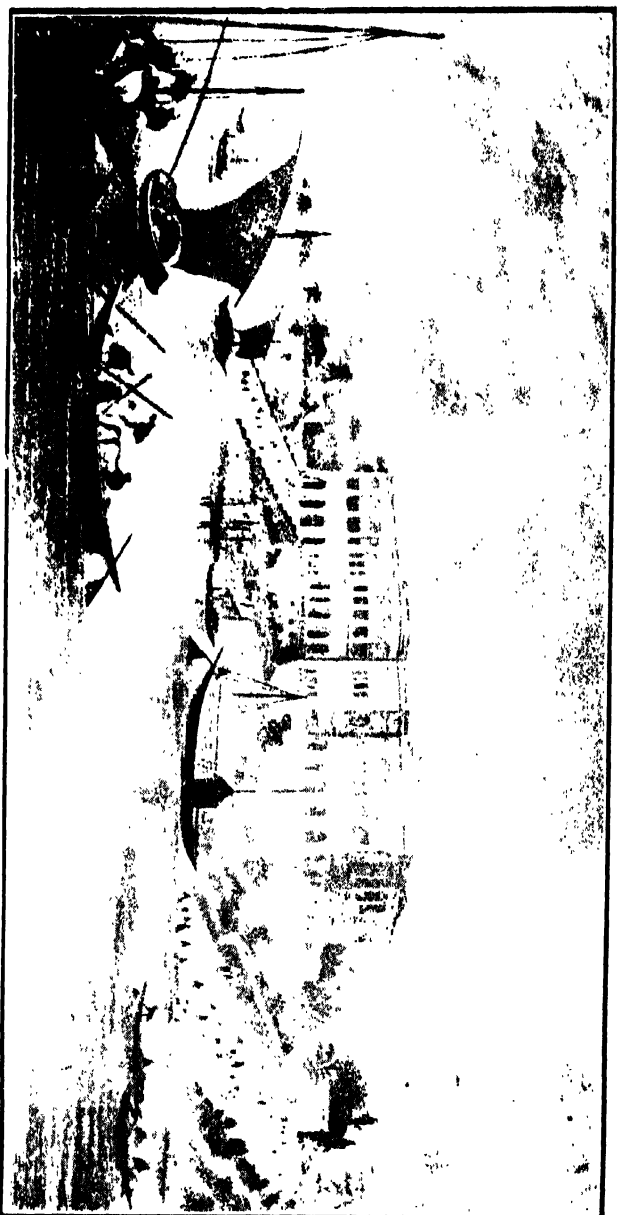
হুগলী কলেজ

পশ্চিম পাড়ে কলেজ, পূর্ব্ব পাড়ে কাঁঠালপাড়া। মধ্যনদীতে যে পালের নৌকাখানি রহিয়াছে, ঐরূপ নৌকাতেই বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে যাতায়াত করিতেন। নৈহাটীর লোকেরা উত্তর দিকের ঘাট দিয়া আসেন, কাঁঠালপাড়ার লোকেরা আসেন দক্ষিণ দিকের ঘাটে।

শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণীও প্রভাত বাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া উত্তরাভিমুখে চলিল। হেমচন্দ্র ও দিগ্বিজয় একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে অসঙ্গত সাহসে দুর্দমনীয় নদীর স্রোতবেগে আরোহণ করিয়া ঘাটে আসিয়া নামিলেন। দেবী চৌধুরাণীতে ত্রিস্রোতা নদীর কথা আছে। আর সমুদ্রতট হইতে আসিয়াও কপালকুণ্ডলা গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে বসন্তবায়ু-বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে ভাসিয়া গেল।

এইরূপ প্রায় পুস্তকেই নদীভ্রমণের উল্লেখ আছে। কেবল বাল্যে নয়, যৌবনে এবং প্রৌঢ় বয়সেও নৌকায় চড়িয়া যাইতে বঙ্কিম খুবই ভালবাসিতেন।

বঙ্কিমের কুজ্ঝটিকার ভ্রমণ সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র বলেন—

"এক দিবস এরূপ কুয়াসা চারিদিকে ব্যাপিয়াছিল যে, কোলের মানুষ দেখা যায় নাই। আমার জীবনে কখনও এরূপ কুয়াসা দেখি নাই; উহা প্রায় ১০।১১টা অবধি ছিল। আমরা কলেজে যাইবার সময় নৌকায় উঠিলাম। মাঝি নৌকা ছাড়িতে বিশেষ আপত্তি করিল, বলিল দিক্ ঠিক করিতে পারিব না। বঙ্কিম তাহা শুনিলেন না, নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিলেন। তখন ভাঁটা; নৌকা ক্রমাগত চলিতে লাগিল। আমাদের নৌকা দশ পনর মিনিটে কলেজ ঘাটে পৌঁছিত কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা হইল, নৌকা চলিতেছে, কিন্তু কোথায় কলেজের ঘাট! নৌকা কেবল চলিতেছে, চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস রে?" মাঝি বলিল, "আজ্ঞে তা জানিনা।"

"সে কি রে?"

"আজ্ঞে, বোধ হয় ভাঁটার স্রোতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।" মাঝি হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে, নৌকা ক্রমাগত স্রোতে ভাসিতেছে,

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল হাসিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নৌকা আপনা আপনি একস্থানে তীরলগ্না হইল। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন্ জায়গা ?"

মাঝি বলিল, "বুঝি মূলাজোড়" ।*

কপালকুণ্ডলায়ও দেখিতে পাই, "রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল ; নাবিকেরা দিঙ্ নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন দিকে, কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিলনা !"

বঙ্কিম ছেলেবেলা হইতেই খুব সাহসী ছিলেন। 'ব্রজেশ্বরের' ন্যায় ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। যে-ডাকাতের সর্দ্দার দেবী চৌধুরাণীর নামে উত্তরবঙ্গ কাঁপিত, সেই দেবীর কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বর যেমন হাসিয়াছিল, নির্ভীকতায় বঙ্কিমও তেমনি একবার ডাকাতের দলকে নিরস্ত করিয়াছিলেন,—তাহাও আবার শিশুকালে। বঙ্কিমের বয়স যখন ১১ কি ১২ বৎসর, সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে, এক দল ডাকাত আসিয়া বাড়ী লুট করিবে। সকলে ভয়ে অস্থির হইল এবং জ্যেঠামহাশয়, খুড়ামহাশয়, পিসেমহাশয় সকলে স্থির করিলেন যে, স্ত্রীলোক ও বালকগণ কয়েকরাত্রির জন্য প্রতিবেশীর বাড়ী থাকিবেন। বঙ্কিম শুনিয়া বলিলেন, "তাহা কিছুতেই হতে পারেনা, বাড়ী ছাড়িয়া কিছুতেই যাইব না।" তাঁহারা বলিলেন "তবে ডাকাতরা আসিয়া সকলকে কাটিয়া ফেলুক।" বঙ্কিম বলিলেন "কেন কেটে যাবে ? আমাদের বাড়ীতে তো অনেক লোক আছে, আর গ্রামের তেওর বাগ্‌দি যাহারা এক একজন লাঠিয়ান ও বোম্বেটেগিরি করে, তাহাদের নিযুক্ত করুন, সাধ্য

*মূলাজোড়—'শ্যামনগর' নামে খ্যাত, কাঁটালপাড়া হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

কি যে, ডাকাতরা আমাদের কেটে যায়?" বঙ্কিমের অগ্রজগণও বঙ্কিমের মতে মত দিলেন, এবং তাঁহারই পরামর্শমতে কয়েকজন লাঠিয়াল নিযুক্ত করা হয়। ডাকাতরা সত্যই আসিয়াছিল, কিন্তু লাঠির ভয়ে লাঠিয়ালদের সম্মুখীন হইতে পারে নাই, ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়।

এই দিনের স্মৃতি এবং লাঠির প্রভাব জীবনে তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই,—লাঠির মহিমা 'দেবী চৌধুরাণীতেই' আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন "হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল, খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ। হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গলায় আব্রু-পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমানগণ তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল।" "বাঙ্গলার কলঙ্কে" ও লাঠির কথা আছে।

'চন্দ্রশেখরের' রামচরণও লাঠিবাজিতে মুরসিদাবাদ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ; অনেক হিন্দু ও মুসলমান তাহার হস্তের গুণে ধরাশায়ী হইয়াছিল। 'সীতারামে'ও চন্দ্রচূড় গঙ্গারামের বধ্য ভূমিতে কতকগুলি লাঠিয়ালের সহায়তায় কাজীর ও ফকিরের মনোরথ ব্যর্থ করিয়াছিলেন।

ঐদিন হইতে গুরুজনেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে 'বাঁকা' বলিয়া ডাকিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে ভর্ত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামের পাঠশালায় মাঝে মাঝে যাইতেন। শিক্ষিত সহরের ছেলে পাঠশালায় আসিলে

গুরুমহাশয়রা একটু জড়সর হইতেন। বঙ্কিম গেলেই তিনি তাঁহার হাতে বেতখানি তুলিয়া দিতেন। বালক বঙ্কিম বেত লইয়া কোন কোন ছাত্রের নিকট গিয়া তাহা পরীক্ষা করিতেন। অধিকাংশ ছাত্র তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে দুইতিন জন বালকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর বেত তুলাইয়া বলিতেন "মারি মারি, আজ তোমরা কেন আমাদের বাড়ী তাস খেলতে যাওনি"? এইতো গেল তাস খেলার কথা, এখন এই বেতের সম্বন্ধে একটী নির্ভীক ব্যাপারের কথা বলিতেছি। পৌষ কি মাঘ মাসে একদিন সূর্য্যোদয়ে পাঠশালায় যাইয়া গুরুমহাশয়-দত্ত বেত লইয়া বালক বঙ্কিম কোন একটী বালকের নিকট বসিয়া তাহার লেখাপড়া দেখিতেছিলেন, এমন সময় একটা গোল উঠিল যে, গঙ্গার ঘাটে গোরার বহর লাগিয়াছে। এই সংবাদে চারিদিকের লোকজন কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক কি বালক ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল। পাঠশালার ছাত্রগণ পাত্তারি ফেলিয়া পলাইল। গুরুমহাশয় চটী জুতা পায়ে ফট্ ফট্ শব্দে পলাইলেন। যাহারা তরকারী লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, তরকারী ফেলিয়া পলাইল। মুহূর্ত্তমধ্যে রাস্তাঘাট নির্জ্জন হইল, বাজার শূন্য পড়িয়া রহিল। সকলের বাড়ীর দরজা বন্ধ হইল।*

কিন্তু বঙ্কিমের বাড়ীর দরজা বন্ধ হইল না, তিনি গুরুমহাশয়প্রদত্ত বেত হাতে করিয়া বাড়ীর লোকজনকেও নিজের কাছে রাখিলেন। বঙ্কিমের

---

* এইরূপ গোরাদের আসার ব্যাপার নূতন নহে। ১৮৮৯, ২৮শে ভাদ্র তারিখে লিখিত জ্যোতিশবাবুর স্ত্রীর পত্র ঃ—

"মঙ্গলবার দিন এখানে দেড় হাজার পল্টন আসিয়াছিল উহারা আসিয়া রাসখোলায় থাকে, ঐদিন সকালে আসে রাত্রে ১১টার গাড়ীতে যায়। সমস্তদিন ইংরাজী বাজনা বাজাইয়াছে; ঐ দিন আমাদের দরজা একেবারে খোলা হয় নাই।"

পিতা তখন বাড়ী ছিলেন না। শ্যামাচরণও কর্ম্মস্থলে। সকলেরই ভয় হইল কি অনর্থ হয়, কারণ গোড়ার নৌকাবহরে আসিলেই তাহারা ডাঙ্গায় উঠিয়া পাড়ায় নানারূপ অত্যাচার করিয়া থাকে। তাই গোরার নৌকা আসিলেই বা আসিবার ভয়েই গ্রামের লোকের হৃৎকম্প হইত। কিন্তু গোরারা দলে দলে আসিয়া বঙ্কিমের সঙ্গে কি কথা বলিয়া চলিয়া গেল। একজন বেতটী লইয়া দেখিতেও লাগিল, কিন্তু বঙ্কিম স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহাদের সহিত কথা বলিয়াছিলেন। সকলে দেখিলেন ভোজবাজীর মত গোড়ার দল ফিরিয়া গেল, বহর ছাড়িয়া দিল এবং গ্রাম আবার বিঘ্নশূন্য ও সজীব হইল।*

এইরূপ নির্ভীকতা বঙ্কিমচরিত্রের বিশেষত্ব এবং আমরা 'চন্দ্রশেখরে' দেখিতে পাই সুন্দরী শৈবালিনীর অঙ্গুলিনির্দ্দেশে ফষ্টরকে পুষ্করিণীর অপর পারে তালবৃক্ষতলে দেখিবামাত্র 'কি সর্ব্বনাশ!' বলিয়া আর কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে জলপূর্ণ কলস ভূমে নিক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পিত্তল কলস গড়াইতে গড়াইতে ঢক্ ঢক্ শব্দে উদরস্থ জল উদ্‌গীর্ণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার বাপীজল-মধ্যে প্রবেশ করিল—আর ইংরাজ দেখিয়া শৈবালিনী হেলিল না, দুলিল না, জল হইতে উঠিল না—আর ফষ্টর সেই সন্ধ্যাকালে শৈবালিনীর কাছে কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।

কেন বঙ্কিম বা তাঁহার শৈবালিনী পলাইল না—কারণ বঙ্কিম নিজেই লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজু নামে ভয় পায় কিন্তু একটী একটী এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখিতে চাহে। শৈবালিনীর সেই

---

* পশ্চিমাঞ্চল হইতে নৌকাযোগে কলিকাতা আসিত। যেখানে সূর্য্যোদয় হইত সেখানেই তাহারা ডাঙ্গায় আসিয়া প্রাতঃক্রিয়া ও ভোজনাদি করিত।

দশা ঘটিল। শৈবালিনী তখন প্রথম প্রথম তৎকালের রচিত প্রথানুসারে ফষ্টরকে দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইত, পরে কেহ তাহাকে বলিল "ইংরাজরা মানুষ ধরিয়া সদ্য ভোজন করে না—ইংরাজ অতি আশ্চর্য্য জন্তু—একদিন চাহিয়া দেখিও।" শৈবালিনী চাহিয়া দেখিল। দেখিল ইংরাজ তাহাকে দেখিয়া সদ্য ভোজন করিল না। সেই অবধি শৈবালিনী ফষ্টরকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল।" টিড্ সাহেবের পরিবারে সহিত বেশী মেশামেশীতে হউক বা স্বাভাবিক কারণবশতঃই হউক, এইরূপ নির্ভীকতা বঙ্কিমের পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

বঙ্কিমের আর একটী সাহসের কাহিনী ভাগিনেয় কৈলাসচন্দ্র লিখিয়াছেন।* বাঙ্গালার ছোটলাট Sir Ashley Eden বঙ্কিমচন্দ্রকে এক সময়ে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু বঙ্কিম যখন ১৭।১৮ বৎসরের যুবক, আর তিনি বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট, বঙ্কিম তাঁহাকে দুই একটী কড়া কথা শুনাইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত কাশীনাথ আদালতে একটা দরখাস্ত করায়, তদন্ত উপলক্ষে ইডেন সাহেব ঘোড়ায় চড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্রদের বাড়ী আসিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে যাইতেছিলেন। বঙ্কিম তখন উপরে ছিলেন—মহিলারা চীৎকার করিয়া উঠায় সাহেবের এবম্বিধ আচরণের কথা জানিতে পারেন। সাধারণ একজন শ্বেতাঙ্গ মনে করিয়া বঙ্কিম খুব রাগতভাবে জিজ্ঞাসা করেন—

Belie yourself for assuming the dress of an European gentleman while acting thus by trespassing into the female department of a native gentleman's

---

* Sayings on Bankim Chandra—Page 8.

house, not to say of foreigners, even one's male relatives are not allowed to enter there etc. etc.

আপনি ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছেন—আপনি শ্বেতাঙ্গের পোষাকে আসিয়াছেন আপনার লজ্জা হচ্ছে না।

ইডেন সাহেব ঐ স্থান জেনানা-মহল বলিয়া পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। তাই তিনি লজ্জিত হইয়া চলিয়া আসেন। বঙ্কিমও যখন ইডেন সাহেব বলিয়া জানিতে পারেন তখন তিনি নীচে আসিয়া ত্রুটী স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

এই তেজস্বী বালকই বড় হইয়া ব্রজেশ্বরচরিত্র অঙ্কন করিতে পারেন। কাপ্তেন ব্রেনান যখন গর্জ্জিয়া উঠিয়া ব্রজেশ্বরকে বলে "কেঁও, বড় জাড়্? টোম্ গোয়েন্দা নেহি?" ব্রজেশ্বরও 'নেহি' বলিয়া বিরাশী সিক্কায় এক চপেটাঘাত করিয়া দেয়।

এইরূপ চরিত্রাঙ্কণে অনেকেই হয়তো বিস্মত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় সাহসী ও নির্ভীক লোক যাহা আঁকিয়াছেন তাহাই সত্য ও খাঁটি।

সাহসী হইলেও বঙ্কিম কিন্তু খেলাধূলা ও দৌড়াদৌড়িতে যোগ দিতে চাহিতেন না। তবে তিনি একস্থানে বসিয়াও থাকিতে পারিতেন না। একখানি পুস্তক লইয়া কখনও বসিতেন, কখনও শয়ন করিতেন, কখনও দাঁড়াইতেন, কখনও পায়চারি করিতেন। কিন্তু পুস্তক পাঠে তাহার মন সমভাবেই নিবিষ্ট থাকিত। এ চাঞ্চল্যও প্রতিভারই লক্ষণ। বাল্যে তাসখেলায় তিনি বিশেষ আমোদ অনুভব করিতেন। অন্য কোনও আমোদ তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইত না।

ষাঁড়গরু ইত্যাদি দেখিলে বঙ্কিম দূরে সরিয়া যাইতেন। মই দিয়া ছাদে উঠিতে পারিতেন না। চল্লিশ বৎসর বয়সেও রথের

মেলার সময় বাড়ীতে বীভৎস আকৃতির মুখোস দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন।* আবার যৌবনে একবার বাড়ী আসিয়া দেখিলেন পূর্ণচন্দ্র একটী ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেছেন। তিনি আসিয়াই ঘোড়াটী বিক্রয় করাইলেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, কৈশোরে ইনিই ঝড় তুফানের ভয় করিতেন না। গোরাদলের সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ডাকাতের দলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। আবার যৌবনে ইনিই খুলনায় গুলিভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া নির্ভীক ভাবে শত্রুমহলে তদন্ত চালাইয়াছিলেন। লক্ষ টাকার নোটের তাড়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন, প্রৌঢ়ত্বে আবার একমাত্র যষ্টির সহায়তাই ডাকাতের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

এইরূপ বিরুদ্ধগুণ সমাবেশেই বঙ্কিমচরিত্র গঠিত। অন্যান্য বিষয়ে আজীবন এইরূপ বিরুদ্ধগুণের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ সাহস ও ভয়, ধৈর্য্য ও চাঞ্চল্য, দম্ভ ও দীনতা, ক্রোধ ও ক্ষমা, সংশয় ও বিশ্বাসের একত্র সমাবেশ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। অবশেষে ভগবান-নির্ভরতা ও পুরুষকার, বুদ্ধি ও ভক্তি সবই তিনি শ্রীশ্রী৺বিজয়-রাঘবের চরণে সমর্পণ করিয়া শান্তিলাভ করেন।

পূর্ণচন্দ্র বলেন "বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে এবং কৈশোরে গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু যে-সে লোকের নিকট নহে, কিম্বা যা'-তা গল্প নহে—সেকালের লোকের নিকট, সেকালের গল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের তুই একখানি উপন্যাস এইরূপ কোন কোন ঘটনা অথবা গল্প অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।

"আমাদের খুল্ল-পিতামহ একশত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। তাঁহার নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের

*সিদ্ধেশ্বর চাটুয্যের স্মৃতি।

কথা প্রথম শুনি। ইহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যেরূপে ঐ সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা আমার বোধ হয় একজন লেখকও পারিত কিনা সন্দেহ। সেকালের লোক 'ফসল, অজন্মা' এই সকল কথার সর্ব্বদা আন্দোলন করিতে ভালবাসিত। মেজ ঠাকুরদা প্রথমে ফসলের কথা তুলিলেন, পরে কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহা বিবৃত করিলেন। তিন-চারিবৎসর পূর্ব্ব হইতে অজন্মা হইল, আর ঐ বৎসর (১২৭৬ সালে) ফসল হইল না, এই কয় বৎসর অজন্মার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের আহার বন্ধ হইল, পরে মধ্যশ্রেণীর গৃহস্থের পরে ধনবানদের আহার বন্ধ হইল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগের কাহারও কাহারও লক্ষ লক্ষ টাকা পোঁতা থাকিত, (সেকালে এইরূপে টাকা সঞ্চিত থাকিত), তবুও তাহারা অনাহারে মরিতে লাগিল, কেননা, টাকা খাইতে পারেনা, টাকাতে ধান চাল কিনিবে, তাহা দেশে নাই, এইরূপ অবস্থাতে বঙ্গে নানাপ্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইয়া অবশেষে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। যাহাদের ঘরে টাকা পোঁতা ছিল, তাহারাও অন্নাভাবে চোর ডাকাত হইল। এই গল্পটী আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল; কেননা ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় ঐ গল্পটী আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধ হয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেকদিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে 'আনন্দমঠ' লিখিলেন।"

আমরা পরে দেখিব যে, বাল্যকালে গড় মান্দারণের এইরূপ গল্প শুনিয়াই তিনি উত্তরকালে "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বঙ্কিমের খুল্লপিতামহ মান্দারণের জমীদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া আসিয়া গল্প করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্কিম অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 'সখা'য় পড়িয়াছি, "ছেলেবেলা তিনি অঙ্কটী পাইতে না পাইতেই কষিয়া শিক্ষকের নিকট উহার উত্তর আনিয়া দিতেন এবং ১২।১৩ বৎসরের সময় হইতেই অঙ্ক কষিতে তাঁহার কোথাও একটু ভুল হয় নাই।" 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক পুস্তকেও লিখিত হইয়াছে যে, পূর্ণচন্দ্রের শ্রেণীতে বিশেষ একটী প্রতিজ্ঞাপূরণে সকল ছাত্রই অসমর্থ হইলে, অধ্যাপক মহাশয় নাকি ক্ষুব্ধভাবে বলিয়াছিলেন "বঙ্কিমচন্দ্র থাকিলে এ প্রতিজ্ঞাপূরণ আর আমাকে দেখাইতে হইত না।" অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার পারদর্শিতা উত্তরকালে তাঁহার জ্যোতির্ব্বিদ গণনায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সংস্কৃতশাস্ত্রে অধিকার সম্বন্ধেও পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ফলে তিনি হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় কৈলাসচন্দ্র তাঁহার 'Sayings'এ কয়েকটী কথার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"বরাহমিহির, খনা এবং অন্যান্য গ্রন্থপাঠে এবং ইংরাজী Napoleon, Laplace প্রভৃতির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তিনি জ্যোতিষে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। নিজেই সব পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিখিয়া ফেলেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার সঙ্গে পড়েন।

"একদিন ভৃত্য সংবাদ দিল, তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের বাড়ীর গাভীটী একটী কৃষ্ণবর্ণ বৎস প্রসব করিয়াছে। অমনি পঞ্জিকা খুলিয়া জন্মসময় ইত্যাদি দেখিয়া নিরূপণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার গণনায় স্থির হয় যে, গৃহস্বামী (সঞ্জীবের) খুবই অমঙ্গল হইবে। অবশ্য কি অমঙ্গল হইবে তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই। অল্পদিন পরেই সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

"আমার একটী কৃতী ছেলে বি. এল. পাশ করিয়া মারা যায়। তারপর নিতাই গৃহে অমঙ্গল হইতে থাকে। বঙ্কিমবাবু নিরূপণ করেন, মৃত্যুর সময়টী অত্যন্ত অশুভ। তাঁহার উপদেশানুযায়ী গ্রহ-শান্তি করিয়া অনেকটা রক্ষা হয়।"

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বঙ্কিমের এই অভিজ্ঞান নানা পুস্তকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "দুর্গেশনন্দিনী"তে অভিরামস্বামী বীরেন্দ্রসিংহকে বলিতেছেন—

"শ্রবণ কর, আমি কয়েকদিবস পর্য্যন্ত জ্যোতিষ-গণনায় নিযুক্ত আছি, তোমা অপেক্ষা তোমার কন্যা আমার স্নেহের পাত্রী, ইহা তুমি অবগত আছ ; স্বভাবতঃ তৎসম্বন্ধেই বহুবিধ গণনা করিলাম।"

বীরেন্দ্র—গণনায় কি দেখিলেন ?

পরমহংস কহিলেন "দেখিলাম যে, মোগল সেনাপতি হইতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল।"

বীরেন্দ্রসিংহের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল।

'মৃণালিনীতে'ও দেখিতে পাই—"একজন জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কেশবের মেয়ে অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে। কেশব এই কথায় অল্পকালে মেয়েকে হারাইবার ভয়ে, বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করি-লেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবার ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন করিলেন।"

এই কেশবের মেয়েই মনোরমা আর তাহার স্বামী পশুপতি।

'সীতারামে' জ্যোতিষ-গণনা একেবারে চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। সমগ্র উপন্যাসখানি জ্যোতিষগণনার ফলাফলের উপরেই যেন নির্ভর করিয়া ভাগ্যফল নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সীতারাম শ্রীকে

পরিত্যাগ করিয়াছিলেন জ্যোতির্গণনার উপরে বিশ্বাস করিয়া। সীতারাম শ্রীকে বলিতেছেন—

"তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের যখন কথাবার্ত্তা স্থির হয়, তখন আমার পিতা কোষ্ঠী দেখিতে চাহিয়াছিলেন, মনে আছে? তোমার কোষ্ঠী ছিলনা, কাজেই আমার পিতা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তুমি বড় সুন্দর বলিয়া আমার মা জিদ করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের মাসেক পরে আমাদের বাড়ীতে একজন দৈবজ্ঞ আসিল। সে আমাদের সকলের কোষ্ঠী দেখিল। তাহার নৈপুণ্যে আমার পিতাঠাকুর বড় আপ্যায়িত হইলেন। সে ব্যক্তি নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে জানিত। পিতাঠাকুর তাহাকে তোমার কোষ্টি প্রস্তুতকরণে নিযুক্ত করিলেন।

দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া আনিল। পড়িয়া পিতৃঠাকুরকে শুনাইল ; সেই দিন হইতে তুমি পরিত্যাজ্যা হইলে।"

শ্রী—কেন ?

সীতা—তোমার কোষ্ঠীতে বলবান চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।

শ্রী—তাহা হইলে কি হয় ?

সীতা—যাহার এরূপ হয় সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়। (সাধ্বী মন্দস্য প্রিয়প্রাণ-হন্ত্রী)

তবে সিদ্ধযোগী গঙ্গাধর স্বামী শ্রীর কর দেখিয়া শ্রীর ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাকে স্বামীর কাছে যাইতে নির্দ্দেশ দেন।

শ্রী নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলে গঙ্গাধর স্বামী তাহার মুখ পানে চাহিয়া হিন্দিতে বলিলেন—

"তোমার কর্কট রাশি।"

শ্রী নীরব

"তোমার পুষ্যা নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে জন্ম।"

শ্রী নীরব।

"গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।"

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া, তাহার বামহস্তের রেখা সকল স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্ম-শক, দিন, বার, তিথি দণ্ড, পল সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া; গুহাস্থিত তালপত্রে লিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া, দ্বাদশভাগে গ্রহগণের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন "তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র তিনটী শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।"

শ্রী—শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

স্বামী—তুমি তাহা দেখিবে না বটে। এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ এবং শুভগ্রহত্রয় পাপগ্রহের ক্ষেত্রে পাপদৃষ্ট হইয়া আছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজভোগ নাই।

শ্রী তা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল। আরও একটু দেখিয়া স্বামীকে বলিল, "আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?"

স্বামী—চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত।

শ্রী—তাহাতে কি হয়?

স্বামী—তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন "তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময়

উপস্থিত হইলে স্বামী-সন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী—কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী—এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। তুমি কোথা যাইতেছ?

শ্রী—পুরুষোত্তমে।

স্বামী—যাও। সময়ান্তরে, আগামী বৎসরে তুমি আমার নিকটে আসিও, সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।

জয়ন্তীকেও আসিতে বলিয়া স্বামী বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন···

পরের বৎসরে গঙ্গাধর স্বামী শ্রীকে দেখা দিলেন না বটে, তবে জয়ন্তীকে নির্দ্দেশ দেন যে, সে যেন শ্রীকে সীতারামের আবাসে লইয়া যায়। পাঠক জানেন, অতঃপরে শ্রীর সহায়তায় সীতারাম কিরূপে নিরাপদ স্থানে আসিয়া পড়েন, আর শ্রী কিরূপে অজ্ঞাতসারে তাহার সহোদর গঙ্গারামের মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে।

এতদ্ব্যতী, 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত নানারূপ প্রবন্ধ হইতেও বঙ্কিমের জ্যোতির্বিজ্ঞান—বিশেষতঃ ফলিত জ্যোতিষ—সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যায়।

"সীতারামের" পর আর কোন গ্রন্থে জ্যোতিষ-গণনার কথা পাওয়া যায় না। বঙ্কিম অতঃপরে জ্যোতিষির চর্চ্চা বা বিচার আর করেন নাই, তাই রাজসিংহ ও ইন্দিরা (বর্দ্ধিত সংস্করণ)

জ্যোতির্ব্বিদদের গণনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। এই বিষয়ে বঙ্কিমের ১৮৮৯, আগষ্ট মাসে লিখিত একখানি পত্রাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনায়
ছিল, কিন্তু এক্ষণে বিশ্বাস করিনে
আমি উহার অনেক পরীক্ষা
করিয়া দেখিয়া বিশেষরূপে
বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছি।

ইতি [illegible] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র

এই বিশ্বাস পরিত্যাগ না করিলে আমরা হয়তো দেখিতাম যে, অনন্ত মিশ্র কেবল চঞ্চলকুমারীর পত্রবাহকই হইতেন না, পরন্তু রাণার সঙ্গে বিবাহ এবং মোগলবাহিনীর পরাজয়ের কথাও নিশ্চয়ই তাঁহার কোষ্ঠী দেখিয়া বলিতেন।

ইতিহাসে

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইতিহাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাতিশয় অনুরাগ ছিল। এই অনুরাগ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যের প্রতি অনুরাগ সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু "কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী আগ্রহ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ফ্লোরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। রেন্যাসাঁস (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গলারও যাহাতে আবার নব-

জীবন সঞ্চার হয় তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গলার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' সম্বন্ধে সাতটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।" [হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 'কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র'। 'নারায়ণ' ১৩২২, বৈশাখ।]

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত বিবরণ ('পুরোহিত' ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ) হইতেও জানিতে পারা যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনিই অনুপ্রেরণা দিয়া একখানি উপন্যাস লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত-প্রবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করিয়াছেন, "বঙ্কিম-চন্দ্রের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি।" 'নারায়ণ' বৈশাখ ১৩২২।

বস্তুতঃ, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাস ইতিহাসের ভিত্তির উপরে সঙ্কলিত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' নামে যে একখানি অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাতে যেমন সাহিত্য-সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত, তেমন খাঁটি ইতিহাসও কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই। যদিচ বর্ত্তমানযুগের উক্ত উপন্যাসের ভূমিকালেখক বঙ্কিচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভুল দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থকার 'বঙ্গশ্রী' নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রে ১৩৪৮ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩৪৯এর জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কয়েকটী প্রবন্ধে বঙ্কিমের ইতিহাসে পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক উপন্যাসে 'রাজসিংহের' শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধগুলি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে পাঠক আরও তত্ত্ব পাইবেন। বঙ্কিমের জীবনের সহিত ইতিহাসের ঘোর সম্বন্ধ। ইংলণ্ডীয় রাজনীতিকদলের পরস্পর-বিরোধ, আফগান-যুদ্ধ, শিখসমর, ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, ইলবার্ট বিল, জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ব্যাপার তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই অনুষ্ঠিত হয়।

বস্তুতঃ ইতিহাসে তাহার স্বাভাবিক অনুরাগের জন্য তাঁহার প্রবন্ধ ও উপন্যাসেও ইতিহাস যেন সর্ব্বদাই অলক্ষ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

পিতৃভক্তিতে

বঙ্কিম খুব পিতৃভক্ত ছিলেন। সেই পিতৃভক্তি বাল্যে কি যৌবনে কি প্রৌঢ় বয়সে কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। হুগলী কলেজের পরবর্ত্তী অধ্যাপক স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (যিনি 'বঙ্গদর্শন' ব্যাপারে বঙ্কিমের দক্ষিণহস্ত ছিলেন) বলিয়াছেন যে, যাদব বাবুকে গঙ্গাযাত্রা করা হইলে বঙ্কিমবাবু ও পূর্ণবাবু অন্যান্য আত্মীয়গণসহ সর্ব্বদা তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। একদিন বঙ্কিমবাবু পার্শ্বের ঘরে উপবিষ্ট, এমন সময় পিতার দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার কর্ণমূলে প্রবেশ করিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া বলিলেন, "অমন করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন কেন?" তিনি বলিলেন "আর কিছু নয় বঙ্কিম, মনের একটা কষ্ট আছে, কিন্তু তোমায় বলিতে সাহস হয় না।"

বঙ্কিম—কেন বাবা?

যাদব—তুমি কয়েকবার আমার ঋণ পরিশোধ করিয়াছ, কিন্তু কতবার আর বলিব?

বঙ্কিমবাবু অমনি বলিলেন "সে সব ভাবিবেন না। দেনা আছে আমি আছি, আপনি এ সময়ের যে চিন্তা তাহাই করুন।"

সেই মৃতপ্রায় মহাপুরুষের মন প্রফুল্ল হইল, তখন তাঁহার দেনা নাকি ৪০০০৲। বঙ্কিমবাবু পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে যথাস্থানে কাগজপত্রাদির উল্লেখ করিব।

পূজনীয় শচীশচন্দ্র বঙ্কিমের পিতৃভক্তি সম্বন্ধে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এইখানে তাহা নিবেদন করা কর্ত্তব্য—

"—একবার পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্রের অসুখ হইয়াছিল। তিনি খাটের উপর শয্যায় শয়ান ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পিতার নাড়ী পরীক্ষা করিবার বাসনা করিলেন। যাদবচন্দ্রের একপার্শ্বে গৃহপ্রাচীর অপর পার্শ্ব উন্মুক্ত। যাদবচন্দ্র প্রাচীরের নিকট শয়ান ছিলেন। শয্যার উপরে না উঠিলে যাদবচন্দ্রকে স্পর্শ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র বিপদে পড়িলেন, শয্যার উপরে উঠিতে পারেন না, পিতাকেও সরিয়া আসিতে বলিতে পারেন না। অবশেষে তিনি এক পার্শ্বের বিছানা উঠাইয়া খাটের উপর পা রাখিয়া পিতার হস্ত স্পর্শ করিলেন। পিতার শয্যা, পিতার বসন, পিতার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি পবিত্র জ্ঞান করিতেন। পিতার কক্ষে কখনও চর্ম্মপাদুকা ধারণ করিয়া আসিতেন না—পিতার ব্যবহৃত বস্তু কখনও ব্যবহার করিতেন না।

"আর একদিনের কথা বলিব। একদা বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাদবচন্দ্র তখন নিম্নমুখে বঙ্গদর্শনের হিসাব লিখিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি কাণে কম শুনিতেন। পদশব্দ শুনিতে পাওয়া দূরে থাক্, নিকটে দাঁড়াইয়া সহজকণ্ঠে কেহ কথা কহিলেও তিনি কথা শুনিতে পাইতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের পদশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশলাভ করিল না। পিতৃভক্ত সন্তান পিতার কার্য্যে বাধা দিতে পারে না—শিক্ষিত ভদ্র সন্তান পিতাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে পারেন না। পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া চলিয়া যাওয়াটা তিনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না; তাহাতে পিতার প্রতি একটু যেন অবজ্ঞা দেখান হয়—যেন একটু অধৈর্য্য, একটু বিরক্তি প্রদর্শন করা হয়। জানিনা, কি ভাবিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে, নিঃশব্দে পিতার অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া

বলিতে পারি না। অবশেষে যাদবচন্দ্রের একজন বৃদ্ধা দাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঈদৃশ বিপদাপন্ন দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং উচ্চৈস্বরে ডাকিল, 'কর্ত্তামহাশয় ও কর্ত্তামহাশয়, সেজবাবু এসে দাঁড়িয়ে আছেন যে।'

"কর্ত্তা মহাশয় তখন মাথা তুলিয়া দেখিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া বসিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র ব্রজেশ্বরচরিত্রে নিজ চরিত্রের ছায়াপাতই করিয়াছেন। ব্রজেশ্বর পিতা হরবল্লভের নিকটে দণ্ডায়মান, সব কথায়ই একই উত্তর দিতেছেন—"যে আজ্ঞা"

বঙ্কিম লিখিতেছেন—

"ব্রজ নীরব, বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে হীরার ধার হইলেও সে কালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, ততবড় লম্বা স্পীচ ঝাড়ে"।

এই স্পীচ ঝাড়িবার পুত্রও বঙ্কিমের নিকটেই ছিলেন।

এই ব্রজেশ্বর আবার যখন বুঝিলেন, হরবল্লভ কোম্পানীর সিপাহীর দ্বারা দেবীকে ধৃত করিতে আসিতেছেন তখনও মনে হইতেছে 'পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গ'—তখনও প্রফুল্লকে বলিতেছেন "আমি মরি, কোন ক্ষতি নাই। তুমি মরিলে আমার মরার অধিক, কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

আবার ব্রজেশ্বরকে লেফ্‌টানেণ্ট ব্রানেন্ ঘুষি দিতে আসিলে সেও যখন তাহার গালে বিরাশী শিক্কার ওজনে এক চপেটাঘাত করে, আর পিতা একান্ত বিচলিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন, ব্রজেশ্বরও উত্তর করে—"সাহেব, আমরা হিন্দু, পিতৃ-আজ্ঞা আমরা কখনও লঙ্ঘন করি না।…মাফ্‌ করুন।"

তবে ব্রজেশ্বর ও বঙ্কিমের পিতৃভক্তিতে একটু পার্থক্য আছে। বঙ্কিমের পিতা ছিলেন সাধু-চরিত্র এবং সকলের ভক্তির পাত্র, আর হরবল্লভ ছিলেন কুচক্রী। যে অন্যের ভক্তির পাত্র নয়, সেইরূপ পিতাকেও পুত্রের কিরূপ ভক্তি করা উচিত, বঙ্কিম ব্রজেশ্বরচরিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন। এখানে বঙ্কিম নিজের চেয়েও ব্রজেশ্বরকে অনেক উন্নত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।

সাক্ষাৎ নিষ্কামব্রতী দেবতুল্য পিতৃদেব পাইয়াছিলেন বলিয়াই নিষ্কামকর্ম্মী কর্ম্মযোগী কয়েকটী চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

একালে যেমন আবৃত্তি ও অভিনয়ের প্রচলন আছে, বঙ্কিমের সময়ে হুগলী কলেজে তেমন ছিল না, তবে বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভাল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। সংস্কৃত শ্লোক, বাঙ্গলা কবিতা ও ইংরাজী রচনা তিনি সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন এবং ভাল ভাল জিনিষ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এ সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বঙ্কিম সুলেখক বলিয়া সাধারণে পরিচিত, কিন্তু তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট পাঠক ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নূতন সৃষ্টি হইলে উহার গানে আমার গায়ে জ্বর আসিত, কিন্তু যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে "মেঘনাদবধ" কাব্য পাঠ করিতে শুনিলাম, সেই দিন হইতে আমি কাব্যের গোঁড়া হইলাম! কতবার উহা পড়িয়াছি, তাহার ঠিক নাই! বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে পড়িতাম। তিনি যখন পুস্তক পাঠ করিতেন, সকলে নিঃশব্দে শুনিতেন। বাল্যকালে তিনি যখন কবিতা, শ্লোক আবৃত্তি করিতেন তখন আশে পাশে লোক দাঁড়াইয়া শুনিত। একদিন তাঁহার পড়িবার ঘরে বসিয়া "পদাঙ্কদূতে"র "গোপীভর্ত্তুর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দুবরাক্ষী" ইত্যাদি শ্লোকটীর আবৃত্তি করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ ঘরে অনেকগুলি পণ্ডিত প্রবেশ

করিলেন। তন্মধ্যে দেশপূজ্য পণ্ডিত ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ছিলেন। ইহারা পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দর আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় একজন প্রতিভাবান ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বোধ হয় স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভিন্ন তাঁহার তুল্য পণ্ডিত বাঙ্গালা দেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বসাইলেন ও তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অনুরোধে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার পর হইতে চূড়ামণি মহাশয় মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘরে আসিতেন ও মহাভারতের অনেক কথা শুনাইতেন। তাঁহারই নিকট 'নলোপাখ্যান' ও 'শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান' প্রথম শুনি। আমার বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতিভাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, নতুবা এই অসাধারণ পণ্ডিত বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য এত চেষ্টিত হইবেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্যও তর্কচূড়ামণি মহাশয় পিতৃদেবের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের একটা কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে সর্ব্বদা শুনিতাম—

'বিনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।

বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে ভারতচন্দ্রের ছন্দোবন্ধের বড় প্রশংসা করিতেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিতেন না। 'দুর্গেশনন্দিনীর' আশমানীর রূপবর্ণনা পাঠ করিলে সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

বঙ্কিম লিখিতেছেন "আশমানীর বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায়।··· অপমানে সাপ গর্ত্তের ভিতর গেলেন,···ইত্যাদি।"

'দুর্গেশনন্দিনী', দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সিপাহী-বিদ্রোহ ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র যখন কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতেছেন, তখন ভারত জুড়িয়া সিপাহী-বিদ্রোহের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। আর এই হাঙ্গামার সূত্রপাত হয় প্রথমে এই বাঙ্গলাদেশেই—দমদমায়, তারপরে বারাকপুরে। দমদমায় প্রথম রব উঠে যে, বন্দুকের টোটার উপরকার কাগজ গরু ও শূকরের বসা দ্বারা লিপ্ত করিয়া প্রস্তুত হয়। ইহাতে ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে বারাকপুরে সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কেননা টোটা লাগাইতে দাঁতের ব্যবহার করিতে হয়। তারপর মীরাট, দিল্লী, কাণপুর, এলাহাবাদ আরা, ঝাঁসি প্রভৃতি স্থানে উহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ভারত-ইতিহাসের এই বিপ্লবকারী বিদ্রোহের সময়ই বঙ্কিম কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে পড়িতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ঝাঁসীর রাজ্যের উত্তরাধিকারী না থাকায় লর্ড ড্যালহৌসী উহা সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মৃত রাজা গঙ্গাধর রাওর স্ত্রী লক্ষ্মীবাই এই অপমান বরদাস্ত করেন নাই। তিনি "মেরী ঝাঁসি নেহি দেঙ্গি" বলিয়া আপনাকে রাণী বলিয়া ঘোষণা করেন। আর গঙ্গাবাঈ তাঁহাকে সহায়তা করেন। লক্ষ্মী বাঈর বীরত্ব দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতি Sir Hugh Ross পর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে, তাঁহার ন্যায় সাহসী এবং পরাক্রান্ত আর কোন বিদ্রোহ নেতাই ছিলেন না। আর ইংরাজ ইতিহাস লেখকও শতমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিদ্রোহ নায়ক তাঁতিয়া টোপী অপেক্ষাও তিনি অধিক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন।

১৮৫৮ সালের এপ্রিলে বঙ্কিম যখন বি, এ পরীক্ষা দেন, ঝাঁসিরাজ্য ইংরাজাধিকৃত হয়, আর রাণী লক্ষ্মীবাঈ যোদ্ধবেশে বীরপুরুষের ন্যায়

শত্রুর সম্মুখীন হইয়া মৃত্যু বরণ করেন। স্থির-মস্তিষ্ক গভর্ণর জেনারেল উদার লর্ড ক্যানিংএর বুদ্ধিবলে বিদ্রোহ অচিরে প্রশমিত হয়, ভারতবর্ষে সুশাসনের ব্যবস্থা হয় (আগষ্ট ১৮৫৮) এবং নভেম্বর মাসে মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। এই আগষ্ট মাসেই বঙ্কিম প্রথম চাকুরীতে বহাল হন। নভেম্বর মাসে তিনি যশোহরে ছিলেন।

কৈলাসচন্দ্র ও শচীশচন্দ্র 'Sayings on Bankim Chandra'ও 'বঙ্কিমজীবনীতে' লিখিয়াছেন "১৮৫৭ সালে বঙ্কিম হুগলী কলেজে পড়িতে ছিলেন, আর তখন তাঁহার সঙ্গীর দিকে কুকুর এলাইয়া দেওয়ায় কোন এক শ্বেতাঙ্গের প্রতি "Fine sport indeed" বলিয়া গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আর অন্য একদিন চুঁচুড়ার কোন এক বাড়ী হইতে থিয়েটার দেখিয়া ফিরিবার সময় সামরিক কর্ম্মকর্ত্তা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নাকি সদর্পে উত্তর দিয়াছিলেন, "আমরা যে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছি, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন।" দুইটী ঘটনাই বঙ্কিমের সাহসের পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্কিম সিপাহী বিদ্রোহের সময় যখন কলিকাতাতেই পড়িতেন—হুগলী কলেজ পূর্ব্ববৎসরই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তখন অনেক পাঠক হয়তো এই দুইটী ঘটনার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে রাজী হইবেন না। শচীশবাবু বোধ হয় গল্পটী কৈলাসবাবুর নিকট শুনিয়া থাকিবেন। আর কৈলাসবাবু বলেন, তিনি মাতুলের সঙ্গে ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন। যদিচ উপলক্ষ তাঁহার মনে নাই, কিন্তু কাঁটালপাড়ার অপরতীরস্থ চুঁচুড়ায় থিয়েটার দেখিবার ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। ঘটনাটী সত্য বলিয়াই আমাদের প্রতীতি হইয়াছে। আর উহাতে বঙ্কিমের সাহস ও তেজস্বিতাই প্রকটিত হয়।

সিপাহী-যুদ্ধের ঘটনা বঙ্কিমের কলিকাতা অবস্থানকালে হইলেও বঙ্কিম সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লেখেন নাই।

বা কোন প্রসঙ্গও উপস্থিত করেন নাই। তাঁহার নিজের বিশ্বাস ছিল—"ইংরেজ মিত্র রাজা। অনর্থক নরহত্যা গর্হিত কার্য্য। ব্রাহ্মণ্য নীতিতে (ক্ষমাবান, দানশীল, জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলে) যুদ্ধের প্রয়োজন থাকেনা। ইহাতেই সকল যুদ্ধ ও সামাজিক উৎপাত তিরোহিত হইতে পারে। অতএব যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান শিখুক। যে পর্য্যন্ত আমরা আবার গুণবান ও বলবান না হই, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে।

"যাহা হউক সিপাহী বিদ্রোহের কোন উল্লেখ কোন পুস্তকে না থাকিলেও "আনন্দমঠ" উপন্যাসে ইহার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

সত্য বটে, আনন্দমঠ উপন্যাসখানি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উপলক্ষ করিয়া লিখিত এবং মুসলমান শাসন, উহার পরিবর্ত্তন, ইংরাজের প্রথম শাসন প্রবর্ত্তন প্রভৃতিই ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু খুঁজিলে উভয়ের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। পাঠকনিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে প্রণিধান করিবেন। সিপাহী-বিদ্রোহ ও আনন্দমঠ বর্ণিত বিদ্রোহ—উভয়ই বিদ্রোহ, আর উভয়ই হিংসাত্মক। উভয়েরই উদ্ভব অনাচার প্রাবল্য হেতু এবং অবৈধ উপায় অবলম্বন করায়—উভয়েই ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। সন্তান বিদ্রোহের ফলে ইংরাজের অধিকার দৃঢ় হয়। আর আর সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ইংরাজ শাসন সুদৃঢ় হয়। আনন্দমঠে মহাপুরুষের কথা ১৮৫৮ সালের কথারূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। মহাপুরুষ বলিতেছেন—

"ইংরেজ এক্ষণে বণিক—অর্থ সংগ্রহেই মন; রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাহেনা। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে, কেননা রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ

হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে……।" সিপাহী-বিদ্রোহের ফলেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিক্-শাসন বিলুপ্ত হয়, ভারত-সচিব নিযুক্ত হন এবং স্বয়ং মহারাণী রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করেন। লর্ড ক্যানিংই মহারাণীর প্রথম প্রতিনিধি (ভাইসরয়)।

তবে একথা যথার্থ যে, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় মাতৃভূমি উদ্ধারব্রতী প্রকৃত বীর কেহ ছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু বঙ্কিম 'আনন্দমঠে' খাঁটি ত্যাগব্রতী আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক চরিত্র সন্ন্যাসী সত্যানন্দে আরোপ করিয়াছেন। তবে সত্যানন্দ অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া দেশোদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই খাদটুকু (স্বর্ণের শ্যামিকা) পোড়াইয়া খাঁটি সোণা করিবার জন্যই 'চিকিৎসক-বঙ্কিমচন্দ্র' সত্যানন্দকে বলেন—

"সত্যানন্দ, কাতর হইওনা! তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশোদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, ভালই হইবে। ইংরাজ রাজা না হইলে সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।……অতএব হে বুদ্ধিমান,—ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিয়া জ্ঞানলাভের জন্য হিমালয় শিখরস্থ মাতৃমন্দিরে মাতৃ-মূর্ত্তি দেখাইতে লইয়া গেলেন। 'বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল,' কেন না, জ্ঞানলাভের পরে আবার প্রতিষ্ঠা আসিবার পথ প্রস্তুত করিবার জন্য।

"বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী",—বঙ্কিমের এবম্বিধ বিশ্বাস থাকিলেও, রাণী লক্ষ্মীবাঈ কিন্তু বঙ্কিমের যৌবনকাল হইতেই তাঁহার মানস মন্দিরে এইরূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিলেন যে, অতঃপরে বঙ্কিম তাঁহার সৃষ্ট

প্রধান প্রধান নারী চরিত্রে লক্ষ্মীবাঈর আদর্শে স্বদেশপ্রেম, সাহস ও কর্ম্মতৎপরতার উজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার শান্তি, *প্রফুল্ল এবং শ্রী; চঞ্চলকুমারী নির্ম্মলকুমারী, বিমলা; মনোরমা,* মৃণালিনী, শৈবলিনী প্রভৃতি চরিত্রমাত্রই অল্লাধিক বীরত্ব, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বিভূষিত হইয়াছে।

বঙ্কিম নিজেই শ্রীশবাবুকে বলিয়াছেন,

"এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ, সে কথা আমি একবার বুঝাইবার চেষ্টা পেয়েছি। ইউরোপের মত মনস্বিনী স্ত্রীর কথাই বল, ঝাঁসির রাণীর চেয়ে কেহ উচ্চ নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে অমন নায়িকা আর নাই। ইংরাজ সেনাপতি রাণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বলিয়াছিল, 'প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোক পুরুষ।' আমার ইচ্ছা হয় একবার সে চরিত্র চিত্র করি, কিন্তু এক আনন্দমঠেই সাহেবরা চটিয়াছে, তা হ'লে আর রক্ষা থাক্‌বেনা।"

বঙ্কিমচন্দ্র শান্তি-চরিত্রে একটু ছায়ার আলোক সম্পাত করিলেও তাহাও প্রায় কায়ার অনুরূপই মনে হয়। এখানে শান্তির একটু পরিচয় দিব। বঙ্কিম যেভাবে শান্তিকে শিক্ষিতা করিয়া বলশালিনী ও সাহসী করিয়াছেন, তাহার কার্য্যও ঠিক তদুপযোগীই হইয়াছে।

শান্তি প্রথমে বালক-সন্ন্যাসী বেশে এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আসিল। সেখানে এক সন্ন্যাসী শান্তিকে কাব্য পড়াইতে লাগিল··· ব্যাধ যেমন হরিণীর প্রতি ধাবমান হয়, শান্তির অধ্যাপক শান্তিকে দেখিলেই তাহার প্রতি সেইরূপ ধাবমান হইতে লাগিলেন। কিন্তু শান্তি ব্যায়ামাদির দ্বারা পুরুষের দুর্লভ বলসঞ্চয় করিয়াছে।* অধ্যাপক নিকটে আসিলেই তাঁহাকে কিলঘুষার দ্বারা পূজিত করিত।

---

*বঙ্কিম 'প্রফুল্ল'কেও মল্লযুদ্ধে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন কেননা উহা আত্মরক্ষা ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল। ('অনুশীলন', অষ্টম অধ্যায়)

কিলঘুষাগুলি সহজ নহে। একদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর শান্তিকে নির্জ্জনে পাইয়া বড় জোর করিয়া শান্তির হাতখানা ধরিলেন, শান্তি ছাড়াইতে পারিল না। কিন্তু সন্ন্যাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে হাতখানা শান্তির বাঁ হাত; ডাহিন হাতে শান্তি তাহার কপালে এমন জোরে ঘুষা মারিল যে, সন্ন্যাসী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শান্তি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শান্তি ভয়শূন্যা। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বন্যফলের দ্বারা উদর পোষণ করিতে করিতে এবং মারামারিতে জয়ী হইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তারপরে পাঠক দেখিবেন, শান্তি কিরূপ সন্ন্যাসীবেশে

'দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাওরে
সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাওরে।'

বলিয়া জীবানন্দের সন্ধানে মঠে চলিল—যুদ্ধ করিবার জন্য নহে, বা স্বামীর ব্রতভঙ্গ করিবার জন্য নহে—স্বামীর বল বৃদ্ধি করিবার জন্য। আর সত্যানন্দও স্বীকার করিয়াছিলেন "তোমায় আমি চিনিতাম না, মা, তোমার দ্বারা আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে।" এই কার্য্য সমাধা হইয়াছিল বলিয়াই বঙ্কিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজেই বলেন "হায়, আসিবে কি মা? জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি?"

শান্তির গায়ের বলও বড় সাধারণ ছিল না। সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"প্রভু, স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না?"

সত্য—গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি—সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখনও পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

"হাঁ" বলিয়া সত্যানন্দ এক ইস্পাতের ধনুক আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন; বলিলেন যে, এই ইস্পাতের ধনুকে এক লোহার তারে গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয়, তাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান্।"

শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল "সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?"

সত্য—না, ইহাদ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি—কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই?

সত্য—চারিজন মাত্র।

শান্তি—জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে?

সত্য—নিষেধ কিছু নাই। একজন আমি।

শান্তি—আর?

সত্য—জীবানন্দ। ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল। সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—একি, তুমি দেবী না মানবী?

লক্ষ্মীবাঈয়ের ছায়ায় চিত্রিত করিলেও বঙ্কিম ভুলিয়া যান নাই যে, শান্তি বাঙ্গালী মেয়ে। বঙ্কিম্ শান্তিকে বাঙ্গালী মেয়ে রাখিয়াই সত্যানন্দের কার্য্যোদ্ধার করাইয়াছেন।

মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য দিনে জীবানন্দ ও শান্তি স্থির করিলেন, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন; কিন্তু পথে যাইতে যাইতে একটী টিলার উপর হইতে বীরদম্পতি দেখিলেন—নিম্নে কিছুদূরে ইংরেজের শিবির। শান্তি বলিল "মরার কথা এখন থাক্, বল 'বন্দেমাতরম্'।"

উভয়ে পরামর্শ করিল। শান্তি বৈষ্ণবী সাজিয়া মেজর এড্ওয়ার্ডসের শিবিরে গেল,—সংবাদ সংগ্রহের জন্য। আর জীবানন্দ জঙ্গলমধ্যে লুকাইলেন। তারপরে শান্তি ইংরাজ সেনাপতির উদ্দেশ্য যখন বুঝিল, মেলা আক্রমণের কথা ভাণ মাত্র, প্রকৃত উদ্দেশ্য পদচিহ্ন-গড় অধিকার, তখন সে কৌশলে লিণ্ডলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে ফেলিয়া দেয় এবং বায়ুবেগে আরবী ঘোড়া ছুটাইয়া জীবানন্দের কাছে চলিয়া আসে। এই ঘোড়ার সহায়তায়ই জীবানন্দ সন্তান-সৈন্যগণকে পদচিহ্নের দিকে ফিরাইয়া আনে, তাহাদিগকে যুদ্ধে উদ্দীপিত করে, আর তাহাদের সহায়ে ইংরাজ-সৈন্য নিষ্পেষিত করে। সত্যানন্দের কার্য্য উদ্ধার হইল, ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায় এমন লোকও রহিল না, জীবানন্দেরই জয় হইল।

যুদ্ধ না করিলেও শান্তি যে কার্য্য করিয়াছিল, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ অপেক্ষা তাহা কম শ্লাঘনীয় নয়।

অতঃপরে বঙ্কিম এরূপ চরিত্র আর অঙ্কিত না করিলেও, হিন্দুর চক্ষে দেবীচৌধুরাণীকে বীরাঙ্গনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। প্রফুল্ল অমিতবলশালিনীও বটে, আবার তাহার যাবতীয় চিত্তবৃত্তি সম্যক্ অনুশীলিতও বটে। 'সীতারামের' শ্রীতেও দেখিয়াছি পূর্ব্বাপর বীরাঙ্গনার সাহস ও শক্তি উদ্ভাসিত হইয়াছে।.........

শ্রীই "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে" বলিয়া স্বামীর প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করেন, শ্রীই "মার, মার, শত্রু মার" বলিয়া লাঠি-সরকী ওয়ালাদিগকে উৎসাহিত করেন, শ্রীর উৎসাহেই যুদ্ধে জয়লাভ হয়, গঙ্গারাম রক্ষা পায়।

তারপরে বঙ্কিম শ্রীকে দিয়া যাহা করান, তাহাতে মনে হয় বঙ্কিম সে দিক পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু বঙ্কিম প্রথমে চাহিয়াছিলেন

শান্তিরই অনুরূপ এবং তদপেক্ষা মহত্তর বীরাঙ্গনা চরিত্র অঙ্কন করিতে। চন্দ্রচূড় শ্রীকে বলিতেছে "তোমার নিজ বাড়ীতে এখন একা থাকিবে কি প্রকারে? বিশেষ মুসলমানের ভয়।"

শ্রী—ঠাকুর! মুসলমানের এ দৌরাত্ম্য কতকাল থাকিবে? শাস্ত্রে কি কিছু নাই?

চন্দ্র—কিছু না মা। এ শাস্ত্রের কথা নয় মা, হিন্দুর গায়ে বল হইলেই হইল।

শ্রী—ঠাকুর, হিন্দুর গায়ে বলের কি অভাব? এইতো এখনই দেখিলেন"।

বলিতে বলিতে সে দৃপ্তা সিংহীর মত ফুলিয়া উঠিল।

চন্দ্র—যা দেখিলাম, মা, সে তোমারই বল, এমন কি আবার হইবে?

দৃপ্তা সিংহী লজ্জায় মুখ অবনত করিল, আবার মুখ তুলিয়া বলিল—

"হিন্দুর গায়ে বলের এত অভাব কেন? কত লোকের বলের গল্প শুনি?" তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড় অলক্ষ্যে শ্রীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, মনে মনে বলিলেন, "বেশ, বাছা বেশ! আমার মনের মত মেয়ে তুমি। আমিও সেই কথাটা ভাবিতেছিলাম।" প্রকাশ্যে বলিলেন "হিন্দুর মধ্যে বলবান কি নাই? আছে বৈকি? কিন্তু তাহারা মুসলমানের মুখ চায়। এই দেখ সীতারাম না পারে কি? কিন্তু সীতারাম রাজভক্ত—বাদশাহের অনুগৃহীত। অকারণে রাজদ্রোহী হইবে না। কাজেই কে ধর্ম্মরক্ষা করে?

শ্রী—কারণ কি নাই?

জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রী আবার মুখ নামাইল, বলিল—আমি অবলা; আপনাকে কেন এত জিজ্ঞাসা করিতেছি জানিনা, আমার মার শোকে, ভাইএর দুঃখে মন কেমন হইয়া গিয়াছে—তাই আমার জ্ঞান-বুদ্ধি নাই।

চন্দ্রচূড় সে কৈফিয়ৎটা কাণেও না তুলিয়া বলিলেন, "কারণ ত ঘটে নাই। ঘটিলে কি হইবে বলিতে পারি না। সীতারাম যতদিন মুসলমানের দ্বারা অত্যাচার প্রাপ্ত না হয়েন, বোধহয় ততদিন তিনি রাজদ্রোহ পাপে সম্মত হইবেন না।"

শ্রী অনেকক্ষণ নীরবে ভাবিল। চাতক পাখী যেমন মেঘের প্রতি চাহিয়া থাকে, ততক্ষণ চন্দ্রচূড় তাহার মুখপ্রতি সেইরূপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। শ্রী বহুক্ষণ অন্যমনা হইয়া ভাবিতেছে—যেন সংজ্ঞাহীন।

এই যে শ্রী দৃপ্তা সিংহীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিলেন, সংজ্ঞাহীন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—ইহাই শ্রীর আসল রূপ,—যে শ্রীর জন্য সীতারাম বরাবর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছে—

"যে বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনী অঞ্চলসঙ্কেতে সৈন্য সঞ্চালন করিয়া রণজয় করিয়াছিল, যদি সেই শ্রী সহায় হয়, তবে সীতারাম কি না করিতে পারেন ?

সীতারাম, ১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।

কিন্তু কর্ম্মস্রোত শ্রীকে অন্যদিকে প্রধাবিত করিল। কোষ্ঠীর কুফল না ঘটে, তাই শ্রী দেশ ছাড়িয়া গেল। ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু তখন সে কর্ম্মহীনা। পরে আবার শ্রীর পূর্ব্ব তেজ ফিরিয়া আসিয়াছিল। শ্রী ও জয়ন্তী শত্রুর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার তোপ জিতিয়া লইল এবং সূচিব্যূহের পথ সাফ করিয়া সীতারামকে লইয়া বৈরীশূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইল।

বিমলাও শৃঙ্খলাবদ্ধ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত স্বামী বীরেন্দ্রসিংহকে বলেন—

"আমরাও তোমার পশ্চাৎ আসিব, কিন্তু আগে এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ করিব।"

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপবৎ বীরেন্দ্রের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল, কহিলেন—

"পারিবে ?"

বিমলা দক্ষিণহস্তে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন,

"এই হস্তে ! এই হস্তের স্বর্ণত্যাগ করিলাম; আর কাজ কি !" বলিয়া কঙ্কণাদি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,

"শাণিত লৌহ ভিন্ন এ হস্তে অলঙ্কার আর ধরিব না।"

বীরেন্দ্র হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "তুমি পারিবে, জগদীশ্বর তোমার মনস্কামনা সফল করুন।"

জহ্লাদ ডাকিয়া কহিল "আর বিলম্ব করিতে পারি না।"

বীরেন্দ্র বিমলাকে কহিলেন 'আর কি ? তুমি এখন যাও।'

বিমলা কহিলেন "না; আমার সম্মুখেই আমার বৈধব্য ঘটুক। তোমার রুধিরে মনের সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিব।" বিমলার স্বর ভয়ঙ্কর স্থির।

বিমলা প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মানা রহিলেন। মস্তকের একটী কেশ বাতাসে দুলিতেছে না। একবিন্দু অশ্রু পড়িতেছে না। চক্ষুর পলক নাই, একদৃষ্টে ছিন্নশির প্রতি চাহিয়া আছেন।

বলাবাহুল্য, বিমলা তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল।

শৈবলিনীও সাহসী, দৃপ্তা, বীরহৃদয়া। সন্ধ্যাকালে ভীমা-পুষ্করিণীতে 'বাঁদর' প্রভৃতি কতগুলি দেশী গালি বর্ষণে লরেন্স ফষ্টরকে বিতাড়িত করিলেও শৈবলিনীকে দেখিয়াছি আবার লরেন্স ফষ্টর

কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াও সর্ব্বদা জাতিমানের জন্য তীক্ষ্ণধার ছুরিকা কাছে কাছে রাখিত। এই কথা শৈবালিনীর কথায়ই বলিব —

"এই ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরেজও বশ হইয়াছিল—সে বুঝিয়াছিল যে, সে আমার কামরায় প্রবেশ করিলে এই ছুরিতে হয় সে মরিবে, নয় আমি মরিব। দুরন্ত ইংরেজ ইহার ভয়ে বশ হইয়াছিল আর আমার এ দুরন্ত হৃদয় ইহার ভয়ে বশ হইল না।" তারপরে কি কৌশলে বন্দী প্রতাপ ও নিজের পলায়নের আয়োজন করিয়াছিল, অগাধজলে সাঁতরাইয়া চলিয়াছিল, তাহাতে মনে হয় ঘটনাস্রোতে হয়তো তাহাকেও দুঃশীল শত্রুর নিকট শান্তি অপেক্ষা কম বীরহৃদয়া দেখিতাম না। তবে শান্তির হৃদয় সম্পূর্ণ জিত, অনুশীলিত আর শৈবলিনী চিত্তবৃত্তির দমন করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহাহউক সেই আলোচনা বর্ত্তমান বিষয়ের অন্তর্গত নয়।

বঙ্কিমের প্রকৃতি-প্রবৃত্তি বুঝিতে অনভিজ্ঞ সমালোচক বঙ্কিমরচিত চরিত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া যে তাহার প্রতি অবিচার করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই দেখিতে পাই, বাবু তারক বিশ্বাস মহাশয় অন্যায় ভাবে Dacca Reviewতে (১৯১৬ নভেম্বর ডিসেম্বর ১৯১৭ জুন) লিখিয়াছেন··

"বজ্‌রা তখনকার দিনে সাহেবেরাই ব্যবহার করিতেন, আজ-কালকার মত ছড়াছড়ি ছিল না। বজ্‌রা দেখিলেই মনে হইত ইহাতে সাহেব আছে, সুতরাং বজ্‌রা কোন ঘাটে ভিড়াইলে কত কূল মহিলাকে ঘড়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইতে দেখিয়াছি। আবার সেই সকল ঘড়া সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে চাকর দ্বারা পাঠাইয়া দিতে হইত। লাঞ্ছনা এত ছিল! বঙ্কিমবাবুর ঘটনা তাহার অর্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বের বলিলেও তখন সাহেবের গালে চড়মারা বা স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহার গলায় শিকলি বাঁধিয়া বাঁদর নাচাইবার বাসনা কতদূর সাহসের

কথা তাহা উল্লেখ অপেক্ষা অনুমান করাই সঙ্গত। এসব মেয়েগুলো গেল কোথায় ?”

তারকবাবু সরকারী চাকুরে এবং নিজেও ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমও ছিলেন তাহাই। তথাপি একজন লেখক যে অন্যেরই অনুরূপ হইবে, তাহা সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনোবৃত্তি অনুযায়ী লিখিয়া থাকেন। আজন্ম স্বাধীনচিত্ত বঙ্কিমই গিরিজায়াকে দিয়া বেত্রাঘাতোদ্যত হেমচন্দ্রকে তিরস্কৃত করিতে যোগ্য অধিকারী, অন্যে নহে। নতুবা সাধারণ লেখক কি লিখিতে পারেন ?

“বীরপুরুষ বটে ! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ ? কিছু প্রয়োজন ছিল না —এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বইতে, আর গরীব দুঃখীব মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।”

আমাদের বিশ্বাস, আজ জাতীয়তা-গুণবিশিষ্ট বঙ্গবাসী নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, যে-টমাস সাহেব শান্তিকে উপপত্নী করিবার প্রস্তাব করিয়াছে, যে-এড্ওয়ার্ড্স্ ভারতীয় মহিলাকে “গদী পর্ লে যায়েগা” বলিয়া গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য গোয়েন্দা নিয়োগ করিতে চাহিয়া অর্থের প্রলোভন দেখাইতে সঙ্কুচিত হয় নাই, অথবা যে-লরেন্স ফষ্টর অসদভিপ্রায়ে শৈবলিনীকে ডাকাতি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের কি ঔষধ হওয়া উচিত, বঙ্কিম সেই যুগে পরোক্ষে শান্তি ও শৈবলিনী চরিত্রে তাহাই দেখাইয়াছেন। আর একমাত্র বঙ্কিমই তাহা দেখাইবার যোগ্য অধিকারী। পাঠক এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনচিত্ততার অনেক পরিচয় পাইবেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বঙ্কিম বৈদিককালের একটী স্ত্রী চরিত্র আঁকিতে চাহিযাছিলেন। খাতাও বাঁধা হইয়াছিল। কিন্তু দুরন্ত কাল তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়াছে।

ব্রাহ্মণ চরিত্র

বঙ্কিমের জন্মভূমি কাঁটালপাড়ার ঠিক দক্ষিণের গ্রাম ভাটপাড়া। এই গ্রাম বিশিষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বাসভূমি। বঙ্কিমের সময় পরমপূজ্য হলধর তর্কচূড়ামণি, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, তারাচরণ বিদ্যারত্ন, চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীরাম শিরোমণি, রামশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণের শাস্ত্রালোচনা, বিদ্যাবত্তা ও আচার নিষ্ঠায় ভাটপাড়ার গৌরব তখন সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হইয়াছিল। তৎকালে ভাটপাড়া, বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের পণ্ডিতগণের মাহাত্ম্য সর্ব্বজনবিদিত ছিল। কাঁটালপাড়া ও নৈহাটীতেও অনেক বিদ্বান ব্যক্তি বাস করিতেন। নারায়ণপুর ও মাদ্রালেও অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল; হালিসহরেও ছিল। এই সমস্ত স্থানে রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণরাই অধিক বাস করিতেন। ভাটপাড়ায় কেবল বৈদিকগণই বেশী থাকিতেন। বংশের প্রথানুসারে বঙ্কিম নিজেও বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজনকে মন্ত্র দিয়াছিলেন। মন্ত্র দিয়া নাকি বঙ্কিমচন্দ্র শিষ্যকে বলিতেন "সর্ব্বদা মনে রাখিও, তুমি ব্রাহ্মণ"—

সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ স্বাভাবিক। এই জন্যই তাঁহার প্রায় প্রধান চরিত্রই ব্রাহ্মণ।

অভিরাম স্বামী, অধিকারী, নবকুমার, পশুপতি, মাধবাচার্য্য, চন্দ্রশেখর, সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ব্রজেশ্বর, চন্দ্রচূড়, অনন্তশাস্ত্রী প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মণ।

"দুর্গেশনন্দিনীর" অভিরামস্বামীই বঙ্কিমের রচিত প্রথম ব্রাহ্মণ। বিদ্যাবলে ও বুদ্ধির প্রভাবে তিনি মানসিংহের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, আর গড়মান্দারণের বীরেন্দ্রসিংহও তাঁহারই শিষ্য; কিন্তু

আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার কার্য্য অনেকটা কন্যা-দৌহিত্রীর হিতার্থেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে—পরের অথবা জাতির হিতার্থে নহে।

অভিরাম স্বামী পূর্ব্বে ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট ছিলেন, তথাপি পরে তিনি বিদ্যা ও বুদ্ধিবলে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম হয়তো মনে করিয়াছিলেন, ব্যভিচারদোষে পূর্ব্বে দুষ্ট হইলেও পরে ভ্রম সংশোধন করিয়া রাজ্য বা জাতির প্রভুত্ব করা অভিরামের পক্ষে অসম্ভব নয়। সেইরূপ উদ্দেশ্য হয়তো অপ্রসংশনীয় নয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চিত্রাঙ্কণ খুব সুখকর হয় নাই। প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রদ্ধাস্পদ গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী (যিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরও স্নেহার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন), বলেন "আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয় যেন সেই সময়ে ব্যভিচার দোষটার উপরে তাদৃশ ঘৃণা ছিলনা। তিনি যেন মনে করিতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মূলশক্তি ধর্ম্মে নহে—বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে। তাই আমরা ব্যভিচারী অভিরাম স্বামীকে অমন বলবান দেখিলাম। তবে অবশ্য একথা বলা যাইতে পারে যে, কবি তাঁহাকে যুগপৎ ব্যাভিচারী এবং ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত করিয়া দেখান নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, ব্যভিচার তাঁর পূর্ব্ব জীবনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তা হউক, তবু যেন আমাদিগের অবিশ্বাসী বুদ্ধিতে এই মনে হয় যে, অভিরাম স্বামীর চিত্রে ব্যভিচার দোষটা চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় স্থাপিত হইয়াছে।"

বঙ্কিমের পরবর্ত্তী চরিত্রাবলীতে ব্রাহ্মণের শুচিতা পরিপূর্ণরূপেই রক্ষিত হইয়াছে।

অভিরাম স্বামীই ক্রমে মাধবাচার্য্যে পরিণত হইয়াছেন। পারিবারিক স্নেহে আর তাঁহার কার্য্য নিবদ্ধ নহে, তিনি সর্ব্বতোভাবেই দেশকে আক্রমণকারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন।

তারপর চন্দ্রশেখর চরিত্র।—

চন্দ্রশেখর বিদ্বান, জ্ঞানী ও ক্ষমাশীল। শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল সমুদ্রতুল্য অতলস্পর্শ। পাণ্ডিত্যে তিনি নবাব মিরকাশিমেরও ভক্তিভাজন। বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, আর ক্ষমায় তিনি বশিষ্ঠের ন্যায় দেবতা। যে ফষ্টর শৈবালিনীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল তাঁহার সম্বন্ধেও প্রতাপকে বলিতেছেন—

"ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে, যে উত্তম সে শত্রুকে ক্ষমা করে।"

কিন্তু যে হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ জ্ঞানপিপাসু ক্ষমাশীল চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সুন্দর মুখপদ্ম ও নবযৌবন দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেই ঘটক হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন এবং বিবাহ করিয়া তাহার প্রণয়াকাঙ্খার নিবৃত্তির কোন যত্নই করেন নাই, তাহাতেই মূলতঃ চন্দ্রশেখরের ট্র্যাজেডি। ব্রাহ্মণের এই 'আত্মসুখপরায়ণতার' পক্ষপাতী বঙ্কিম নহেন।

তারপরের চরিত্র সত্যানন্দ। ইহার ন্যায় স্বদেশ প্রেমিক, তত্ত্বজ্ঞ, ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিরল; দেশপ্রীতি ও জিতেন্দ্রিয়তা-গুণে তিনি আদর্শ পুরুষ। কিন্তু তিনি যে উপায়ে স্বদেশের উদ্ধার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, বঙ্কিমের তাহা মনঃপূত হয় নাই। তাঁহার মতে "পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না।"

ভবানীপাঠকও জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয় এবং দল-গঠনে সর্ব্বগুণের অধিকারী। কিন্তু তাঁহার কার্য্যও আদর্শ নারী প্রফুল্লের বিশেষ মনঃপূত হয় নাই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

"তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ন; ঠেঙ্গা-লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর

করিবেন। তুমি আমি কে? শিষ্টের ভার লইও, কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও। এই সব কথাগুলি আমার পক্ষ হইয়া ভবানীঠাকুরকে বলিও।”

তারপরের ব্রাহ্মণ চন্দ্রচূড়,—হিন্দুরাজ্য স্থাপনে সীতারামের প্রধান সহায় ও শিক্ষাদাতা গুরু। মাধবাচার্য্যের মতই স্বদেশপ্রিয় কিন্তু সংসারী। ভয়ানক কৌশলী। বঙ্কিম বলিতেছেন, “সীতারামের এক গুরুদেব ছিলেন। তিনি ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক গোছ মানুষ। তসর নামাবলী পরা, মাথাটী যত্নপূর্ব্বক কেশশূন্য করিয়াছেন। অবশিষ্ট আছে—কেবল এক “রেফ্”। কেশ অভাবে চন্দনের যথেষ্ট ঘটা, খুব লম্বা ফোঁটা, আর আর বামুনগিরির সমান সব আছে। তিনি সীতারামের নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্খী।······আজিকার দিনেও আমরা এমন দুই একজন অধ্যাপক দেখিয়াছি, যে টোলে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়াইতে যেমন পটু, অশিক্ষিত তালুকে দাঙ্গা করিতেও তেমনি মজবুত।” রাজ্যের অনাচার দমনের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই চন্দ্রচূড় তীর্থযাত্রা করিলেন, ইহজীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না।

এই সব চরিত্রই যে ভাটপাড়া কাঁঠালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইতঃস্তঃ ঘুরিতেছিলেন, আর বঙ্কিমের উপন্যাসে বিরাটভাবে তাঁহারা অধিষ্ঠান করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিম নিজে বলিয়াছেন, “হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য; তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষের সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞান-বেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্য প্রণেতা, তাঁহারাই কবি। তাই হিন্দুধর্ম্মের অনন্তজ্ঞানী উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক কোন জাতিই নহে।"

তাই বলিয়া বঙ্কিম সকল ব্রাহ্মণকেই সমান শ্রদ্ধা দেখাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেন—

"যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এইটুকু না বুঝাই ভারতবর্ষের অবনতির একটী গুরুতর কারণ। সে গুণ যখন গেল তখন আর কেন ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে গেলাম? শাস্ত্রেও আছে জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।* ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ,—জাতিতে নহে।—

ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থঃ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।

গৌতম সংহিতা ২১ অধ্যায়

উদাহরণস্বরূপ 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

শিষ্য—বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য, ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু—কেন করিব না? ঐ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠগুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণেরই ভক্তির যোগ্য পাত্র।

'ধর্ম্মতত্ত্বের' এখনকার মুদ্রিত সংস্করণে এই কথাটী নাই। "নবজীবন" ও বঙ্কিমের জীবদ্দশায় যে সংস্করণ ছিল, তাহাতে ছিল। স্বর্গীয় চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "অধুনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত

*অনুশীলন ১০ম অধ্যায় 'মনুষ্যে ভক্তি।'

'ধর্ম্মতত্ত্বে' কেশবসেনের নামটী উঠাইয়া দিয়া তাঁহার ভক্তেরা হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়াছেন। হায়রে দেশ!"

'নারায়ণ', বৈশাখ ১৩২২

নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রও বঙ্কিমের এই মত পোষণ করিতেন। 'তপোবলে' তিনি বলিয়াছেন—"আত্মা সকলেরই সমান, যে তপস্যায় আত্মদর্শন করে, সেই-ই ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-প্রভেদ কার্য্যে; নচেৎ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে হু'গাছা সূতো গলায় দিয়ে 'ব্রাহ্মণ' 'ব্রাহ্মণ' ক'রলেই কি ব্রাহ্মণ হয়?

হইলে আবার ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ—চণ্ডাল
সদাচারী শবর—ব্রাহ্মণ। তপোবল, ২য় ভাগ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ও এই সমস্ত চরিত্র আলোচনা করিয়া গত ২৭।৬।৩৯ তারিখে বর্ত্তমান গ্রন্থকারকে বলিয়াছেন ঃ—

"চন্দ্রচূড়ের চরিত্র খাঁটি বাঙ্গলার আধ্যাত্মিক নেতার চরিত্র বলিতে পারা যায়। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার যেমন দূরদৃষ্টি, ও সামাজিক জাবনে তাঁহার অসাধারণ দৃষ্টি যেমনভাবে ফুটান উচিত বঙ্কিমচন্দ্র তাহা সেই ভাবে ফুটাইয়া বাঙ্গলার এখনও নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহার দিকে যেরূপ দৃষ্টিপাত করা উচিত এখনও তাহা করিতে পারিতেছেন না,—ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয় এবং বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক।"

উক্ত পণ্ডিত মহাশয় নানাবিধ স্ত্রী চরিত্র এবং ব্রাহ্মণ চরিত্র আলোচনায় যেরূপ সূক্ষ্ম সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা খুবই অদ্ভুত এবং বঙ্কিমের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবশতঃ ও গ্রন্থকারের প্রতি অগাধ স্নেহ বশতঃ অসুস্থ শরীরেও লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা সময়ান্তরে সেই সমস্ত চরিত্রের আলোচনা করিব।

ইয়ংবেঙ্গল ও বঙ্কিম

তখন 'ইয়ং বেঙ্গলের' খুব প্রভাব। তাহারাই সমাজের গণ্যমান্য ও বিদ্বান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার তাঁহারাই ছিলেন প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে মিল, বেনথান প্রভৃতি পণ্ডিতের প্রভাবে অনেকেই জড়বাদী হইয়াছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রভাবও বহুদিন যুবক সম্প্রদায়ের উপর কাজ করিয়াছিল। মিশনারীদের প্রভাবে কেহ কেহ ক্রিষ্টান হন। আবার কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মও অবলম্বন করেন হিন্দু ধর্ম্মে তাহাদের কাহারও বড় আস্থা ছিলনা। বরং ডিরোজিওর শিষ্যগণ সদম্ভে বলিতেন "If there is any thing that we hate from the bottom of the heart, it is Hinduism. যদি হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ঘৃণা করিবার জিনিষ কিছু থাকে, তাহা হিন্দুধর্ম্ম।"

কলিকাতার সংস্পর্শে আসিয়া বঙ্কিমও এই স্বধর্ম্মবিচ্যুতির দোষ হইতে অব্যাহতি পান নাই। তিনি উত্তরকালে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—

"আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন······আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্ম্মে আমার মতিগতি আশ্চর্য্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল, জানিলে লোকে আশ্চর্য্য হইবে।"

এখন কিরূপ সংগ্রামে বঙ্কিমের নাস্তিকতার ভাব অপসারিত হয়, তাহা যথাসম্ভব আমরা 'ধর্ম্মজীবন' প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। কিন্তু আস্তিক পরিবারের সন্তানের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের এইরূপ হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষ বড়ই আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নাই।

তবে শীঘ্রই বঙ্কিমের মতের পরিবর্ত্তন হয়। ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে আমরা 'ইয়ংবেঙ্গল' নেতা মধুসূদনেরই "একেই কি বলে সভ্যতা" পাই।

তদুত্তরে মধুসূদনকে উপলক্ষ করিয়া দীনবন্ধুরচিত 'নিমদত্তের' যথার্থ পরিচয় পাই, কিন্তু বঙ্কিম ইহার প্রভাব হইতে শীঘ্র শীঘ্র আপনাকে সামলাইয়া লন।

তবে ঋষি কোঁতের প্রভাব বঙ্কিমের উপর বরাবর ছিল, এবং সাঙ্খ্য-দর্শনের সহিত Positivism এর সাদৃশ্য দেখেন বলিয়াই তিনি কোঁতকে কপিলের মহামুনি করিয়া তাঁহার মতগুলি এমনিভাবে হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত করিয়া লন যে, অতঃপর তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' কোঁতের প্রভাব মুক্ত না হইয়াও হিন্দুর পক্ষে এক অদ্ভুত তত্ত্বমূলক, অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এবং তদানীন্তন ইয়ং বেঙ্গলের পক্ষে ছিল উহা মহৌষধ। তিনি তাঁহার প্রকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ "অনুশীলনে"ও কোঁতের তত্ত্ব হিন্দু দর্শনের সহিত সামঞ্জস্য এবং প্রাচ্যের সহিত প্রতীচির মিলন ঘটাইয়াছেন।

যে-ব্রাহ্মণত্ব প্রভাব সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারও পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছে কোঁতের প্রভাবে। বঙ্কিমের নেতৃত্ব, পরামর্শ ও সহযোগিতায় সম্পাদিত 'নবজীবন' মাসিক পত্রিকার সূচনায়ও ইহাই আছে :—

"ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক ; ব্রাহ্মণ উঠিলে সকলের উদ্ধার সহজ হইবে। এই বিষয়ে অগষ্ট কোঁতের মত অতি বিচিত্র। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে ভারতের পুনরুত্থান হইবে, তবে তজ্জন্য বিষয়-বাসনা এবং ঐহিক প্রভুত্ব-লালসা পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।"

Positivism will deliver it (the theocratic caste i. e. the Brahmins) from the oppression of the temporal power, to which it has been subjected for twenty centuries, an oppression which it bows to, more and

more without ever losing its consciousness of its spiritual superiority and the hope of seeing it definitely re-established. Such a restoration, it is true, demands its complete renunciation of command and even of property but the systemetic guardians of human order will not be slow to accept conditions in the name of their social mission and of their individual dignity. "Positive Policy" Vol IV p. 447. কোঁত, কার্ল মার্কস প্রভৃতির প্রভাব আবার এতই অধিক ছিল যে, বাঙ্গলার কৃষকের অবস্থার আলোচনায় সেই প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয়। কিন্তু ইহাও তিনি নিজ সংস্কার ও শিক্ষার অনুবর্ত্তী করিয়া রচনা করিয়াছেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

"সাম্যনীতি নূতন তত্ত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যে ভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি, সেরূপ লিখিয়াছি। অতএব নীতিশাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে কেহ রাগ করিবেন না।"

এই কোঁতের কথা তিনি "রজনী" উপন্যাসেও লিখিয়াছেন। শচীন্দ্র বলিতেছে "অমরনাথ প্রাচীন ইতিবৃত্তলেখকদের মত লইয়া কোম্‌তের ত্রৈকালিক উন্নতিসম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্‌ৎ হইতে তাহার সমালোচনে মিল ও হক্‌সলির কথা আসিল। হক্‌সলি হইতে ওয়েস্‌ ও ডারুইন, ডারুইন হইতে বুকনেয়র, সোপেনহায়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল।"

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য-সংঘর্ষে স্ত্রী চরিত্রগুলিও কিরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে—যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

কলিকাতায় দুইবৎসর

বঙ্কিম ১৮৫৬ জুন হইতে ১৮৫৮ আগষ্ট, এই দুই বৎসরকাল কলিকাতায় ছিলেন। কলিকাতা তখন কেবল সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনায়ই ভয়-কম্পিত ছিল না—নানাবিধ সামাজিক, ধর্ম্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধীয়, এবং সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনেও বিকম্পিত হইতেছিল। তখন সাহিত্যের গুরু ঈশ্বরগুপ্ত, নীলকরের অত্যাচার পরিস্ফুট করিতেন হরিশ মুখোপাধ্যায়, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলনের নেতা দয়ার সাগর প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজনৈতিক নেতা বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ।

রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রভাবে পুষ্ট,—ডিরোজিও বৃক্ষের উৎকৃষ্ট ফল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে স্বাধীন চিন্তার স্রোত ডিরোজিও প্রবাহিত করেন, তাহার ফলে যুবকগণ উশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরাপানদোষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপরে যে সময় মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি হিন্দু কলেজে পড়িতেন, কলেজের ছাত্রগণ গোলদিঘীর মধ্যে প্রকাশ্যস্থানে বসিয়া মাধব দত্তের বাজারের নিকটস্থ মুসলমান দোকান হইতে কাবাব মাংস কিনিয়া আনিয়া দশজনে মিলিয়া আহার করিত ও সুরাপান করিত। যে যত অসমসাহসিকতা দেখাইতে পারিত, তাহার তত বাহাদুরি হইত; সেই তত সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইত।* যে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দুপেট্রিয়টে' সপ্তাহের পর সপ্তাহে তেজস্বিতাপূর্ণ নির্ভীকোক্তি করিয়া নীলকরগণের অত্যাচার প্রশমনে সমর্থ হন, তিনিও রামগোপাল ঘোষ, ও অন্যান্য বন্ধুগণের প্ররোচনায় সুরাপানে

* শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালিন বঙ্গসমাজ' ১৮০

লিপ্ত হইয়া অকালে অমূল্যজীবন বিসর্জ্জন দেন। মদ্যপান তখন সংক্রামক ছিল। মধুসূদনও সুরাপান করিয়াই শীঘ্র শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। দীনবন্ধু, হেমচন্দ্রও মদ্য পান করিতেন।

বঙ্কিমও সুরাপান করিতেন। যদিচ অত্যধিক পানদোষের প্রমাণ নাই, তথাপি বঙ্কিমের সুরাপান অসমর্থনীয়। জাষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহরমপুরে বঙ্কিম বাবুকে একদিন বলিয়াছিলেন—"মহাশয়, কলেজের ছাত্রদের সুরাপান দোষের কথা বুঝাইবার সময় তাহারা উত্তর করে—'সুরাপানে যদি দোষই থাকিবে, তবে বঙ্কিমবাবুর ন্যায় এত বড় লোক উহা ছাড়িয়া দেন না কেন?"

বঙ্কিমবাবু এই কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হয়েন। ইহার পরেই তিনি দুই একবার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই! মৃত্যুর ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে খুব সংযমী ছিলেন; হবিষ্যান্নও খাইতেন। এ বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন—"অন্যায় কাজের মধ্যে মদ খাই, কিন্তু ইহা বলিতে পারি, সে জন্য কখনও কোন দুর্নীতির কাজ করি নাই। খাইতে বসিলে একটু অপব্যবহার না হয় এমন নহে।"

প্রশ্ন—মদে আপনার শারীরিক কোনও অসুখ হয় না?

উঃ—না, বরং মদ ধরিয়া শরীর ভাল আছে। সে যেমনই হৌক, আমাদের মত লোকের নিকট হইতে এটা বড় কুদৃষ্টান্তের কাজ করে।

এই সময়ে বাঙ্গালা কাগজ ছিল 'প্রভাকর', 'ভাস্কর',-'সোম প্রকাশ' (১৮৫৮), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'রহস্য সন্দর্ভ মাসিক পত্রিকা' আর ইংরাজী ছিল হরিশ্চন্দ্রের Hindu Patriot, রামগোপাল ঘোষের Bengal Spectator, কাশীপ্রসাদের Hindu Intelligencer আর কিশোরী চাঁদ মিত্রের Indian Field. কিন্তু রাজনৈতিক গগনে রামগোপাল

ঘোষ ছিলেন প্রদীপ্ত ভাস্কর। বাঙ্গালায় প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হয় Black Acts উপলক্ষে। কলিকাতায় তখন প্রধান ফৌজদারী আদালত ছিল Supreme Court. মফঃসলের ইংরাজ ইহারই দোহাই দিয়া দরিদ্র প্রজার উপরে অবাধে অত্যাচার করিত। ইহাতে নীলকরের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। এই অত্যাচার দমনকল্পেই বীটন সাহেব কর্ত্তৃক Black Actsএর সূচনা ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা (১৮৫১)।

১৮৫৭ সালে আবার এই আন্দোলন পুনরুদ্দীপিত হয়। এবার বিলটী আনেন স্যার বার্ণেস পিকক্ (পরে হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি), এই বিলের ফল ব্যর্থ করিতে যেমন ইংরাজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়, সাফল্য আনিতে আবার বাঙ্গালীর মধ্যেও দলবদ্ধতা আসে। ১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসে টাউনহলে এক সভা করিয়া ১৮০০ লোকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি আবেদন বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টারের কাছে পাঠান হয়। এই রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতাই ছিলেন রামগোপাল ঘোষ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

কিন্তু এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নানাবিধ সামাজিক আন্দোলনে বাঙ্গালীর মন আলোড়িত করিয়াছিলেন। কি শিক্ষার প্রসারে, কি স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্ত্তনে, কি বহুবিবাহ-প্রথার দমনকল্পে এবং কি বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তনে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন প্রধান সংস্কারক। এই ১৮৫৬ সালে তিনি কেবল বিধবা বিবাহের প্রতিপক্ষগণের আপত্তি খণ্ডন করিবার প্রয়াসে শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধৃত করিয়া নানাবিধ পুস্তকই প্রণয়ন করেন নাই, পরন্তু কয়েকটী বিধবা বিবাহেরও আয়োজন করেন। বাঙ্গলার ভাগ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কার বঙ্কিমচন্দ্রের কখনও মনঃপূত হয় নাই। তিনি উভয় সংস্কারের বিরুদ্ধেই লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। বিধবা কুন্দনন্দিনীর বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্কিম ইহার সুফল দেখান নাই। অন্যত্র সূর্য্যমুখীর মুখ দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি কটাক্ষও করিয়াছেন :—

"আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"*

বঙ্কিম নগেন্দ্রের মুখে আবার আরোপ করিয়াছেন অন্যরূপ। নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন :—(২৫ পরিচ্ছেদ)

"যদি কেহ বলে যে, বিধবা বিবাহ হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্র-বিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে?"

* তারক বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন, বর্দ্ধমানে নাকি তাঁহার পিতা দিগম্বর বিশ্বাসের বাসায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে রাঁধিয়া কয়েকজনকে খাওয়াইয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু নাকি বলেন "এমন সুস্বাদু অমৃত কখন খাই নাই।" সঞ্জীববাবু সহাস্যে বলেন, "হবে না কেন? রান্নাটা কার জানত? বিদ্যাসাগরের।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তেমনি হাসির সহিত উত্তর দিয়া বলিলেন—"না হে না, বঙ্কিমের সূর্য্যমুখী আমার মত মূর্খ দেখেনি।" বঙ্কিমবাবু কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু একটা হাসির তুফান উঠিয়াছিল।

এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। কারণ যথাস্থানে বলিব।

বঙ্কিমের উপন্যাসে বহু বিবাহের আধিক্য দেখা যায়। নবকুমারের পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল, তিন স্ত্রীর প্রতিই (প্রফুল্ল, সাগর, নয়ানতারা) ব্রজেশ্বরের ব্যবহার নিরপেক্ষ ছিল, আর সীতারামও তিন স্ত্রীকেই ভাল বাসিতেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই সব সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

বঙ্কিম যখন কলিকাতা আসিয়া ভর্ত্তি হন, কেশবচন্দ্র সেন তখন হিন্দু কলেজ ছাড়িয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে খুব ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। এই ধর্ম্মভাব ও কর্ম্মোৎসাহ বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠে ১৮৫৭ সালে। তখন হইতেই তিনি ভাল বক্তৃতা দিতে পারিতেন এবং ভাবী বাগ্মিতার সব নিদর্শনই প্রকাশ পাইতে থাকে। ১৮৫৮ সালে ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

স্বর্গীয় কালীনাথ দত্ত মহাশয় বলেন "কেশবচন্দ্রকে বঙ্কিমবাবু একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি মনে করিতেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" বাহির হইবার পূর্ব্বেই কেশব বাবুর খ্যাতি দেশে খুব ছড়াইয়া পড়ে। তখনই একদিন দেখা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "I wish to know how far you have outgone me."

কথাটা সে সময়ে গর্ব্বের ন্যায় মনে হইলেও আজ এই কথায় সকলে বিস্মিত না হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মবোধশক্তিরই প্রশংসা করিবে।

কেশববাবুর উপরে উক্ত ধারণা থাকিলেও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া মনে হয় না। বঙ্কিম বলিতেন "কালীনাথ, তুমি কখনও মনে স্থান দিও না, ও দল আর কখনও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। উহার যে অবসাদ-দশা এখন উপস্থিত হইয়াছে,

সে দশার আর কখনও প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।''

আমরা পরে দেখিব, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে বহু বাদবিসম্বাদ হয়। সেগুলি আমরা যথাসময়ে পাঠককে উপহার দিব।

১৮৫৪ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" রচিত হয় এবং ১৮৫৬ সালে উহার অভিনয় হয়। এই সময়ে বেলগাছিয়া থিয়েটারে "রত্নাবলী" অভিনীত হয় এবং মধুসূদন ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দেন। ১৮৫৯ সালে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক অভিনীত হয়, এবং ১৮৬০ সালে 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' অমিত্রাক্ষরছন্দে রচিত হয়। কাব্যজগতে একেবারে নূতন বন্যা প্রবাহিত হইল,—বঙ্কিম দূর হইতে নিজের লক্ষ্য স্থির করিলেন।

এই ১৮৬০ সালেই দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বাহির হইল। বঙ্কিমের প্রতিভা কিছু করিবার আগ্রহে সচকিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার লেখনী 'নীলকরদের' সম্বন্ধে একটা কথাও লিখিল না। প্রসাদপুরের নীলকুঠী পর্য্যন্ত স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। লরেন্স ফষ্টরের পুরন্দরপুরের কুঠীও রেসমের কুঠী বলিয়াই বঙ্কিম পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন কলিকাতায় পড়েন, তখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার আরম্ভ হইয়াছে। আর ইহার প্রবর্ত্তক ছিলেন প্রসিদ্ধ বেথুন সাহেব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ১৮৪৯ সালে বেথুন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ক্রমে অনেক বিদ্যালয় গড়িয়া উঠে। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ও এই বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। এই স্ত্রী-শিক্ষার সুফল, কুফল দুইটীই বঙ্কিম লক্ষ্য করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

পঞ্চম অধ্যায়—সাহিত্য জীবন ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

// বাঙ্গলা সাহিত্য প্রথম পদ্যেই পরিস্ফুট হয়। জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় রচিত বটে, কিন্তু তাঁহার ছন্দ ও রচনা ভঙ্গিই বাংলার বৈষ্ণব কবিগণকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। অতঃপরে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি বাঙ্গলার কবি বলিয়াই পরিগণিত; ভাষাও তাঁহার অনেকটা বাঙ্গলারই অনুরূপ।

চণ্ডীদাসই প্রকৃতপক্ষে প্রথম খাঁটি বাঙ্গলার কবি। তাঁহার আবির্ভাব হয় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে। কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী হৃদয় আবিষ্ট করেন কৃত্তিবাস। শাক্ত, বৈষ্ণব এমন বাড়ী নাই যেখানে ষাটবৎসর পূর্ব্বেও তাঁহার রামায়ণ পঠিত হইত না। কিছুদিন পূর্ব্বেও (বোধ হয় এখনও) দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা রামায়ণের উপাখ্যান যে বলিতে পারে, তাহা কৃত্তিবাসের অপূর্ব্ব সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রভাবেই। অনুমান ১৪২০ খৃঃ তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসই বাঙ্গলার আদি কবি।

পরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে সাহিত্য—প্রধাণতঃ বৈষ্ণব সাহিত্য—গড়িয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,' বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' প্রভৃতি এই যুগের প্রধান গ্রন্থ। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন।

কবিগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (মৃত্যু শয্যায়)

এই সমস্ত কবিগণ এবং বিখ্যাত মহাভারতকার কাশীরাম দাস 'চণ্ডী' প্রণেতা কবি কঙ্কণ, রামেশ্বর ('শিবায়ন'), 'ধর্ম্মমঙ্গলের' ঘনরাম, 'মনসার ভাসান' রচয়িতা ক্ষেমানন্দ ও কবিকঙ্কণ রামপ্রসাদ সেন মধ্যযুগের কবি।

ভারতচন্দ্র সেই যুগপ্রবর্ত্তনকারী পলাশীযুগের রাজকবি। তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অনেকেই এখনও বলেন—

"কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ"

নিধু বাবু, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহারই সমসাময়িক ছিলেন। দাশরথি রায় তাঁহাদের পরবর্ত্তী।

তারপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইনি ছিলেন ইংরাজ কবি কাউপারের ন্যায় নূতন ও পুরাতনের যোগসূত্র। যেমন ইংলণ্ডের Critical কবি Dryden, Pope, Butler প্রভৃতি একদিকের, এবং Romantic কবি Wordsworth, Southey, Coleridge, Shelly, Keats, Byron প্রভৃতি অন্যদিকের, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন কাউপার, সেইরূপ একদিকে ভারতচন্দ্র ও অন্যান্য কবিগণ, অন্যদিকে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন প্রভৃতির যোগসূত্রধারী ছিলেন কবি ঈশ্বরগুপ্ত।

ভারতচন্দ্র ছিলেন আদিরসে প্রধান, কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন হাস্যরসে অদ্বিতীয়। তবে সেই হাসি যে কষাঘাতে বাঙ্গলার কত জঞ্জাল দূর করিয়া উহার সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়াছে, তাহা শতবার স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার কবিতাই ছিল বাঙ্গলার জীবন্ত সাহিত্য, আর দেশশুদ্ধ লোক তাঁহার কবিতার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত।

সাহিত্য জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সর্ব্বাপেক্ষা কবি ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাবই বেশী ছিল। গুপ্ত কবিই ছিলেন তখন সাহিত্যগুরু। তিনি বাঙ্গলার প্রাণের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তখন সর্ব্বজনপ্রিয় কবি ছিলেন।

সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয় সরকার মহাশয় তদানীন্তন সাহিত্যের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন —

"তখন বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তখন কবিতার চর্চ্চার নামই ছিল সাহিত্যচর্চ্চা। পূর্ব্ব হইতেই কাব্যগ্রন্থ পাঠ আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চার সীমা ছিল। কেবল পাঠশালা বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত; বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদী মুদীখানার পাটে বসিয়া, মোসাহেব মুখুয্যে মহাশয় বড়মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে কৃত্তিবাস কাশীদাস পাঠ করিতেন। গোস্বামী ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরের দাওয়ায়, বাবাজীঠাকুর আখড়ার আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, বৈষ্ণব গৃহস্বামী পূজার দালানের দরদালানে, সেইরূপ শ্রোতৃমণ্ডলীমধ্যে 'চৈতন্য চরিতামৃত' পাঠ করিতেন। তদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামেশ্বরের শিবায়ন ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী প্রভৃতি গীতও পঠিত হইত। বহুকাল এইরূপ চলিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত আসিয়া কাব্যসাহিত্যে একরূপ নূতন ভাব আনিলেন।

"তাঁহার কর্ত্তৃক বঙ্গসাহিত্যে ঢল নামিল, স্রোত চলিতে লাগিল, একটা জীবন্ত ভাব আসিল। কেবল পৌরাণিক প্রসঙ্গের নাড়াচাড়া করিয়া সাহিত্য এখন আর সন্তুষ্ট নহে। যখন সমাজে যে বিধানের আন্দোলন হয়, গুপ্ত কবি তখন সেই বিষয়েই কবিতা লেখেন; সমাজে সাহিত্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহারই প্রমাণ দেন।"

উনিশ বৎসর বয়সে গুপ্তকবি সাপ্তাহিক 'প্রভাকর' পত্রিকা বাহির করেন (১৮৩০)। নানারূপ উত্থানপতনের পরে ১৮৩৯ সালে উহা দৈনিক কাগজে পরিণত হয়।

প্রভাকরের পরে বাহির হয় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'ভাস্কর'। উভয় কাগজমধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ খুব চলিত।

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামক আর একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ইহা ব্রাহ্মরা যে হিন্দুদের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিতেন তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ প্রথমে বাহির হয়। পরে এই পত্র আর গৌরীশঙ্করের 'রসরাজ' এর মধ্যেও তুমুল বাকযুদ্ধ চলিত। 'পাষণ্ডপীড়ন' শীঘ্রই উঠিয়া যায়।

উভয়ের দ্বন্দ্ব কোলাহলে বড়ই কৌতুক সৃষ্টি হইত। এই বাকযুদ্ধ কাহারও কাহারও মতে অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ হইলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়ই বলিতে হইবে, "গুপ্তকবির ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না— গৌরীশঙ্করকে তিনি রাগ করিয়া গালি দেন নাই।"

"গুপ্তের কবিত্ব"

ঈশ্বরচন্দ্র 'সাধুরঞ্জন' নামেও একখানি কাগজ বাহির করেন। যাহারা দ্বন্দ্ব বিতণ্ডার কথা পড়িতে চাহিতেন না, 'সাধুরঞ্জন' তাহাদের চরিতার্থ সম্পাদন করিত। 'প্রভাকর' দৈনিক থাকা স্বত্বেও ১৮৫৩ সাল হইতে প্রতি বাঙ্গলা মাসের প্রথম তারিখে একখানি দীর্ঘাকার মাসিক সংখ্যা বাহির হইত। ইহাতে গুপ্ত কবির নানাবিধ কবিতা বাহির হইত। সর্ব্বসাধারণের নিকট তখন তাঁহার এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল, যে, এই সমস্ত কবিতা পড়িবার জন্য পাঠকমণ্ডলী কাগজের অপেক্ষায় না থাকিয়া দলে দলে প্রভাকরের আফিসের সম্মুখেই আসিয়া উপস্থিত হইতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে যে যাত্রাগান ও কথকতা হইত, সেখানেই বঙ্কিমের হৃদয়ে প্রথম সাহিত্যের বীজ উপ্ত হয়। মেদিনীপুরে আবার যাদবচন্দ্রের বাড়ীতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ হইত। সাধারণতঃ বঙ্কিমের পিতাই পড়িতেন। তাঁহার স্বর অতি মিষ্ট এবং উচ্চারণ ভঙ্গী অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি বড় সুন্দর ভাবে মহাভারত পড়িতেন। বঙ্কিম এক ঘণ্টার মধ্যে স্কুলের পাঠ অভ্যাস করিয়া তন্ময় হইয়া সন্ধ্যার পরে পুরাণ পাঠ শুনিতেন। বাল্যকালের এই পুরাণ কথা ভবিষ্য-সাহিত্য-সম্রাটের কল্পনার বীজ পুষ্ট করিয়া দেয়। বস্তুতঃ পুরাণে শ্রদ্ধাবশতঃই বাল্যকালে তিনি হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে কৃষ্ণসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন ও উত্তর পান যে "শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র"। মৃত্যুর পূর্ব্বে যে তিনি মহাভারত আখ্যান লিখিতেছিলেন, তাহার পাণ্ডুলিপি এবং 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে পরে বলিব। উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র রামায়ণ মহাভারতকে 'ইতিহাস' আখ্যা দিয়াছেন।

হুগলী কলেজে পড়িবার সময় দ্বাদশ বৎসর হইতেই তিনি প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি ইংরাজী ভাষায় ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিয়া সহপাঠিদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন এবং নিজেও বিশেষ আনন্দ পাইতেন। এই সময়ই তাহার প্রথম বাঙ্গলা রচনা প্রকাশিত হয়। কি ভাবে তাহা হয়, তাহা বড় কৌতূহলপূর্ণ।

সঞ্জীব বাবু প্রথম হইতেই কয়েকখানি কাগজ রাখিতেন। ইহা তাহার 'বাবুগিরির' একটা অঙ্গ বিশেষ ছিল।

পূর্ণচন্দ্র বলেন, "বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আবৃত্তি করিতেন। আমাদের বাড়ীতে 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকা আসিত, উহার মধ্যে যে কাগজটী ভাল থাকিত, তাহাই তিনি কণ্ঠস্থ করিতেন। একদিন বঙ্কিমচন্দ্র 'সাধুরঞ্জন' পড়িয়া দেখিলেন

মেদিনীপুরে যাদববাবুর বাসা

এইখানে থাকিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর স্কুলে পড়িতেন। পরে এই বাড়ীতে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের পিতা বাস করিতেন। ডাঃ ঘোষ এইখানে থাকিয়াই পড়েন।

পঞ্চাশ ছত্রের একটী কবিতা উহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন স্বদেশত্যাগোদ্যত ব্যক্তি মাতৃভূমিকে উদ্দেশ করিয়া কবিতাটি লিখিয়াছেন। কবিতাটী পড়িয়া বঙ্কিম বাবুর খুব আনন্দ হইল এবং তিনিও ঐরূপ একটী কবিতা লিখিবার জন্য কৌতুহলী হইয়া উঠিলেন। ঐদিনই অপরাহ্নে তিনি একটী কবিতা রচনা করিয়া ফেলিলেন। বারে বারে উহা পড়িলেন এবং সকলকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং সেইদিনই উহা সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেন।

পরের সপ্তাহে ব্যস্তসমস্ত হইয়া কাগজখানা খুলিয়াই দেখিলেন যে তাহার কবিতাটী ছাপা হইয়াছে। বালক বঙ্কিমের আর আনন্দের অবধি রহিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্য একচ্ছত্র অধিনায়কের ইহাই প্রথম মুদ্রিত রচনা। কিন্তু আজ পাঠকগণকে সেইটী উপহার দেওয়ার আমাদের সাধ্য নাই।

এই রচনাটীতে এতই তিনি উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন, অতঃপরে তিনি প্রায়ই কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেন। প্রত্যেক কবিতার নীচেই ব, চ, চ, স্বাক্ষর থাকিত। অন্য কেহ চিনিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই সংক্ষেপে পরিচয় দিতেন। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় বড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক ছিলেন, সব কাজেই তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল। পড়িয়াই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে কালে এই লেখক বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। সুতরাং তিনি নিজেই খুঁজিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বাহির করিলেন (discovered) এবং খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন নিজেই কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমের বাড়ীই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করা হইল, বিশেষ পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইল। এইদিন হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের খাঁটি শিষ্য হইলেন। এই সম্বন্ধ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট ছিল। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাশক্তির সমালোচনা করিতে গিয়া তিনি গুরুর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধার পরিচয়

দিয়াছেন। গুরুর আত্মীয় স্বজনকে দেখিলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলিঙ্গন করিতেন। কাঁটালপাড়া হইতে কাচড়াপাড়া দুই মাইল আড়াই মাইল ব্যবধান এবং অতঃপরে বঙ্কিম মাঝে মাঝে কবিগুরুর কাছে যাইতেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

"যখন ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, তখন আমি বালক—স্কুলের ছাত্র কিন্তু তথাপি ঈশ্বরগুপ্ত আমার স্মৃতিপথে সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দরকান্তি বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেন—তাঁহার কতকগুলা নন্দী ভৃঙ্গী থাকিত—রসাভাসের ভার তাহাদের উপরে পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্ব-প্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভাল বাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকে শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না।"

বঙ্কিম গুপ্ত কবির বাহ্যিক আকৃতি ও ব্যবহারে আকৃষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু ততোধিক আকৃষ্ট হইলেন তাঁহার গুণে। সরল কবির দেশপ্রীতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। "প্রভাকরে" গুপ্ত কবির—

"দেশের দারুণ দুখ, দেখিয়া বিদরে বুক
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
জাননা কি জীব তুমি, জননী জনম ভূমি
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে"
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে ?"

প্রভৃতি কবিতা দেশবাসীকে ব্যথিত করিল। বঙ্কিমচন্দ্রও স্বয়ং লিখিয়াছেন—

"ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। দেশ বাৎসল্যে এখানকার কয়জন তাঁহার সমকক্ষ? বিদেশের ঠাকুরদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াই আদর করিতেন।" গুপ্ত কবির কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের জপ হইল—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া,
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

বঙ্কিমের দ্বিতীয় আকর্ষণের কারণ, গুপ্ত কবির ভাষা ও ছন্দ। যাঁহারা গুণ চাহেন, পারিপাট্য চাহেন না—সারল্যই তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়ান। কবিগুরুর সেই সরলতাই অতি মাত্রায় ছিল। চিত্তরঞ্জন (দেশবন্ধু) বলিতেন "আজকালকার কবিতা পড়িলে মনে হয় আমাদের ভাব, ভাষা, ধরণ সব বদলাইয়া গিয়াছে···আমরা প্রত্যেক কথাই এত ঘুরাইয়া বলি যে, সাদাসিদে লোক বুঝিতে পারেনা। আমাদের ছন্দের এখন সাপের মত বক্রগতি।" বঙ্কিমচন্দ্রও গুপ্ত কবির ভাষার এইরূপ সরল ও সাবলীল গতিতে মুগ্ধ হইয়াই উত্তরকালে নিজেই লিখিয়াছেন :—

"ঈশ্বরচন্দ্র যে ভাষায় পদ্য লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজি নবিশীর বিকার নাই—পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলেনা, বাঁকে না—সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গলা (ভাষায় ও ভাবে) ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকাফুল নাই।"

"বঙ্কিমবাবু বলিতেন—"ঈশ্বরগুপ্ত দেশের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহা যেন খাঁটি ভবিষ্যদ্বাণী। আর অমন নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলিতে তিনি কখনও সঙ্কুচিত হন নাই। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গাল খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা 'নস্য-লোসা দধি চোযার দল' গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খৃষ্টান হইতে চলিল দেখিয়া রাগ সহ্য হইত না। মিশনারীদের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ।""

গুপ্তকবি সত্যই লিখিয়াছেন—

"যত কালের যুবো, যেমন সুবো, ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে,
ধ'রে গুরু পুরুত মারে জুতো ভিখারী কি অন্ন পাবে ?
যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়, ঘুষি ধরেন উঠেন তবে,
বলে গতোর আছে খেটে খেগে, তোর পেটের ভার কেটা ববে ?

স্ত্রী-শিক্ষার যেটুকু কুফল, তাহাও তিনি নিঃসঙ্কোচেই বলিয়াছেন—

আগে মেয়ে ওগো ছিল ভালো
ব্রত ধর্ম্ম কোর্ত্তে সবে
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে ?
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
এ, বি, শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।
আর কি তারা সাজি নিয়ে
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে ?
সব কাঁটা চামচে ধরবে শেষে
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে ?

ও ভাই আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবে দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।

আজকাল এই কথাগুলি একেবারে সত্যে পরিণত হইয়াছে। দীনবন্ধু যে নীলকর বিষধর সর্পের দংশন কাহিনী বুকের রক্তে লিখিয়া সমগ্র বাঙ্গলাদেশ কাঁদাইয়াছিলেন তাহাও গুরুর দীক্ষাবলে। গুপ্ত কবিই লিখিয়াছিলেন—

"নীলের দাদন, ঠোঙ্গার গাদন বাঁধন চমৎকার
করে ভিটে মাটী চাটি সার"

আবার অন্যত্রও আছে—

হলো নীলকরদের অনারারী মেজিষ্টারী ভার
কুইন মাগো
পড়েছে সব পাথর বক্ষে, অভাগা প্রজার পক্ষে
বিচার রক্ষা নাইকো আর।

পণ্ডিতপ্রবর মিশনারী বিখ্যাত ডফ সাহেবের যুবকগণকে খ্রীষ্টান করিবার প্রচেষ্টায় গুপ্তকবি লিখিয়াছেন—

বিদ্যাদান ছল করি মিসনরি ডব
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্ম্মের টব
কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়
মিসনারি ছেলে ধরা ছেলে ধরে খায়
চুপ চুপ ছেলে সব হও সাবধান
কাণ কাটা কৃষ্ণবন্দ্যো কেটে নেবে কাণ

আবার রহস্য করিয়া "বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীগণ"কেও বলিতে ছাড়েন নাই—

"বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও নির্ভীকভাবে তিনিই প্রথম দোষ দেখাইয়া দেন।

এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরচন্দ্রের একটী প্রধান কীর্ত্তি ছিল লেখকসঙ্ঘ গঠন করা। তিনি সর্ব্বদা যুবকদিগকে শিখাইতেন—

পদ্য হয়, গদ্য হয় যাহা লয় মনে
পরম প্রবন্ধ লেখ বিশেষ যতনে
আপনি লিখিতে শেখ পার যে প্রকারে
লেখাও শেখাও সবে সত্য অনুসারে,

বঙ্কিমের স্বাভাবিক সাহিত্য-প্রতিভাও প্রথম পরিস্ফুরিত হয় কবিতায়, আর এইরূপ কবিতা তিনি ঈশ্বরগুপ্তের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহেই লিখিতেন। এ বিষয়ে বঙ্কিম নিজেই লিখিয়াছেন—

"সে সময়ে ঈশ্বরগুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।"

এই উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গে নূতন লেখক-কুল গড়িয়া উঠিল। বস্তুতঃ ঈশ্বরগুপ্তকে কেন্দ্র করিয়াই কাব্য গগনে "প্রভাকর গ্রহমণ্ডল" সৃষ্ট হয়। সাহিত্যের ইতিহাসে গুপ্তকবির এই কীর্ত্তি চিরকাল ঘোষিত হইবে। বঙ্কিম নিজেই লিখিয়াছেন—"ঈশ্বরগুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবীসদের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবীস ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন, বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি বাবু মনোমোহন বসু, আর একজন। ইহার জন্যও বাঙ্গলার সাহিত্য প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি 'প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়।"

ঈশ্বরগুপ্তের পূর্ব্বোক্ত গুণ বঙ্কিমচন্দ্রে শতধা বর্দ্ধিত দেখিতে পাই। তাঁহার জাতীয় ভাব ছিল অসীম, তিনিও স্পষ্ট করিয়া নিজের ভাব বুঝাইতেন, আর তিনিও মেকি ইংরাজীনবীস, মেকি লেখক, মেকি ধর্ম্ম-যাজকের স্বরূপ প্রকট করিবার সুযোগ গুরুর ন্যায় কখনও ত্যাগ

করিতেন না। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের উপযুক্ত শিষ্য হইলেও তিনি গুপ্ত কবির গুণভাগেরই অনুকরণ করিয়াছেন, দোষভাগ করেন নাই। তাঁহার রুচি অত্যন্ত মার্জ্জিত, উন্নত ও সুসংবদ্ধ ছিল এবং মার্জ্জিতরুচি যুবক রবীন্দ্রনাথও (সাধনা ৩য় বর্ষ) স্বীকার করিয়াছেন—

"বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বরগুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন, সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে কোন প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিলনা। সে সময়কার অসংযত বাকযুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ইতরতার* প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুন্নবোধ রক্ষা করা যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বরগুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।"

ঈশ্বরগুপ্তের 'বোধেন্দু বিকাশ' ও 'কলি' নাটক সম্বন্ধে বিবরণ পাঠক মদ্ প্রণীত "Indian Stage"এ পাইবেন।

যাহা হউক অতঃপরে "প্রভাকরে" যখন বঙ্কিমের প্রথম কবিতা বাহির হয়, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। এই কবিতাটীও কবিগুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিম্নে ইহা উদ্ধৃত হইল—

প্রথম চরণে স্ত্রীর উক্তি, দ্বিতীয় চরণে পতির উক্তি—

স্ত্রী—কহনা কি হেতু কান্ত শশী অস্তাচলে

পতি—তব মুখ মুখ হয়ে চলে অস্তাচলে

---

*বঙ্কিম নিজে লিখিয়াছেন "ঈশ্বরগুপ্তের অশ্লীলতা নহে। তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরা এইরূপ ব্যবহার করিতেন। যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল তিনি ধর্ম্মাত্মা, যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল, তিনি পাপাত্মা। ঈশ্বরগুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা অশ্লীল।" "গুপ্তের কবিত্ব"

স্ত্রী—দশদিগ কেন প্রাণ প্রকাশিত হয়
পতি—তব মুখ আলোকেতে হয় প্রভাময় ॥
স্ত্রী—কি হেতু কোকিল কুল, কুহু কুহু করে
পতি—তোমার মধুর স্বর পাইবার তরে
স্ত্রী—কেন পতি দিনপতি উঠিছে গগনে
পতি—ও মুখ-নলিনী ফুল্ল-করণ কারণে
স্ত্রী—কোথায় যাইছে সব মধুকরগণ
পতি—বদন কমল তব করে অন্বেষণ

শ্রী ব, চ, চ

ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় কবিতা ছাপাইয়া * নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন—"উক্ত ছাত্রের বয়স অত্যল্প, কিন্তু এই পদ্য অতি প্রাচীন কবির রচনার ন্যায় উত্তমরূপে রচিত হইয়াছে। এইজন্য সকলেই তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন।"

প্রভাকর সম্পাদক।

এইটী ছিল হেমন্ত বর্ণনচ্ছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন। পরের মাসে 'অষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়ের' নামে বঙ্কিম 'বসন্ত' নামক একটী পদ্য রচনা করেন এবং প্রভাকরেই উহা বাহির হয়—

১৪ই চৈত্র ১২৫৮, ২৬শে মার্চ্চ ১৮৫২।

কবিতা রচনায় 'প্রভাকরে' বঙ্কিমের আরও দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, একজন স্বনামখ্যাত দীনবন্ধু মিত্র আর একজন সুকবি দ্বারকানাথ অধিকারী। দীনবন্ধু হিন্দু কলেজে পড়িতেন, আর দ্বারকানাথ ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের কৃতী ছাত্র।

এই তিনজনই প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন এবং তিনজনের মধ্যে সুস্পষ্ট কবিপ্রতিভা বৃদ্ধি করিবার জন্য কবিগুরু মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতা এবং তাহার পুরস্কারের কথা বিঘোষিত করিতেন।

*[৪২৫৯ সংখ্যা বুধবার ১৪ ফাল্গুন ১২৫৮, ফেব্রুয়ারী ১৮৫২]

১২৫৯ সালের ২রা চৈত্রের প্রভাকরে বিঘোষিত হয়—

"হিন্দু কলেজের সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হুগলী কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ অধিকারী এই ছাত্রত্রয়ের বিরচিত গদ্য পদ্য পরিপূরিত তিনটী প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল রচনার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের সহযোগিগণ এবং গুণগ্রাহক গ্রাহকগণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া যাঁহার রচনা যেরূপে এবং যে ভাবে উৎকৃষ্ট বোধ হইলে তাঁহাকে সেইরূপভাবে পুরস্কৃত করিবেন। আমরা এ বিষয়ে কোন কথাই উল্লেখ করিব না।"

দীনবন্ধুবাবুর "দম্পতি প্রণয়" নামে দীর্ঘ কবিতা, দ্বারকানাথের 'সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ' এবং বঙ্কিমের কয়েকটী কবিতার উপরে বিচার হয়। বঙ্কিমের কোন্ কবিতা শ্রেষ্ঠ বা কোন্‌টী অবলম্বনে পুরষ্কারলাভে তিনি সমর্থ হন, তাহা বুঝা সুকঠিন। তবে এই সময়ে তাঁহার কয়েকটী কবিতা বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'কামিনীর প্রতি উক্তি' 'তোমাতে লো ষড়ঋতু' ১৮৫৩ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে প্রভাকরে বাহির হয়, আর "বসন্তের নিকট বিদায়," প্রায় মাসেক পরে ১২৫৯ সালের ৩০ চৈত্র লিখিত হয়।

হেমন্ত ও বসন্ত কবিতার পর উক্ত "বসন্তের নিকট বিদায়" কবিতাও প্রভাকরে বাহির হয়।*

আমরা এই কবিতাটী এইখানে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

হে বসন্ত মনোহর, হা মোহন রূপধর
হারে হৃদি বিচঞ্চলকর।

*১২৬০, ১৬ই বৈশাখ ১৮৫৩, ২৭শে এপ্রিল প্রভাকর।

লইয়ে রূপের ভার, কেন কর পরিহার
এ মহীমণ্ডলে মনোহর ॥
আর কিছুদিন তরে, রহরে ধরণী পরে
বিদায় তোমারে নারি দিতে
জানি জানি মরি মরি, এ পাপ পৃথিবী পরি
নারো আজ দিনেক রহিতে ॥

শেষ অংশ

আসিবে সে দিন যবে, কি সুখ দিবারে রবে,
যৌবন যুবতী প্রেম সুখ।
শুধু তারা দেবে জ্বালা মনে হবে ঝালাপালা
ভাবিয়া পাপের যত দুঃখ
তাই বলি পরিণামে অধরেতে ধরি নামে
ঈশ্বর অন্তর ভাবে যেই।
পরমেশ প্রেমাস্পদ, লাভ করি মোক্ষপদ
নিত্যই বসন্ত পাবে সেই।

ইহার পরেই ১৮৫৩, ১৪ই জুন তারিখে নিম্নলিখিতভাবে প্রভাকরে পুরস্কার বিঘোষিত হয়—

"বিদ্যোৎসাহী জমিদার"

রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী তুষভাণ্ডারের সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগী যুবক জমিদার বাবু রমণীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় উত্তম গদ্য পদ্য রচনার জন্য কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারীকে ১৫৲ হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্রকে ১০৲ এবং হুগলী কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ১০৲ পারিতোষিক প্রদানার্থ আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ৪৬৬১ সংখ্যা ১লা আষাঢ় ১২৬০, ১৪ই জুন ১৮৫৩।

বঙ্কিম কেবল এই ১০৲ টাকাই পুরস্কার পান নাই। আরেকবারও একটী দশটাকার পারিতোষিক লাভ করেন। তার দাতা ছিলেন উক্ত জমিদারই। কবিগুরু ঈশ্বরচন্দ্র এই কুড়ি টাকাই বঙ্কিমকে দেওয়ার জন্য হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ জে, কার্ (J. Kerr) সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন। কার সাহেবও এই শুভ সংবাদটী ফোর্ট উইলিয়ামের এডুকেশন কাউন্সিলকে ১৮৫৪ সালের একখানি চিঠিতে রিপোর্ট করিয়াছিলেন।*

দ্বিতীয়বার কি কবিতায় পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তাহাও বুঝা যায় না। তবে এ সময়ে বঙ্কিম অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন।

বঙ্কিম নিজেও এ বিষয়ে লিখিয়াছেন:—

"ঈশ্বরচন্দ্র কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র তিনি প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনাপ্রণালীটা কতকটা ঈশ্বরগুপ্তের মত ছিল সরল স্বচ্ছ-দেশী-কথায়

To the Secy. to the Council of Education, Fort William

Hoogly the 20th February, 1854.

Sir,

I have the honour to report for the information of Council of Education that I have received Twenty Rupees to be awarded to Bankim Chandra Chatterjee a pupil of the first class of the Senior School, for some good poetical compositions in Bengalee. The poetical compositions appeared in the Probhaker News paper. The prize of twenty rupees was awarded by Babu Ramani Mohan Roy and Kally Charan Roy Choudhury, Zemindars of Rangpore and was sent through Baboo Isser Chandra Goopta the editor of the above mentioned Journal.

J. Kerr

Principal.

দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র সকলেই গিয়াছেন—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।"

যাহা হউক বঙ্কিম কেবল কবিতা রচনা করিয়াই যান নাই, তৎকালীন প্রথানুসারে কবির লড়াইতেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বালক হইলেও সে লড়াই হইত অতি সংযত, সংস্কৃত এবং সুসঙ্গতভাবে। তবে শ্লীলতাপূর্ণ হইলেও তাহাতে কৌতূহল-উদ্দীপনার কোন অভাব ঘটিত না।

এ সম্পর্কে পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"বঙ্কিম এবং দীনবন্ধু ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য হইয়া "প্রভাকরে" লিখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন তের কি চৌদ্দ বৎসর হইবে। উভয়েই কবিতা লিখিতেন। কখনও দেখাশুনা নাই, চোখোচোখি নাই, পত্রের দ্বারা এই সময় ইহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। ইউরোপের Royal Loversদের ন্যায় ভালবাসা জন্মিল। সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত,—আদরের কবিতা, কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত।" "প্রভাকরে" দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাতে পরস্পরকে গালাগালি দিতেন। সংবাদপত্র উহাকে "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ" বলিয়া উল্লেখ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন, রহস্যপ্রিয় দীনবন্ধুর জন্য উহা ঘটিয়াছিল। পূর্ণচন্দ্র আরও বলেন :—

"আমার স্মরণ আছে, বহুকালের কথা সে, একদিন একখানি পত্র পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র বড় হাসিয়া উঠিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে—পত্রে কি লিখিয়াছে?" তিনি কোন উত্তর না দিয়া আবার পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন, আবার হাসিলেন। এইরূপ বারংবার

পড়িয়া পত্রখানি বাক্সের ভিতর রাখিলেন। আমি তখন 'দেখি' 'দেখি' বলিয়া ইহা তাঁহার হাত হইতে লইবার চেষ্টা করিলাম—আমি তখন বালক, আমাকে ধমক দিয়া দাদা বাক্স বন্ধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবই এইরূপ ছিল যদি কখনও কাহারও উপর বিরক্ত হইয়া ধমক দিতেন, তাহার পরক্ষণেই আবার সেই ব্যক্তিকে ভাল কথা বলিতেন। এইস্থলেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না, পরক্ষণেই নরম স্বরে আমাকে বলিলেন "তুমি কি বুঝিবে? ইহা কবিতা। দীনবন্ধু কবিতায় আমাকে গালি দিয়াছে।" আমি বলিলাম "আপনিও গালি দিয়া লিখুন।" উত্তরে তিনি বলিলেন "লিখিব বই কি?"

অতঃপরে কালেজীয় কবিতায় মারামারি, বিষম বিচিত্র নাটক অর্থাৎ কবিদের মজলিস এবং নাটক দর্শন প্রভৃতি বাহির হয়। শেষোক্ত কবিতায় বিদ্যার নাম, অবিদ্যার নাম, অবিদ্যার প্রতি কবিদের রহস্যোক্তি, কুবিদ্যা কবি ঈশ্বর, বুনোর গীত, বুনোর কবিতা পাঠ ইত্যাদি পদ্য আছে। সমস্ত উল্লেখ করা নিস্প্রয়োজন।*

নিম্ন সংখ্যায় পাঠক দেখিবেন—

৪৭৪৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার ১২ আশ্বিন ১২৬০ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩, সংবাদ প্রভাকর

এইবারে "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের" একটু পরিচয় দিব—

দ্বারকানাথ দীনবন্ধুকে বলিতেন "শস্তুরে কবি" ও বঙ্কিমকে বলিতেন "চট্টোকবি", আর দীনবন্ধু পাল্টা উত্তর দিয়া দ্বারকানাথকে বলিতেন "বুনোকবি"।

*কোন্নগরের সুধীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার বাড়ীর লাইব্রেরিটী দেখিয়াছি। তিনি "মাসিক বসুমতী"তে অনেক জিনিষ উঠাইয়া দিয়াছেন।

এই সমস্ত কবিতায় বেশ মাধুর্য্য আছে। একবার শহুরে কবি দীনবন্ধু দ্বারকানাথকে গালাগালি দিয়া বলিলেন "শাখায় কুরঙ্গ" অমনি চট্টোকবি লিখিলেন—

কৃপাকরি কহ স্বীয়, সরল স্বভাবে
"শাখায় কুরঙ্গ" তুমি বলেছ কি ভাবে।

অমনি শহুরে কবি গাহিলেন—

হাহা ভাই বুঝিতে পারনি, এই গাল।
এর ভাব ঠিক যেন পাড়াগেঁয়ে ডাল॥
শাখায় কুরঙ্গ আমি, এ ভাবে লেখেছি।
কৌশল করিয়া মিত্র বানর বোলেছি॥
আর এক ঠাঁই দেখ, করি অনুমান।
কহিয়াছি তারে আমি, বীর হনুমান॥
বুক চিরে রাম লিখে, কে বেঁধেছে বাণে।
রামচন্দ্র দীনবন্ধু, হনুমান বিনে॥

চট্টোকবি বুনো কবির বরাবর লিখিলেন—

জ্ঞান কেন অধিকারী, কবিতা মাঝারে।
মোরে আদি কবি বলে দ্বিতীয় তোমারে॥

আবার বুনোর সম্বন্ধে শহুরে কবিকে সম্বোধন করিলেন—

তোমার সহিত কভু, না পারিবে বুনো।
তার চেয়ে তুমি ভাই বুদ্ধি ধর দুনো॥

শহুরে কবি উত্তর করিলেন—

বুনোরে যদ্যপি আমি বলি কুবচন।
তাহাতে ঈশ্বর রুষ্ট হবেনা কখন॥
কারণ ভুলোক মাঝে ইহা জানে কে না।
ঈশ্বর আমার কাছে চিরকাল কেনা॥

বঙ্কিমের আর একটী স্বরচিত কবিতা নিম্নে দিতেছি।

তিন মিত্রের কথোপকথন

১ম মিত্র—কি বিষাদে মুখখানি হাসিভরা নাই
বেণাবনে বসে কেন উঠ—উঠ ভাই।

২য় মিত্র—দেখিয়া দেশের গতি কেঁদে মরি মনে
সে দুখে বসিয়া আছি বিরস বদনে

৩য় মিত্র—সখারে বচন ধর মিছা দুখ পরিহর
নিজ সুখে সুখী হও ভাই

২য় মিত্র—নিজ সুখ এ সংসারে বল বল বল কারে
আমি তো সে সুখ দেখি নাই।

৩য় মিত্র—তবে গো বিদায় হই প্রণয়েতে যেন রই
এই আশা করে মোর মন।
যদি কোন কথা মোর হয়ে থাকে অতি জোর
Then beg your is the pardon.

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮৫৩।২০ মে, প্রভাকর

শুনিয়াছি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে না পারায় দীনবন্ধু খুব রুষ্ট হন, আর বঙ্কিমেরও নাকি কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। কিন্তু এরূপ অনুমান খুব সম্ভব ঠিক নয়।

১৮৫৩ সালের জুন মাসে পুরস্কার ঘোষণার পরেও যে বঙ্কিম প্রভাকরে লিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আছে। কালেজীয় কবিতার মারামারি এই বৎসরের সেপ্টেম্বরের কবিতা। বর্ষবর্ণনা ছলে "দম্পতির রসালাপ" ও এই মাসের একটী সরস কবিতা।

অতঃপরে বঙ্কিমের পরীক্ষা আসিল, বেশী পড়িতে হইল, কবিতায় মন দেওয়ার আর অবকাশ রহিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৫৪ জুনিয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করেন।

অতঃপরে তিনি সিনিয়র স্কলারশিপের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন—উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইলেন, বঙ্কিমের চিন্তাধারা ও রুচি, সংস্কৃতি কেবল প্রভাকরেই নিবদ্ধ রহিল না। তাঁহার প্রতিভা আরও উর্দ্ধতন স্তরে উন্নীত হইল তিনি বায়রণ, শেলী, কীট্‌স্, কলারিজ, সেক্‌স্‌পিয়র প্রভৃতির কবিতা পড়িতে লাগিলেন। প্রতিভাশালী বালকহৃদয়ে পাশ্চাত্য কবির প্রভাব পড়িতে লাগিল। তাই কেবল ঈশ্বরগুপ্তই তাঁহার কাব্য-পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হইল না, তাঁহার ভাবধারা আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। প্রভাকর ছাড়িবার ইহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া মনে হয়। ইহার পরে বঙ্কিম প্রভাকরে আর লেখেন নাই। তবে হুগলী কলেজের প্রকাণ্ড ও অসংখ্য পুস্তকাগারের বহি সকল পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের বড় চর্চ্চা করিতে থাকেন। কিন্তু ইংরাজী সাহিত্য-আকরেই তিনি অধিকতর প্রবেশলাভ করেন। এবং এই পাঠাসক্তি তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা' ও 'মানস' কবিতাদ্বয় ১৮৫৩ সালেই রচিত হয়। ললিতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। 'মানসে'ও কিন্তু পরিণত মতির পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

ভাবিয়া ঝটিকা মত ছিল মম মন
এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন
কারো অনুরাগী নই বিনা সনাতন
জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন ॥

অনন্ত মহিমা স্মরি ছাড়িব এ দেহ।
জানিবে শুনিবে না কাঁদিবে না কেহ॥
অনিবার জলরব কাঁদিবে কেবল।
আছে কি পৃথিবী হেন বিমোহন স্থল?

যে কারণেই হউক এই দুইটী কবিতা বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রভাকরে' প্রকাশ করেন নাই।

বঙ্কিম পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে কবিতা দুইটী লেখেন এবং ইহার তিনবৎসর পরে উহা মুদ্রিত হয়। কিন্তু প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারীতে পচে—বিক্রয় হয় নাই। ইহাতে নিরুৎসাহ হইয়াছিলেন কিনা তাহার প্রমাণ নাই, তবে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের অপূর্ব্ব কবিতা পাঠ করিয়া যে স্তম্ভিত হইলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহাহউক ১৮৫৪ সালের পরে বঙ্কিম ক্বচিৎ পদ্য লিখিতেন। অতঃপরে প্রাপ্ত বয়সে রাজার উপরে রাজা, বিরহিণীর দশদশা ও আরও কয়েকটী কবিতা ছাড়া অতঃপরে বঙ্কিম আর কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। তবে বিদ্যালয়ের ন্যায় গদ্য সাহিত্য-গগনেও যে তিনি একশ্চন্দ্র তমোহন্তি হইলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু সেই গদ্যও ছিল সম্পূর্ণ কবিত্ব-মণ্ডিত রস-পরিপুরিত, মাধুর্য্য-সমন্বিত। এই পদ্য গদ্যের সমাবেশেই সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র

ষষ্ঠ অধ্যায়—বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলা গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন ১৮৫২ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে। গদ্য পদ্য উভয়ই তিনি এই সময়েই লেখেন। তবে প্রথমে পদ্যের প্রতিই বেশী অনুরাগ ছিল।

বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা এখানে খুবই যুক্তিসঙ্গত।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতেই গদ্য সাহিত্যের প্রথম উন্নতি আরম্ভ হয়। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সেই সময়ে পদ্য সাহিত্যই বিশেষ পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

তখন গদ্যেও পদ্যের ছাপ থাকিত। পদ্যে ছন্দোবন্ধ থাকিত। গদ্যে তাহা থাকিত না। কিন্তু বাক্যবিন্যাস প্রায় এক রকমেরই থাকিত। নরোত্তম দাস গদ্যে লিখিয়াছিলেন “অতএব স্বরূপ রূপ এক বস্তু হয়।” ইহা পদ্যেও ব্যবহৃত হইতে পারে। “তাহাকে জানিব কেমনে” ইহা গদ্যে ও পদ্যে উভয় প্রকারেই ব্যবহার করা যায়। তবে একথা ঠিক যে বাঙ্গলা গদ্যের প্রথম পরিচয় হয় বৈষ্ণব কবিগণের “সহজিয়া সাহিত্যে”।

তখন সামান্য চিঠিপত্র, খত্‌ কবালা, পাট্টা কবুলতি, আদালতের বা চাকুরির জন্য দরখাস্ত, আর্জ্জি, জবাব বা ব্যবসায়ের রোকা ভিন্ন অন্য কিছু বড় গদ্যে লিখিত হইত না। আর তাহাতে উর্দ্দু, ফারসীর গন্ধ থাকিত।

এই সব দলিলের ভাষার নমুনার জন্য পাঠককে স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িতে অনুরোধ করি।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও বাঙ্গলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন। তাঁহারা চিঠিপত্র পর্য্যন্ত সংস্কৃতে ভিন্ন লিখিতে চাহিতেন না। আর তাহাও হইত দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিল।

বাঙ্গলা ভাষার জন্য আমরা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও খৃষ্টান মিশনারীদের কাছে কতকাংশে ঋণী। এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করা দরকার, কিন্তু তাহা ইংরাজীতে হইতে পারে না। সংস্কৃতে বা ইংরাজীতেও কোম্পানীর কাজ নির্ব্বাহ হয় না—বুঝিবে কে? তাই বাইবেল বাঙ্গলা গদ্যে অনুদিত হইল, আর কোম্পানীর কার্য্যকারকগণও (Writers of the Company) কাজের সুবিধার জন্য বাঙ্গলা শিখিতে লাগিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হেলহেড সাহেব N. B. Halhed* নামক জনৈক সিভিলিয়ান বাঙ্গলা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। চার্লস উইলকিন্স নামক জনৈক ইংরাজ কাঠে একপ্রস্থ বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদিত করেন। ইহাতেই তাঁহার বন্ধু হেলহেডের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। কিন্তু প্রকৃত মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে এইরূপ যে দুই একখানি গ্রন্থ ছিল তাহার আর প্রচার হইল না। ক্রমে পঞ্চানন কর্ম্মকার প্রভৃতি কয়েকজনের চেষ্টায় মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

* বাঙ্গলা ভাখায় দক্ষ আর একজন হেলহেড্‌ সম্বন্ধে পাঠক মদ্‌ প্রণীত ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪৮ দেখিতে পারেন।

১৮০১ সালে ফষ্টর (H. P. Forster) সাহেব সর্ব্বপ্রথমে* বাঙ্গলা ভাষায় অভিধান প্রস্তুত করেন। মিশনরী কেরি সাহেব যে কথোপকথনের ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহাও অনুবাদের ভাষা,—যেমন "আপনি একটী সুমানুষের কন্যা স্থির করিয়া আনুন"—ইত্যাদি—

১৮০০ খৃষ্টাব্দে সিভিলিয়ানদের বাঙ্গলা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে পড়াইতেন। ইহারা জজ পণ্ডিত নামে অভিহিত হইতেন। পণ্ডিত এবং লেখকগণকে উচ্চ বেতন বা পারিতোষিক দেওয়া হইত। অর্থলোভে পণ্ডিতের অভাব হইত না। ইহাতে কিছু কিছু বাঙ্গলা ভাষার প্রচার হয়।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮১১ অব্দে উহা লণ্ডনে মুদ্রিত হয়। মুখপত্রে লিখিত হয় "লন্দন মহানগরে চাপা হইল ১৮১১।" ইহার রচনা দেখুন—

"পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মত প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের লোকদিগের কোনও ব্যামোহ নাই। ভৃত্যবর্গেরা নিজ নিজ কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রাধান্য করিয়া কালক্ষেপণ করে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির সীমা নাই। তখন রাজধানী মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেবের নিকট মহারাজের অত্যন্ত সম্ভ্রম। সর্ব্বপ্রকারে মহারাজ চক্রবর্ত্তীর ন্যায় ব্যবহার।"

* শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস যোগ্যতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গলা অভিধান ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, আর উহা ১৭৪৩ অব্দে পর্টুগাল দেশের রাজধানী লিসবন নগরে মুদ্রিত হয়। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৪৩, পৃঃ ১৬৩।

রামরাম বসু নামধেয় জনৈক ব্যক্তি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" রচনা করেন। উহার ভাষার নমুনা—

"নহবৎখানার উপরে ঘড়ি ঘর। সেস্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহাদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রেই তারা তাহাদের ঝাজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।"

উক্ত লেখকের 'লিপিমালা'ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্' কেরি সাহেবের প্রস্তাবানুসারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অতঃপরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "রাজাবলী" উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের রচনা উন্নত হইলেও সংস্কৃত বহুল ভাষা ও সমাসাদিতে উহা পূর্ণ। 'পৃথিব্যাশ্রিত' 'উপাদেয়তা গ্রহ' প্রভৃতি কথা শ্রুতিকটু। তাঁহার 'প্রবোধ চন্দ্রিকার' (১৮১৩) ভাষা "কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়া চলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরা ত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে,"—অতি কঠিন।

ক্রমে আরও লেখক আসরে নামিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রামজয় তর্কালঙ্কার, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইভাবে গদ্য সাহিত্য পরিস্ফুট হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সংস্কৃত-বাহুল্য কমিল না।

ইহাই বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম স্তরের ইতিহাস।

তাহার পর আসিল রাজা রামমোহন রায়ের যুগ (১৭৭৫—১৮৩২)। তাঁহার সময়ে ও অনুপ্রেরণায় গদ্য সাহিত্য অনেকটা নিয়মবদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইল বটে, কিন্তু আশানুরূপ সারল্য ও মাধুর্য্যলাভ করিতে পারিল না। তবে রাজা সমাজনীতি, রাজনীতি, বাংলা ব্যাকরণ, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি সব

বিষয়েই ভাষার উন্নতি করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি সরলভাবে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতেও চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। তাঁহার ভাষার নমুনা "এ দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, এথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্যদ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়।"

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মার্শম্যান (১৮৩৯) ও ইয়েট্‌স্ এই যুগের উল্লেখযোগ্য লেখক।

রামমোহন রায়ের সাপ্তাহিক পত্র 'সংবাদ কৌমুদী'ই বাঙ্গালীর প্রথম আদৃত পত্রিকা বলিয়া পরিগণিত। ৯৮২৯ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের ইংরাজ মিশনরীদের "সমাচার দর্পণ" ছিল বটে, কিন্তু ইহার ভাষা ইংরাজের অনুবাদী ভাষা হইত। তবে তাহারও পূর্ব্বের পত্রিকা—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গলা গেজেট' (৯৮৯৮)। রামমোহনের যেমন মিশনরীদের সহিত বিসম্বাদে লিপ্ত হইতে হইত, হিন্দু সমাজের সহিতও তাঁহাকে অনেক বিবাদ করিতে হইত। 'কৌমুদী' যেমন সতীদাহের বিপক্ষে অভিযান করিয়াছিল, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদ চন্দ্রিকাও' (৯৮২২) এই প্রথার স্বপক্ষের কাগজ ছিল। মিশনারীদের আবার ছিল 'সস্‌পেন ম্যাগাজিন'। রামমোহন বেদান্ত এবং উপনিষদের বঙ্গানুবাদও বাহির করেন। আর ৯৮২৪ সালে বাহির করেন "ব্রাহ্মণিক ম্যাগাজিন।" অল্প সময় মধ্যে পাঁচ ছয়খানি সাময়িক সংবাদপত্র বাহির হওয়ায় বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি সাধিত হয়।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রকেও সংস্কারকের যুগান্তঃর্গতই বলা যাইতে পারে।

ইতিমধ্যে ৯৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আদালত হইতে পারস্য ভাষা উঠিয়া যায়, আর ৪ বৎসর মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন হয়।

তারপরে **"সাগরী যুগ"**। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই যুগের প্রথম ও প্রধান। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংস্করণে বিলক্ষণ শব্দাড়ম্বর থাকিলেও উহা সহনীয়। বাঙ্গলা ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে বিশেষরূপে মার্জ্জিত হইয়া উঠে। এই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর, প্যারিচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যভূষণ প্রভৃতি বঙ্গীয় গদ্য সাহিত্যের উন্নতি করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এই যুগের প্রবর্ত্তক ও পরিণত সাধক। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও প্যারীচাঁদ মিত্রও এ বিষয়ে বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব যেরূপ সর্ব্বতোগামী, ইঁহাদের প্রভাব সেরূপ হয় নাই। মদনমোহনের শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগকে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ভাষায় বলা যাইতে পারে, উহা "তখনও আদর্শ, এখনও আদর্শ।" কিন্তু তিনি ডেপুটী কালেক্টারের পদ পাইয়া সাহিত্যের আসর হইতে বিদায় লন। অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ (১ম, ২য় ও তৃতীয় ভাগ) ও "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়" (১৮৫৩)—খুবই সুন্দর, ভাবগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা ইহাপেক্ষাও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, আর সীতার বনবাস প্রভৃতি গ্রন্থে একভাবের শব্দশৃঙ্খলা থাকায়, পড়িতে ভাল লাগে। ১৮৪৯ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'জীবন চরিত' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভাষা বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাষা অপেক্ষা প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। ক্রমে বিদ্যাসাগরের 'বাসুদেব চরিত' (১৮৫০) ও 'বোধোদয়' (১৮৫১) বাহির হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাঙ্গলা ভাষা খুব সরল, সহজ ও সুসংযত করিতেছিলেন এবং সে চেষ্টা যে অনেকটা সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছিল,

তাহা সকলেই স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে, সাগরী ভাষা বাঙ্গলার প্রাণের ভাষা নহে।

আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহিত্যে বাঙ্গালী জীবনের ছবি খুব কম পাওয়া যায়। তিনি গল্পের আখ্যান পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে ধার করিয়া নিতেন। এই সম্বন্ধে গুপ্ত কবির নিম্নলিখিত কয়েকটী ছত্র বিশেষ স্মরণীয়—

“তোমার আছে কি পুঁজি সকলের ধারো
ধার করা ভাব লয়ে যা করিতে পারো
ধেরো হয়ে হেরো হ'লে মুখে বল জিত
জানিতে না পারো কিছু কারে বলে হিত।”

আমরা পরে দেখিব যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাব ও ভাষার বিরুদ্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র অভিযান করিয়াছিলেন।

‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ ছিল সাগরীযুগের প্রধান মুখপত্র (১৮৪৩) ইহাকে ঠিক সংবাদপত্র বলা চলেনা। ইহাতে বেদ বেদান্তাদির অনুবাদ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা থাকিত। কিন্তু ইহাতে সংবাদাদি জানিবার সুবিধা ছিল না। সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছিল “প্রভাকর”। এই দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। অক্ষয়কুমারের ভাষার পরিচয়—“পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্ল যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশায় যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক সম্বন্ধে সুচারু চিত্ত প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান তিমিরাবৃত হৃদয় কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়।”

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু বাঙ্গলা ভাষার অনেক উন্নতি করিলেন বটে, কিন্তু সংস্কৃতবহুল শব্দ অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হওয়ায় বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। "প্রভাকরে" এই সমস্ত কথার উপহাস বিদ্রূপ বাহির হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই এই সমস্ত কথার হাসাহাসি হইত। শিক্ষিত লোকের বাটীতে গেলেই শুনা যাইত অক্ষয় বাবুর "জিগীষা" "জিজীবিষা" প্রভৃতি কথার পরিহাস আর সঙ্গে যোগ হইত "চিটুটীমিষা"।

ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় কেবল যে পদ্য রচনাই করিতেন তাহা নহে। তিনি সহজ গদ্যও লিখিতেন। তিনি ১৮৫৫ সালে ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী প্রকাশ করেন। গুপ্ত কবির সম্পাদিত প্রভাকর পত্রিকা বাঙ্গলার গদ্য সাহিত্যেও প্রধান সম্পদ হইয়া উঠিল। দীনবন্ধু, বঙ্কিম, মনোমোহন বসু প্রভৃতি গদ্য সাহিত্যেও গুরুদেবের সারল্য আশ্রয় করিয়াছিলেন।

১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ প্রকাশিকা" বাহির হয় এবং তাহার ৬ বৎসর পরে "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত হয় ১৮৫৭।৫৮ সালে। আর ইহার সম্পাদন করেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। ইহা অতি সহজ প্রচলিত বাঙ্গলায় লিখিত হইত। ইহার ভাষা স্ত্রীলোক ও বালকও বুঝিত। এখানেই প্যারীচাঁদ টেকচাঁদ-ঠাকুর নাম দিয়া "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাস লেখেন। এই বহিখানি এবং হরিনাথ মজুমদারের "বিজয় বসন্ত"ই বাঙ্গলার প্রথম উপন্যাস। এই "আলালের" অনুকরণেই কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" বাহির হইয়াছে। আলালের ঘরের দুলাল সরল বাঙ্গলা গদ্যের আদর্শ—রসের নির্ঝরিণী। এই ভাষা বঙ্কিম-চন্দ্রকে এক সময় এতই প্রভাবান্বিত করে যে, উত্তরকালে তিনি লিখিয়াছেন, "যে-ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী

কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডার পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষে অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।

"উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গলাদেশে প্রচারিত হইল যে, বাঙ্গলা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত—তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ব্বজনহৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুবর্ত্তিনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষায় তাহা সহজগুণ।

"আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয়কীর্ত্তি এই যে তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, "যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয়না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায় তবে বাঙ্গলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল"। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয়কীর্ত্তি। অতএব বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ।"

তাঁহার ভাষার একটু নমুনা দিই—

"কিয়ৎক্ষণ পরে বর মণিরামপুরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল—বর দেখ্‌তে রাস্তার দোধারি লোক ভেঙ্গে পড়িল—স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—ছেলেটীর স্ত্রী আছে বটে—

"বৃষ্টি খুব এক পসলা হইয়া গিয়াছে, পথ ঘাট পেঁচ পেঁচ সেঁত সেঁত করিতেছে। আকাশ নীল মেঘে ভরা মধ্যে হড়মড় শব্দ হইতেছে

বেঙ্‌গুলা আশে পাশে ঘাঁওকো ঘাঁওকো করিয়া ডাকিতেছে। দোকান পশারীরা ঝাপ খুলিয়া তামাক খাইতেছে।"

তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে, অক্ষয়কুমারের যেমন 'জিগীষা,' সংস্কৃত পণ্ডিতগণ যেমন সংস্কৃত শব্দই অধিক ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন,—(চিনির স্থানে শর্করা, কলার স্থলে রম্ভা, ঘৃতের স্থলে আজ্য ইত্যাদি) 'আলালের ঘরের দুলালে'ও অন্য দিকে কতকগুলি অমার্জ্জনীয় গ্রাম্য দোষ ছিল। আর ইহাতে কিছু কিছু ফার্সী শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে—যেমন বেতমিদ, কমজম, তজবিজ, মদৎ, বাকুলে, ফয়সালা ইত্যাদি। স্থানে স্থানে অনুপ্রাসের ছড়াছড়িও আছে। আবার লৌকিক ভাষারও প্রয়োগ আছে।

আর একটী কথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় পূর্ব্বে সাগরী ভাষাই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু সহজ বাঙ্গলার দিকে আকৃষ্ট হইলেন অনেকটা রাধানাথ শিকদার মহাশয়ের সাহচর্য্যে।

বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এবং তাহার পরে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজীভাবে অনুপ্রাণিত যুবকগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে এমন কিছু আর বাহির হয় নাই। ইহার পরেই ১৮৬৩-৬৫ সালে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিত হয়। গুপ্ত কবি পরলোকগমন করেন ৯৮৫৮ সালে। আবার সেই বৎসরই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' বাহির হয়। সত্য বটে, ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি প্রভৃতি আলোচিত হইত, কিন্তু ইহারও ভাষা সাগরীভাষা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই যুগসন্ধিকালে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপে সাগরীভাষার সংস্কৃত-বহুল শব্দ এবং আলালী ভাষার যে সমস্ত দোষ ছিল তাহা বর্জ্জন করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-রাজ্যে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায়

অপূর্ব্ব ভাষার প্রবর্ত্তন করেন, আর কিরূপেই বা সংস্কৃতাভিলাসী ব্যক্তিগণ প্রথমে পরিহাস করিলেও পরে তাঁহার অনুবর্ত্তী হন, আবার কিরূপেই বা টেকচাঁদ ঠাকুর পর্য্যন্ত বঙ্কিমী ভাষা গ্রহণ করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের "জীবন পরিচয়ে" তাহাই প্রথম ও প্রধান বিষয়। আমরা যথাসাধ্য তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গদ্য রচনা

স্বর্গীয় অক্ষয় সরকার মহাশয়, ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত 'ললিতা ও মানস' কবিতার বিজ্ঞাপনটী প্রথম গদ্য রচনা মনে করিয়া উহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। সে সমালোচনার সহিত আমরা নিশ্চয়ই একমত, কিন্তু অক্ষয় বাবু বোধ হয় জানিতেন না যে, উহার চারি বৎসর পূর্ব্বেও প্রভাকরেই বঙ্কিম বাঙ্গলা গদ্য লিখিতেন। এইখানে আমরা দুই একটী রচনার উল্লেখ করিব—

সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার, ১২ই বৈশাখ ১২৫৯
২৩শে এপ্রিল, ১৮৫২*

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত—

"গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পাসঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহ:রহ: বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদাপ্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বুপম জীবনে চন্দ্রার্কসদৃশ চিরস্থায়ীজ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করেনা যে সে সব উৎসব শব হইলে কি হইবে এবং পরমনিধি প্রিয় পিতা পরাৎপরের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে তাঁহার সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে কদাপিও মূঢ় মানবমণ্ডলী মনোমধ্যে মুহূর্ত্তেকও বিবেচনা করেনা যে তাহারা

*প্রথম পদ্য রচনা বাহির হইয়াছিল ইহার দুই মাস পূর্ব্বে ১৪ই ফাল্গুন ১২৫৮ সালে আর তাহারও পূর্ব্বে "সাধু রঞ্জনে" কবিতা বাহির হইত।

কি অনিত্য পদার্থ প্রযত্নপুরঃসর প্রতিপালন করিতেছে এখন যে দেহে ধূলিকণা পতনে পাষাণ প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশু সেই দেহ শ্ব-সমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক, এখন যাহার রাজীব রাজি বিরাজিত শয্যাতেও নিদ্রা হয় না, জীবনান্তে সে ধূলি কর্দ্দম অস্থিকণাকীর্ণ লক্ষ লক্ষ রক্ষো, যক্ষ, ভূত, প্রেতাদির বাসস্থান শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবেক। এবং যে অঙ্গ কোমল কমল স্পর্শনে বিশীর্ণ হয় সে অঙ্গে গৃধিনী চঞ্চু আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবেক যে লপনেন্দু শত শত শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অম্বুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রস পান না করিয়া অন্য রস পান করেনা, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক। অতএব হে মানবগণ অনিত্যযত্নে ক্ষান্ত হও।

শ্রী ব চ চ

হুগলী কলেজ

এই গদ্য রচনায় সম্পাদক স্বয়ং মন্তব্য করেন—

"ইঁহার লিপি নৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন এবং অক্ষরগুলীন স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।"

ইহার পরেও ২৮শে আষাঢ় ১২৫৯ এর প্রভাকরে—"বর্ষাঋতু" সম্বন্ধে গদ্য রচনা বাহির হয়। স্বাক্ষর থাকে*—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—হুগলী কলেজ।

১৪ বৎসরের রচনা হইলেও, ইহা এই কঠিন বাঙ্গলা আর ইহা হইতে ক্রমে কিরূপে সহজপাঠ্য সরল বাঙ্গলা লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ক্রম-বিবর্ত্তন পাঠকের অনুধাবনা করা কর্ত্তব্য।

*১৩৩৩ কার্ত্তিক 'মানসী মর্ম্মবাণী'তে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এই দুইটী গদ্য রচনাও প্রকাশ করিয়া ধন্যার্হ হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পঞ্চদশবয়সে, বঙ্কিম সেক্সপিয়র বুঝিতেন না সত্য, কিন্তু প্রতীচ্য কবিগণের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তিনি "ললিতা ও মানস" নামে কবিতা লিখিয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে সিনিয়ার বৃত্তিলাভ করিয়া বঙ্কিম ঐ টাকায় কবিতা দুইটী মুদ্রাঙ্কিত করেন। ইহাই বঙ্কিমবাবুর প্রথম গ্রন্থ—

এইভাবে প্রকাশিত হয়—

"ললিতা" পুরাকালিক গল্প—
তথা "মানস,"

ইহা কলিকাতা বৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ-যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হয়। এই পুস্তক সম্বন্ধে বঙ্কিম স্বয়ং লিখিয়াছেন—

"প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারিতে পচে—বিক্রয় হয় নাই। ছয়খানি পুস্তক মাত্র বিক্রয় হয়।" প্রভাকর বিদ্রূপ করিয়া উহাকে 'ভুলুয়ার প্রলাপ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। পুস্তকখানি কেহই পড়ে নাই। যাহা হউক পরিণত বয়সে ঐ কবিতা দুইটী পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। 'মানসের' অতি সামান্য পরিবর্ত্তন হয়, 'ললিতার' অধিক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কবিতা দুইটীতে লেখকের কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পুনর্মুদ্রণ কালে বঙ্কিম লিখিয়াছেন—"বাল্যকালে কিরূপ লিখিয়াছিলাম তাহা দেখাইয়া বাহাদুরী করিবার ভরসা কিছুমাত্র নাই, কেননা অনেকেই অল্প বয়সে এরূপ কবিতা লিখিতে পারে। যাহা অপাঠ্য তাহা বালক প্রণীত হউক বা বৃদ্ধ প্রণীত হউক, তুল্যরূপে পরিহার্য্য।"

বঙ্কিমের পাঠ্যকালে অণুপ্রাসের খুব বাড়াবাড়ি ছিল। কথায় • অণুপ্রাস, কবিতায় অনুপ্রাস। আর সর্ব্বত্রই কবির লড়াই, কিন্তু

অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গদ্য রচনা।

অচিরে হাওয়া ফিরিল, লেখকেরা পদ্য ছাড়িয়া গদ্য ধরিলেন। বঙ্কিমের প্রতিভাও গদ্যাভিমুখী হইল।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়স হইতে অষ্টাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বঙ্কিমবাবু বিশেষ কিছুই লেখেন নাই। কেবল কয়েকটী ইংরেজী কবিতা ও 'রঙ্গিণী' নামে ইংরেজী ভাষায় একটী গল্প লিখিয়াছিলেন। গল্পটি তখনকার Literary Gazetteএ প্রকাশিত হইয়াছিল। কাপ্তেন ডি, এল রিচার্ডসন এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কাপ্তেন সাহেব প্রেসিডেন্সি কলেজের (হিন্দু কলেজের) তখন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজে তাঁহার যশ ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। সুতরাং তাঁহার সম্পাদিত গেজেটে বঙ্কিমবাবুর রচনা প্রকাশিত হওয়ায় তাহা এ অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে শীঘ্র শীঘ্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র একটী ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বরচিত জীবন-টিকায় লিখিয়াছেন যে, এই গল্পের নামটী তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন ও পাণ্ডুলিপি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান, ইউরোপীয় মিশনারী এবং পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও এরূপ আর ২।১ জন ব্যক্তি লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সভা এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছিল যে, যদি কোনও লেখক বাঙ্গালী জনসাধারণের পাঠোপযোগী কোনও মৌলিক পুস্তক লিখিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে উক্ত সভা তাঁহাকে দুইশত টাকা পারিতোষিক দিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই সভার নিকট একখানি নভেল লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সভা ঐ পুস্তক অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু পুস্তকখানি নামঞ্জুর করিবার সময় উক্ত সভার সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছিলেন—পুস্তকখানি অনেকটা আশাপ্রদ হইয়াছে, সুতরাং লেখক মহাশয় যেন আর

একখানি গ্রন্থ লিখিয়া পাঠান। এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বঙ্কিমবাবু আর একখানি নভেল লিখিয়া উক্ত সভায় প্রেরণ করেন। সেখানিও নামঞ্জুর হয়। ইহার একস্থানে চুরি কি ডাকাতির বর্ণনা ছিল। সভা সেই অজুহাতে সিদ্ধান্ত করিলেন—ইহাতে অতি ভীষণ ব্যাপার বর্ণিত আছে, সুতরাং ইহা সাধারণের পাঠের অযোগ্য। আর একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী বঙ্গভাষায় পিটার দি গ্রেটের একখানি চরিত লিখিয়া এই সভার নিকট প্রেরণ করেন, আর তাহার পরই বাঙ্গালার একজন খ্যাতনামা ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হয়েন। ইঁহার পুস্তকখানিও সভাকর্ত্তৃক যথারীতি অগ্রাহ্য হইয়াছিল। সভার সম্পাদক মহাশয় কতকগুলি ইংরাজী আষাঢ়ে গল্পের অপদার্থ অনুবাদ করিয়া ঐ পারিতোষিক লইয়াছিলেন এবং কোনও কোনও সদস্য ইংরেজী হইতে অপাঠ্য অনুবাদ করিয়া পুরস্কার লইতেন। ঐ সকল অনুবাদ এত জঘন্য হইত যে, তাহা পাঠ করা দুঃসাধ্য, সম্ভবতঃ কেহই উহা পাঠ করিত না। সভা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচার না করিয়া সংহার করিতেছেন—সুতরাং তাঁহারা এই সময়ে বুদ্ধির কাজ করিয়া সভাটী তুলিয়া দিলেন।

বঙ্কিমের এই দুইখানি উপন্যাস ভবিষ্য রচনার হাতেখড়ির ন্যায় ফলদায়ক হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়।

বঙ্কিম বাবুর এই দুইখানি অগ্রাহ্য উপন্যাস আর নাই। সুতরাং সেই দুইখানির দোষগুণ জানিবার উপায় নাই। তবে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে (অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে) তিনি ললিতা ও মানস মুদ্রাঙ্কণ-সময়ে যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, তাহার গদ্য বিজ্ঞাপনটী পাঠকের নিকট উপস্থিত করা কর্ত্তব্য—

বিজ্ঞাপন

"সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয় মানসমাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিলনা কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবার তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনাজনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।

গ্রন্থকার।"

দেখা যাইতেছে যে, গত চারি বৎসরকাল মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য রচনায় বিশেষ কোন উন্নতিই লাভ করিতে পারেন নাই। সত্য বটে এখনও 'আলালের ঘরের দুলাল' বাহির হয় নাই, বা 'সোম প্রকাশ'ও প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু একযুগ পূর্ব্বে অক্ষয় কুমার দত্তের প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাই বাঙ্গলা-গদ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'চরিতাবলী' (১৮৪৯) বোধোদয় ও বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশিত হইয়াছে। অক্ষয়দত্তের চারুপাঠ ও 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের ভবিষ্যতের আশা সূচিত করিয়াছে ; এমন কি তাঁহার নিজ গ্রামের পরপারেই 'এডুকেশন গেজেট'ও বাহির হইয়াছে, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার রাজেন্দ্রলাল মিত্র গদ্যগ্রন্থ লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সাহিত্যের প্রসার এখন আর কেবল কবিতায় সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বর গুপ্তের সহিত ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের নাম সমানে ঘোষিত হইতেছিল। কিন্তু সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র

প্রথম যৌবনে তৎকালীন গদ্য-সম্পৎ যে একেবারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। অক্ষয় বাবু বলেন ঃ—

১। এক সময়ে বাঙ্গলা গদ্যের যিনি শায়েন সা সম্রাট হইবেন, গদ্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই উপেক্ষা বড়ই অদ্ভুত বিষয়। বোধ হয় এই সময়ে ইউরোপের কবিকুঞ্জ হইতে অপূর্ব্ব ভাবকুসুম চয়ন করিতেছিলেন আর কালিদাস ভবভূতির নন্দন কানন হইতে পারিজাত আহরণে রত ছিলেন।"

২। বি, এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এই রচনাটী থাকিলে, সকলেই মনে করিত এটী পরীক্ষক দিগের মনগড়া সদোষ লেখা।

৩। রচনাটী টোল ও আদালতের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। অত্র কবিতা মনোনীত হইবার, ইত্যাদি আদালতী বাঙ্গলা। উপসংহারের কয়েকটী কথায় ("অপেক্ষা নবীন বয়সের……প্রস্তুত নহেন"…) মনে হয় যেন উহা আদালতের অভিযুক্ত আসামী উকীলের শিক্ষামত কাতরতা জানাইতেছে। লেখনীতে আদালতী ঢং জাজ্বল্যমান।

৪। তারপর পণ্ডিতি ঢং আছে। সুকাব্যালোচক, সুত্তীর্ণ, সুরসজ্ঞ প্রভৃতি কথায় ভাষায় পণ্ডিতি প্রবেশ করিয়াছে, অর্থবোধও কম। "পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ়" কথাটীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতির "পদবীতে পদার্পণে" যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা নাই।

অক্ষয় সরকার মহাশয় উক্তরূপ দোষ ত্রুটী দেখাইয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। কারণ কিরূপে এই পণ্ডিতি, আদালতি—না সংস্কৃত না সাগরী, পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত বাঙ্গলা হইতে সাহিত্য সম্রাটের ভাষা সরল প্রাঞ্জল ভাষায় পরিণত হইয়াছিল সেই বিবর্ত্তন ও ও ক্রমবিকাশই এবং এই বিষয়ে বঙ্কিমের সাধনা (কার্লাইলের মতে Indefatigable exertion in pursuit of an object ই প্রতিভা) এই গ্রন্থে আমাদের প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যে লোকের অশ্রদ্ধা

উক্ত বিজ্ঞাপনের পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আর কিছু লেখেন নাই। তিনি এই সময় (১৮৫৮) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, পরিণত বয়স্ক শিক্ষিত দেশীয় সমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছেন, সুতরাং এখন আর তাঁহার পক্ষে বাংলা লেখা সাজেনা। কারণ তদানীন্তন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ তাঁহাদের নিজের মাতৃভাষাকে যত ঘৃণা করিতেন, পরস্বাপহরণ বা পরদারহরণকেও এতটা ঘৃণা করিতেন না। বর্ত্তমান সময়ের ইংরেজগণ সাঁওতাল বা গারোদিগের ভাষাকে যেমন অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তখনকার শিক্ষাভিমানী গর্ব্বিত বাবুর দল ঈশ্বরগুপ্তের "মাতৃসম মাতৃভাষাকে" সেইরূপ অবজ্ঞার ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতেন। কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলা কেতাব পড়িতেছেন, দৃষ্ট হইলে তিনি যেরূপ লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেন, বোধ হয় অতি বড় লজ্জাকর ঘৃণ্য কুকার্য্য করিতে দৃষ্ট হইলেও তাহাকে সেরূপ লজ্জিত হইতে হইত না। যদি কোনও ব্যক্তি সত্য সত্যই বাংলা ভাষার কিছু জানিতেন, তাহা হইলে তাহাকে উহা অতি যত্নে, অতি সাবধানে আপনার কুলকলঙ্কের কথার ন্যায় গোপন করিয়া রাখিতে হইত। সাবধান! এজুর (educated) দল জানিতে পারিলে আর রক্ষা নাই। এমন কি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটও বাংলা পড়ার কথা প্রকাশ করা নিরাপদ ছিল না। এই সময়কার ও তদ্‌পরবর্ত্তীকালের অবস্থা পাঠক বঙ্কিমের "বঙ্গ-সাহিত্যের আদর" নামক ব্যঙ্গনাট্য পাঠ করিলে কিছু পরিচয় পাইবেন। উচ্চ দরের উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু ভার্য্যার অনেক অনুরোধ কাকুতিতে পড়িলেন—

"সন্ধ্যা-গগনে, নিবিড় কালিমা।"

পড়িয়াই বলিলেন "তোমার কাছে অভিধান আছে?"

ভার্য্যা—কেন, কোন্ কথাটা ঠেকিল ?

উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি—গগন কাকে বলে ?

ভার্য্যা—গগন বলে আকাশকে।

উচ্চ—নিবিড় কালিমা—নিবিড় কাহাকে বলে ?

ভার্য্যা—ও হরি ! এও জান না ? তোমার মুখ দেখাতে লজ্জা করেনা ?

উচ্চ—কি জান বাঙ্গলা ফাঙ্গলা ও সব ছোট লোকে পড়ে, ওসব আমাদের শোভা পায় ?

ভার্য্যা—কেন তোমরা কি ?

উচ্চ—আমাদের হলো Polished Society. ও সব বাজে লোকে লেখে, বাজে লোকে পড়ে,—সাহেব লোকের কাছে দর নেই—Polished Societyতে কি ও সব চলে ?

ভার্য্যা—তা মাতৃভাষার উপর পালিশ ষষ্ঠীর এত রাগ কেন ?

উচ্চ—আরে মা ম'রে কবে ছাই হয়ে গিয়েছেন—তাঁর ভাষার সঙ্গে এখন সম্পর্ক কি ?

ভার্য্যা—আমারওতো ঐ ভাষা—আমি তো ম'রে ছাই হই নাই !

উচ্চ—Yes for the sake of my jewel, I shall do it—তোমার খাতিরে একখানা বাঙ্গলা পড়ব। কিন্তু mind একখানা বৈ আর নয়।

ভার্য্যা—তাই মন্দ কি ?

উচ্চ—কিন্তু এই ঘরে দোর দিয়ে পড়ব—কেহ না টের পায়…

এইরূপ অবস্থাই তখন হইয়াছিল। রামগোপাল ঘোষ তখন এই এজুর দলের নেতা ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি প্রসিদ্ধ

বাগ্মী ছিলেন। ইংরাজীতে খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারিতেন। কিন্তু কোন সভায় তাঁহাকে বাঙ্গলায় কিছু বলিতে হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় Liberty Hall ইংরাজী শব্দটীর বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার আবশ্যক হইয়া উঠে। তিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন "Gentlemen, this is Liberty Hall, মহাশয়েরা, ইহা হয় স্বাধীনতার দালান।" এই দলের আর একজন মহাপ্রাজ্ঞ একখানি অভিনন্দন পত্রে (address) স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন! কোন রাজপ্রতিনিধি এ দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইবেন এই উপলক্ষে উহা লিখিত হইয়াছিল। একজন ভদ্রলোক ইংরাজী জানিতেন না, তাই উহা কি জানিতে চাহিলেন। যিনি সহি করাইতে যান, তিনি Addressএর অনুবাদ যে অভিনন্দন, তাহা জানিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার স্মৃতিশক্তি এমনই বিশ্বাসঘাতকতা করিল যে, বলিবার সময় অভিনন্দন ভুলিয়া গিয়া 'রঘুনন্দন' বলিয়া ফেলিলেন। এইরূপ বাংলা বিদ্যার অনেক উদাহরণ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও "সেকাল ও একাল" নামক বিখ্যাত পুস্তকে দিয়াছেন।

এই সময়ে শিক্ষিত লোকের বাংলা জ্ঞান সম্বন্ধে একটী উদাহরণ দিব। কোন ব্যক্তিকে বক্ষু খানসামা নামক কোনও খানসামার নাম লিখিতে হইয়াছিল। তিনি বক্‌ষু শব্দ কি প্রকারে লিখিবেন ভাবিয়াই আকুল। যদি 'বক্‌ষু' লেখেন লোকে মূর্খ মনে করিবে— কেননা বক্ষু লিখিলেই হইত (ক + ষ = ক্ষ)। আর যদি বক্ষু লিখেন তাহা হইলে লোকে সম্ভবতঃ বক্‌খু উচ্চারণ করিবে। সাত পাঁচ ভাবিয়া ইংরাজী x অক্ষরটীর সহায়তা লইয়া নিঃসঙ্কোচে লিখিয়া ফেলিলেন "বxু।

শিক্ষিত সমাজের এই দুর্দ্দশা, তাহার উপর বাংলা সাহিত্যের অবস্থাও তখন বিশেষ উন্নত ছিল না। আর তাহার উন্নতির বেশী সম্ভাবনাও ছিল না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বাঙ্গলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর বাংলা পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব স্কুলপাঠ্য পুস্তক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণই লিখতেন। যাঁহারা এইরূপ স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিতেন তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইংরাজিতে শিক্ষিতাভিমানীর দল এই স্কুল পাঠ্য পুস্তক ও যাহারা এ সমস্ত লিখতেন তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিতেন। স্কুলপাঠ্য পুস্তক ব্যতীত সাধারণ পাঠ্য পুস্তকও অতি অল্পই বাহির হইত, আর অধিকাংশ গ্রন্থের লেখক সাধারণ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। এ সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় তখন কেবল বাংলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে লেখা অনেকটা সখের উপর নির্ভর ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র ‘আলালের ঘরের দুলাল’ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু নিজের নাম দিতে সাহস না করিয়া ‘টেকচাঁদ ঠাকুর’ নাম দিয়া গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রত্নাবলীর সংক্ষিপ্তসারের ইংরেজী অনুবাদ শেষ করিয়া বাংলায় বাণীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁহার যশ হয় নাই। তাই তখন যাঁহারা বাংলা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া বাণীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন তাহাদের সৎসাহসের খুব প্রশংসা করিতে হয়। তবে একটা কথা এই যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র Journal of Asiatic Societyতে যে সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন সামান্য বাংলা লেখার কলঙ্ক তাঁহার সে যশ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। তবে তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কারণ শিক্ষিত বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট যশ ছিল। কিন্তু কলিকাতা রিভিউতে নানাবিধ প্রবন্ধ লিখিয়া সম্মান

পাওয়া সত্ত্বেও, বাঙ্গলা লিখিতেন বলিয়া প্যারীচাঁদকে বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এরূপক্ষেত্রে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গ্রাজুয়েট শিক্ষাভিমানী, সমাজে যশস্বী, ডেপুটী বঙ্কিম বাবুর পক্ষে কেবলমাত্র ইংরাজী লিখিয়া সম্মান লাভের প্রয়াসই স্বাভাবিক। তাই কয়েক-বৎসর পর্য্যন্ত বাংলা রচনার দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু স্বদেশ ভক্তের পক্ষে, ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে, 'মাতৃসম মাতৃভাষার' প্রতি উদাসীন থাকাই অস্বাভাবিক। তাই আমরা শীঘ্রই বঙ্কিমকে মাতৃবক্ষে ফিরিয়া আসিতে দেখিলাম। বঙ্কিম আসার পরই মাকে রাজরাজেশ্বরীর সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম আর দেখিলাম সে মন্দিরের জাগ্রত অধিনায়ক পূজারী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন অন্য আর কেহই নহেন—এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী অসংখ্য ঋত্বিক বরাভয়করা স্মিতবদনা মাতার উদ্দেশে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া পূজায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে যখন বাংলা গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন সুবর্ণে শ্যামিকার ন্যায় তাঁহার রচনায় অল্পদিনের জন্য ইংরাজি-নবিসীর বিকার জন্মিয়াছিল—প্রথম প্রথম তাঁহার লেখায় কখনও কখনও কঠিন বাংলা আত্মপ্রকাশ করিত, কিন্তু অসামান্য প্রতিভাবলে এবং গুপ্তকবির প্রভাবহেতু ক্রমে ক্রমে উহা বিশুদ্ধ ও সহজ বাংলায় পরিণত হইয়াছিল। তাই দেখিতেছি, ঈশ্বর গুপ্তের ঋণ বাংলা ভাষায় অপরিশোধনীয়। বঙ্কিমও পরে লিখিয়াছিলেন "অনেক প্রয়াসেয় পরে আমি ভাষায় সরলতা লাভ করিয়াছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র

সপ্তম অধ্যায়—চাকুরী, পত্নী বিয়োগ ও পুনরায় দারপরিগ্রহ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে সাহেবের গভর্ণমেণ্ট বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি পিতার অনুমতি লইতে বাড়ী আসেন।

যাদববাবুর ইচ্ছা ছিল না যে, বঙ্কিম কোন চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি তাহার তীক্ষ্ণদর্শিতায় ধারণা করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি ওকালতি ব্যবসায়ে প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও কলিকাতায় উকীলের অবস্থা তত আশাপ্রদ ছিল না। তখনও কলিকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রমাপ্রসাদ রায় ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত সদর দেওয়ানী আদালতে বেশ পশার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও ব্যবসায়ে সুবিধা করিতে পারেন নাই। সময় সময় দ্বারকানাথ ওকালতি ব্যবসা ত্যাগ করিয়া শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিবেন এইরূপও জল্পনা কল্পনা করিতেছিলেন। অধিকন্তু বঙ্কিম শুনিতে পাইলেন—যে তাঁহার একজন সহাধ্যায়ী বা সমসাময়িক ছাত্র ইতিপূর্ব্বে উকীল হইয়া একমাসে সাতসিকার বেশী উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি ওকালতি ব্যবসায় গ্রহণ

করিতে ভয় পাইলেন। এদিকে আবার পিতৃদেব পেন্‌সন লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন, তাঁহার আয় অৰ্দ্ধেকে পরিণত হইয়াছে। যাহা আছে, তাহাও আবার পূজাপার্ব্বণ দান-ধ্যানাদিতে এতই খরচ হইয়া যায় যে প্রায়ই তাঁহাকে ঋণ করিতে হইত। তাই বঙ্কিম পিতাকে সাহায্য করিবার জন্য আশু উপার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। এবং অনিশ্চিতের আশায় না থাকিয়া আপাততঃ চাকুরীটি গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন। অগত্যা পিতাও সম্মত হইলেন।

১৮৫৮ সালের আগষ্ট মাসে যে কয়জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়েন তন্মধ্যে বঙ্কিমই ছিলেন একমাত্র বাঙ্গালী। বাকী তিনজন ছিলেন শ্বেতাঙ্গ S. Nation, A. R. C. Eckfood এবং E. T. Lingham. ৬ই আগষ্টের আদেশে বঙ্কিমের চাকুরী লাভ হয়।*

বঙ্কিম চাকুরী গ্রহণ করিলেন বটে, আর চাকুরীতে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেনও সত্য, কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই ইহাতে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। ক্রমে তাঁহার ভুল বুঝিলেন। একে উপার্জ্জনে কুলাইত না, টানাটানি করিয়া সংসার চালাইতে হইত, তদুপরি শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানগণের সহিত সংঘর্ষে ক্রমেই অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাঙ্গলার দুইজন মহামানবই নিজ নিজ বৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, একজন ঋষি বঙ্কিকচন্দ্র আর একজন সর্ব্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধু যেমন প্রায়ই বলিতেন "It is the greatest tragedy in my life that I have been drawn to a profession which I do not like," তাঁহার জাতীয় মন্ত্রগুরু বঙ্কিম

* Vide Calcutta Gazette 11th August 1858 p. 1607.

চন্দ্রও বহুপূর্ব্বে ত্যক্ত হইয়া প্রায়ই বলিতেন "চাকুরী আমার জীবনের অভিশাপ।*"

যাহাহউক ঘটনাচক্রে এই ভাবেই তাঁহাকে বত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল রাজসেবায় কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল।

চাকুরী লাভ হইলে বঙ্কিম সম্প্রতি আইন পড়া বন্ধ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে দুই বৎসর পড়িয়াছেন, আর এক বৎসরের ক্লাস বাকী রহিল। অতঃপরে চাকুরী জীবনের মধ্যেই সুযোগ বুঝিয়া এক বৎসর ক্লাসে উপস্থিত হন এবং যথাসময়ে বি, এল পাশ করেন। সেই সময়কার আলোচনা আমরা পরে করিব।

এখানে কর্ত্তব্যবোধে বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণের সম্পাদকের একটী ত্রুটী দেখাইতে বাধ্য হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—

"১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বি, এ, পরীক্ষা দিবার পরও বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে থাকেন। ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনি হাজিরা দিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি গোলদিঘীর ধারে একটী বাসা করিয়া থাকিতেন।"

অতঃপরে সম্পাদক অক্ষয় সরকার মহাশয়ের নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করেন—

"প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম।......এখন যেখানে সিটি কলেজ, তাহার পশ্চিম ধারের তেতালা বাড়ী হইতে অর্থাৎ

---

* দিব্যেন্দুসুন্দর "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়াছেন "বঙ্কিম শেষ বয়সে অনুতাপ করিয়াছিলেন, 'আমি মস্ত ভুল করিয়াছি, চাকুরী আমার জীবনের দুর্ভাগ্য।"

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ও লিখিয়াছেন "বঙ্কিম বলিতেন "আমি মনে করি চাকুরী আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দুর্ভাগ্য।"

'নব্য ভারত' ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ।

আপনার বাসাবাড়ী হইতে, আরদালিকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনশ্রেণীর গ্যালারীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন।"

'পিতাপুত্র' "বঙ্গভাষার লেখক," পৃঃ ৫৩৪।

এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদক মহাশয় অক্ষয় বাবুর স্মৃতিকথার প্রতি কটাক্ষ করিয়া মন্তব্য করেন "খুব সম্ভব অক্ষয় বাবু স্মৃতি কথায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনা গুলাইয়া ফেলিয়াছেন।"

অক্ষয়বাবু গুলাইয়া ফেলেন নাই, গোলদীঘিই যত গোলমাল বাধাইয়াছে। বঙ্কিম যে ১৮৫৮ সালে 'গোলদীঘির ধারে' থাকিতেন তাহার কোন প্রমাণ নাই, আর অক্ষয়বাবু সে সময় আইন পড়া কেন, এণ্ট্রেন্সও পাশ করেন নাই, তিনি তখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেন। অতএব ১৮৫৮ সাল সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু সম্বন্ধে কোন কথাই আসিতে পারেনা। অক্ষয় বাবু ১৮৫৮ সালের বিষয়ে গোল করেন নাই, তিনি ১৮৬৭ সালের কথাই বলিয়াছেন।

আইন পড়ার দশ বৎসর কাজ করিবার পরে, ১৮৬৭ সালে তাঁহার আইন পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা হয়। তখন তিনি গোলদীঘির কাছে থাকিতেন। কেন ইচ্ছা হয় সে কারণ যথাসময়ে বিবৃত করিব। প্রবীণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আরদালীসহ প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর গ্যালারীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। আর অক্ষয়বাবুও ১৮৬৭।৬৮ সালে আইন ক্লাশের থার্ড ইয়ার ক্লাসেই পড়িতেন। তাই উভয়ের এক সঙ্গে পড়ার কথা। আর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ঐ সময়ে থার্ড ইয়ারে আইন পড়িতেন ও অধ্যাপকের অনুমত্যনুসারে তাঁহার অনুরোধে মাঝে মাঝে রেজিষ্টারী লইতেন। সুতরাং অক্ষয়বাবুর এই স্মৃতি কথাটী অতি স্পষ্ট, সরল ও পরিষ্কার ঘটনাজ্ঞাপক।

আর একটী কথা। বঙ্কিম ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্তই হাজিরা দিয়াছিলেন কিনা ঠিক বলা যায়না। বি, এ, পরীক্ষার পরেই প্রেসিডেন্সি কলেজের দীর্ঘাবকাশ। তাহার পর কলেজ কবে খুলিয়াছিল এবং তারপরেও বঙ্কিম আসিয়া কলেজে পড়িয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন প্রমাণ নাই। তবে ৬ই আগষ্টের আদেশে তাঁহার চাকুরী হওয়ার পরেই তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া নাম withdraw করিয়া রাখেন এবং পরে যেটুকু বাকী ছিল ১৮৬৭-৬৮ সালে শেষ করেন। এবং উক্ত প্রেসি-ডেন্সি কলেজ হইতেই আইন পাশ করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের Old Students' Register এতেও সগৌরবে লিখিত আছে—

"Bankim Chandra the greatest of Bengali novelists, regarded as the father of Modern Bengali Prose."

Book II Page 100.

আমরা বঙ্কিম জীবনীতে এই প্রশংসাবাদের সত্যতা প্রমাণিত করিতে সঙ্কল্প করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিম চাকুরী পান ৬ই আগষ্ট, আর তাঁহার সঙ্গে যিনি বি, এ, পাশ করিয়াছিলেন সেই যতুনাথ বসু,* চাকুরী পান ঐ বৎসরের ২৩শে সেপ্টেম্বর। বাবু গৌরদাস বসাক ও ভগবানচন্দ্র বসু (স্যার জগদীশ বসু মহাশয়ের পিতা) ও যতুবাবুর সহিত একই সময়ে চাকুরী পান। কার্য্যক্ষেত্রেও বঙ্কিম যতুবাবু অপেক্ষা কিরূপ অধিক কৃতকার্য্য হন—তাহার প্রমাণ বঙ্কিম দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটী

* ইঁহার বাড়ী গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। ইঁহার পুত্র বাবু শরৎচন্দ্র বসু সবজজের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং পৌত্র শ্রীযুক্ত শেখর বসু এখন হাইকোর্টের গভর্ণমেণ্ট-কৌসিলি।

ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হন ১৮৭০ সালের নবেম্বর মাসে, আর যদুনাথ সেই শ্রেণীতে উন্নীত হন ১৮ বৎসর পরে ১৮৮৮ সালের নভেম্বর মাসে। তাই বলিতেছিলাম বঙ্কিম আপনার সঙ্গী ছাত্রগণকে কেবল পড়া-শুনায়ই অতিক্রম করেন নাই, চাকুরীতেও তাঁহাদিগকে,—এমন কি যদুনাথকেও—অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বঙ্কিম প্রথমেই যশোহর সহরে কাজ করিবার নিয়োগ-পত্র পান (৬ই আগষ্টের আদেশ), এবং এখানে ১৭ মাস থাকেন। আদেশ পূর্ব্বে হইলেও অনুমান ২৩শে আগষ্ট হইতে তিনি যশোহরে কাজ আরম্ভ করেন। শচীশবাবু লিখিয়াছেন—

"যশোহর রওনা হইবার পূর্ব্বে তিনি জননীকে প্রণাম করিয়া কতকটা পাদোদক একটী শিশিতে ভরিয়া লয়েন। জননী বলেন 'কর্‌লি কি, গঙ্গাজল আমার পায়ে ঠেকালি ?"

বঙ্কিম ছল্‌ছল্‌ নয়নে উত্তর করেন "মা, তোমার চেয়ে কি গঙ্গা বড় ?"

পরে বঙ্কিম পিতৃ-চরণে বিধৌত জলও শিশি ভরিয়া উহাই সম্বল করিয়া বিদেশে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন।"

শচীশচন্দ্র আরও লিখিয়াছেন—"বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনদের ছাড়িয়া সুদূর যশোহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আর একজনকে ছাড়িয়া গেলেন; আমি তাঁহার রূপযৌবনশালিনী, সর্ব্বগুণময়ী সহধর্ম্মিনীর কথা বলিতেছি। তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণ ফাটিয়া গেল।"

ষোড়শ বর্ষীয়া স্ত্রী মোহিনী দেবীকে ফেলিয়া যাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণে যে খুব বাজিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। স্ত্রীর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, বঙ্কিম 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বর্ণনা করিয়াছেন—

"ভ্রমর শুনিল, মেজবাবু দেহাতে যাইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব। কাঁদাকাটি হাঁটাহাটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না।"

"ভ্রমর আগে মাটীতে পড়িয়া কাঁদিল, তারপর উঠিয়া 'অন্নদামঙ্গল' ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল,—চাকরাণীর খোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল—ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল—এইরূপ নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।"

যশোহরের স্মৃতি বরাবর বঙ্কিমচন্দ্রের মনে জাগরূপ ছিল। যশোহরের মাগুরার অন্তর্গত প্রসাদপুর, চিত্রানদী ও নীলকুঠী আর অন্যত্র ঝিঁকারগাছার নিকটবর্ত্তী ডাকাতিয়া দীঘি তাঁহার তুইখানি পুস্তকেই তিনি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। "কৃষ্ণকান্তের উইলে" আছে—

"ধীরে ধীরে শীর্ণ শরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বত্থ, কদম্ব, আম্র, খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল, দয়েল, পাপিয়া ডাকিতেছে, নিকটে গ্রাম নাই। প্রসাদপুর নামে একটী ক্ষুদ্র বাজার প্রায় একক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্য সমাগম নাই দেখিয়া, নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া, পূর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠী প্রস্তুত করিয়াছিল।"

এই প্রসাদপুরের নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে, এখনও নীল জ্বাল দিবার চুল্লীর চিহ্ন আছে কিন্তু একদিন নীলকরের দোর্দ্দাণ্ড প্রতাপ অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছিল। আর ডাকাতিয়া দীঘি সম্বন্ধে বঙ্কিম "ইন্দিরা"তে লিখিতেছেন—

মহেশপুর হইতে মনোহরপুর যাইতে পথে এক বৃহৎ দীঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় আধক্রোশ। পাড় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারিপার্শ্বে বটগাছ। তাহার ছায়া শীতল, দীঘির জল নীল

মেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম অতি বিরল। ঘাটের উপর একখানি গ্রাম আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।

দীঘিতে লোকে একা আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এইজন্য লোকে "ডাকাতে কালাদীঘি" বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সর্দ্দার বলিত।

বঙ্কিমের সময় গদখালীতে একটী থানা ছিল। তাহার পার্শ্বস্থ দীঘি উপলক্ষ করিয়াই উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। এখন গদখালীতে থানা নাই, তিন মাইল দূরে ঝিঁকারগাছায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

বঙ্কিমের সময়, এই কালাদীঘির যেরূপ যেরূপ খ্যাতি ছিল, ইন্দিরাতে সেইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। শুনিয়াছি দীঘিতে নাকি ১৮৯০-৯১ সালে জেলেরা মাছ ধরিতে গিয়া মড়ার মাথা তুলিয়াছিল।

কিন্তু এইতো গেল স্থানের স্মৃতি। যশোহরে বঙ্কিম এমন এক অমূল্য সুহৃদ রত্ন লাভ করিয়াছিলেন যে তাহার স্মৃতি চিরকাল বঙ্কিমের জীবন মধুরিমাময় করিয়া রাখিয়াছিল। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র তখন যশোহরে পোষ্ট আফিসের এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিতেছিলেন। এই যশোহরেই উভয়ে একত্রে মিলিত হন। ইতিপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন কলেজে অধ্যয়নকালে উভয় বন্ধুর মধ্যে যে কবিতা-যুদ্ধ হইত তাহার বিবরণ পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদান করিয়াছি। সখ্য পূর্ব্বেই হইয়াছিল, এবার সাহচর্য্য ঘটিল। দীনবন্ধুর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই সখ্য দৃঢ় ও অটুট ছিল। এবং তাঁহার অকাল-মৃত্যুর পরও (১৮৭৩, নবেম্বর) বঙ্কিমচন্দ্র জীবনে দীনবন্ধুর শোক কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

ছাত্রাবস্থায় দীনবন্ধুর সহিত অসাক্ষাতে যে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ আরম্ভ হইয়াছিল, শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছিল। দীনবন্ধু বড়ই ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। এই সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"দীনবন্ধু একবার সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কাছাড় গিয়াছিলেন। সেখানকার একজোড়া উৎকৃষ্ট জুতা বঙ্কিমের জন্য আনিয়া বঙ্কিমকে পাঠাইয়া দেন ও তিনছত্রে লিখিয়াছিলেন "বঙ্কিম কেমন জুতো"। বঙ্কিম জুতা পাইয়া খুব হাসিয়াছিলেন এবং উত্তরে লিখিলেন "তোমার মুখের মত"।

দীনবন্ধু বঙ্কিম অপেক্ষা নয় বৎসরের বড় ছিলেন, তথাপি তাঁহারা ছিলেন এক আত্মা এক প্রাণ! এইরূপ একাত্মবোধ অতঃপরে বঙ্কিমও জগদীশনাথ রায়ের মধ্যে হইয়াছিল। অথচ জগদীশ ছিলেন বঙ্কিম অপেক্ষা চৌদ্দ বৎসরের বড়। বয়সে কি করে?

> "তাঁহারই নিয়মে প্রাণেপ্রাণে অপূর্ব্ব বন্ধন
> প্রাণ বোঝে কোথা তাঁর টান!"

বস্তুতঃ এইরূপ বন্ধুত্ব ক্বচিৎ দেখা যাইত। দীনবন্ধুর মহাপ্রয়াণের প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে (১৮৭২, এপ্রিল) বঙ্কিম বহরমপুর হইতে 'বঙ্গদর্শন' বাহির করেন। লেখক শ্রেণীর মধ্যে দীনবন্ধুর নামই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। অথচ বঙ্গদর্শনে দীনবন্ধুর মহাপ্রয়াণের কোন উল্লেখ নাই, কোনরূপ সহানুভূতি নাই, কোন বিলাপ নাই। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বঙ্কিমকে দোষারোপ করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। কিন্তু চারি বৎসর পরে (১২৮২ চৈত্র) বঙ্গদর্শনের বিদায়কালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় বক্ষের রক্ত মোক্ষণ করিয়া লেখেন—

"আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে তাঁহার

নামোল্লেখ করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক, আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গী। সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।"

দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র যশোহর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"দীনবন্ধুর হৃদয়ের অসাধারণ গুণ এই ছিল যে, যাহার দুঃখে সে যেরূপ কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন। একদা তিনি যশোহরে আমার বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রে তাঁহার কোন বন্ধুর কোন উৎকট পীড়ার উপক্রম হইল। যিনি পীড়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন, তিনি দীনবন্ধুকে জাগরিত করিলেন এবং পীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শুনিয়া দীনবন্ধু মূর্চ্ছিত হইলেন। যিনি স্বয়ং পীড়িত বলিয়া সাহায্যার্থ দীনবন্ধুকে জাগাইয়াছিলেন, তিনিই আবার দীনবন্ধুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা আমি স্ব চক্ষে দেখিয়াছি। সেইদিন জানিয়াছিলাম যে, অন্য যাহার যে গুণ থাকুক পরের দুঃখে দীনবন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হইত না। সেই গুণের ফল নীলদর্পণ।"

দীনবন্ধুর সুযোগ্য পুত্র ললিত মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—

"উভয় বন্ধুর মধ্যে বন্ধুত্ব অপূর্ব্ব রকমের ছিল। কখনও কেবল উভয়ে দুইটী গুড়গুড়ি লইয়া ধূমপান করিতেন এবং পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এইরূপভাবে বহুক্ষণও কাটিত। বলাবাহুল্য কখনও কখনও উভয়ের হাস্যালাপ কিঞ্চিত উদ্দাম ভাবও ধারণ করিত।"

নারায়ণ, ১৩২২ বৈশাখ।

এই 'নীলদর্পণ' রচিত হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'রও পূর্ব্বে, তবে নীলদর্পণে যে সাহেবদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারের উল্লেখ হইয়াছে তাহা কতক যশোহরের নীলকুটীর সাহেব দিগের অত্যাচার কাহিনী অবলম্বনে, কতক জাতীয় হৃদয় বিশিষ্ট বঙ্কিমের সাহচর্য্যের ফলে। উভয়েই জাতীয় হৃদয়বিশিষ্ট ছিলেন এবং উভয়েই আফিসের বা সাহেব সুবার কথা কহিতে ভাল বাসিতেন না। ঐরূপ কথোপকথন তাঁহাদের ভালই লাগিত না। কিন্তু দেখা যাইত যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্রেই মজলিসে বসিলে সাহেবের কাজ কর্ম্মের কথা ও আফিসের কাজ কর্ম্মের কথা না কহিয়া সোয়াস্তি পাইতেন না। এক রাত্রিতে কোনও ডেপুটীর বাড়ীতে একটা ভোজ ছিল; ডেপুটীতে ডেপুটীতে ঘর পুরিয়া গিয়াছিল; বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারাও উপস্থিত ছিলেন; একজন প্রসিদ্ধ ডেপুটী ইহার কিছুপূর্ব্বে লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; তাঁহার সহিত কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা এই সভাতে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিতে-ছিলেন। তাহার কথা শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন ঃ—

"ধন্য এক জনা হয়েছে,
পেখের কলম কানে' দিয়ে সাহেবের সঙ্গে কথা কয়েছে"

আর একজন ডেপুটী কর্ত্তৃপক্ষের তিন বৎসরের কাজ কিরূপে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া দেড় বৎসরের মধ্যে শেষ করিয়াছিলেন, সকলের কাছে যখন আস্ফালন করেন, দীনবন্ধু উত্তর করেন—

"ওহে, তবে তুমিই বুঝি ত্রেতাযুগে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলে!"

ডেপুটীবাবুরা দীনবন্ধুকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন; তাঁহার নিকটে বড় ঘেঁসিতেন না। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র বলেন—নানাকারণে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাহারা বড় আনুগত্য করিতেন।

এইরূপ সহানুভূতিশীল, পরদুঃখকাতর জাতীয় হৃদয় বিশিষ্ট দীনবন্ধুর সাহচর্য্য চাকুরী লাভের প্রথম অবস্থায়ই বঙ্কিমের চরিত্রের উপরও যে কিছু প্রভাব বিস্তার করে নাই, তাহা বলা সুকঠিন।

কিন্তু যশোহর থাকিতে বঙ্কিম এক গম্ভীর শোকাঘাত পাইলেন। তাঁহার বাল্যসঙ্গিনী প্রাণসমপ্রিয়া সহধর্ম্মিণীকে তিনি চিরকালের জন্য হারাইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্কিম একখানা পত্রে লিখিয়াছিলেন "তোমাকে শীঘ্রই এইখানে আনাইব।" বধূ এই পত্রখানা আনন্দে বাড়ীর সকলকেই দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আনন্দ পূর্ণ হইবার সুযোগ আর হইয়া উঠিল না। কয়েকদিনের জ্বরেই ষোড়ষবর্ষ বয়সে এই দেবদুর্লভ স্ত্রী-রত্ন অকালে শুকাইয়া যায় (১৮৫৯, জুন—জুলাই)। অসুখের খবর পাইয়া বঙ্কিম বাড়ীর দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা আর পাইলেন না। নিকটবর্ত্তী ষ্টেসনে পিতৃদেব ও সঞ্জীবচন্দ্র দেখা করিতে আসেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া বঙ্কিম গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিন্তু বাড়ী আর আসিলেন না। কাহারও সম্মুখে একফোঁটা অশ্রুজলও ফেলেন নাই। যে কাণের দুল দুটী, সোণার কাঁটা তিনি স্কলারসিপের টাকা হইতে স্ত্রীকে দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতে ভ্রাতাকে অনুরোধ করিয়া আবার যথাস্থানে ফিরিয়া গেলেন।* স্বচিত্রিত পক্ষিণীর মতই হতাশ হৃদয়ে দেখিলেন, "বৃক্ষ নাই, বাসা নাই, শাবক নাই,—দগ্ধ হৃদয়ে দগ্ধ বনের উপরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।"

বিষবৃক্ষ, ৩২ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তিনি আবার বাড়ী আসিলেন। সময়টা শ্রাবণ কি ভাদ্র মাস। স্থিরভাবে পৌরবর্গের সহিত কথাবার্ত্তা

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দু সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি। দিব্যেন্দু সুন্দরও প্রায় এইরূপই বলেন।

বলিলেন বটে, কিন্তু পত্নীর স্মৃতি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত তাঁহার শোকরাশি উথলিয়া উঠিল। পাঠক 'বিষবৃক্ষে' সূর্য্যমুখীর জন্য নগেন্দ্রনাথের শোক একবার মনে করিয়া দেখুন। বঙ্কিম এইভাবেই স্ত্রীর জন্য কাঁদিয়াছিলেন*—

"নগেন্দ্র কক্ষমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। রাত্রি অতি ভয়ানক...নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া একখানি সোফার উপর শয়ন করিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাহাতে বসিয়া কত যে কাঁদিলেন তাহা কেহ জানিল না। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেদিকে চাহেন—সেই দিকেই সূর্য্যমুখীর চিহ্ন।

(বিষবৃক্ষ, ৪৪, অধ্যায়)

বঙ্কিম অবশিষ্ট জীবনে একদিনের জন্যও এই স্ত্রীকে ভুলেন নাই আর একদিনের জন্যও কাহাকেও এই নামটীও করেন নাই। তবে পূর্ব্ব রচিত উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর ছায়া অনুমানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, আর উত্তরকালে নিজ জীবনে তিনি প্রকৃতই এই স্ত্রীর ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রায় তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত "কে ঐ সধবা মেয়েটী আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে?"† শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র) মহাশয়ও সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের সেবা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে প্রায়ই বলিতেন

* শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এইরূপই বলেন। তিনি তাঁহার পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের কাছে শুনিয়াছিলেন। আমাদেরও তাহা প্রতীতি হয়।

† শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দুসুন্দরের উক্তি

"তোর সেজদিকে দেখেছি রে, এবার আর উঠ্‌বোনা আমিও এবার তাঁর কাছেই যাবো।"

এই গভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ রেখাপাত করিয়াছিল 'চন্দ্রশেখরে' তাহার স্পষ্ট আভাষ আছে। বঙ্কিম লিখিয়াছেন—

"বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে।*……বালক মাত্রেই কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর। উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাঁহারই পথের ধারে অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই অথচ ভালবাসিয়াছে তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথায় কালক্রমে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতিমাত্র আছে। বাল্য প্রণয়ে কোন অভিসম্প্রাত আছে।"

মোহিনী দেবীর ছায়া "ললিতা" কবিতায় আছে—

(১) 'নাথ ভুজে মাথা দিয়ে পড়েছে মোহিনী'

(২) 'মন্মথ মোহিনী প্রতি কহিছে হে প্রিয়ে'

(৩) ধূলি হয়ে কুঞ্জবনে মন্মথ-মোহিনী নাথ সনে

বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন—"ললিতা পুনর্মুদ্রিত করিলাম"। কেন? বাহাদুরি দেখাইবার জন্য নয়। ইহা পূর্ব্বে বিক্রয় হয় নাই। তবু কেন? বঙ্কিম বলেন, অপাঠ্য বালক প্রণীত হইলেও পরিহার্য্য। তবে? পাঠক কারণ অনুমান করুন। আর ইহা মুনর্মুদ্রিত করিতে তিনি কিছু পরিবর্ত্তনও করিয়াছেন। কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহাতে একটু গোপন ব্যথা নিশ্চয়ই আছে। সম্ভবতঃ অন্ততঃ এটুকু পরিবর্ত্তন—

"ওইখানে দেহাম্বুজ মাটী হয়ে যাবে।
জানিবে কে? দেখিবে কে? কেঁদে কে ভিজাবে?"

*দ্বিবেন্দ্র সুন্দরের উক্তি, সমালোচনী ১ম বর্ষ ২৭৭

আর "ললিতায়" পূর্ব্ব সুখের একটু স্মৃতি আছে—

মোহিনী মন্মথ সনে মনোমত স্থলে।
এমন যামিনী যাপে এমন বিরলে॥
এমন বিপদহীন বিজন কানন।
এমন বিরল প্রেম গভীর এমন॥
কে জানে সে সত্য কিনা স্বপন নিশার।
বনে এলে কে জানিত হেন হবে তার॥
রবেনা এমন সুখ মানব কপালে।
ভাবিয়ে বিচল চিত্ত এ সুখের কালে॥
এই ভয় মনমাঝে হয় আর যায়।
যেন কোন মেঘছায়া পড়িছে ধরায়॥
এই মত লোক নিশি নিকুঞ্জ মন্দিরে।
সে দিন কাটালে সুখে নিশি এলো ফিরে॥

এই স্থানটুকু, হয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, নতুবা ইহা ভাবী বিয়োগের আশঙ্কাজনিত কবিহৃদয়ের মর্ম্মব্যথা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মৃত্যুর বৎসর ভিন্ন জীবনে তিনি এই স্ত্রী সম্বন্ধে কাহারও সঙ্গে আলাপ করেন নাই। মৃত্যুর প্রায় ২৩ বৎসর পরে তাঁহারই উদ্দেশে আপনার গ্রন্থখানি যে উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাতেও নাম বা পরিচয় নাই। কেবল লিখিয়াছেন—

"ক্ব নু মাং ত্বদধীন জীবিতাং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্ন সৌহৃদঃ।........"

"হে ক্ষণভিন্ন সৌহৃদ! আমাকে ফেলিয়া তুমি কোথায় গেলে।"

"কুমার সম্ভবে" স্বামীর জন্য রতি যেরূপ বিলাপ করেন, তিনিও সেইরূপ করিয়াছিলেন।

এই উৎসর্গটী কাহার প্রাপ্য, এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, তাই এখানে একটু আলোচনা আবশ্যক। উৎসর্গপত্রে কেবল উল্লেখ আছে—

"স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধে আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থের এরূপ উৎসর্গ হইল।"

দীনবন্ধুর সুযোগ্য পুত্র ললিত বাবু বলেন "বন্ধুত্ব জীবনের সহিত শেষ হয় নাই বলিয়াই 'আনন্দমঠের' অভিনব উৎসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে।" ললিতবাবু নিশ্চয়ই এই উৎসর্গের আভাষ পূর্ণচন্দ্র হইতে পাইয়াছেন। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের এই অনুমান খাঁটি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আর তিনি উৎসর্গের কথাটী খুব স্পষ্টভাবেও বলেন নাই। 'আনন্দমঠ' লিখিবার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ীতেও খুব কম আসিতেন। আসিলেও এই অন্তর্নিহিত শোকের কথা তিনি কাহাকেও জানিতে দিতেন না। পূর্ণচন্দ্রকেও সম্ভবতঃ নয়।

শ্রীশ মজুমদার মহাশয় বলেন অন্যরূপ কথা। তিনি লিখিয়াছেন "রাখালের যমজপুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। রাখালকে বলিতেন তাদের লইয়া তাঁর আর লেখাপড়া হয় না। একটী ছেলের অভাব হইলে তিনি বালকের ন্যায় অধীর হইয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশে পুস্তক উৎসর্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ!"

সমালোচনী ১ম বর্ষ ১৩০৮ মাঘ ১৩০৯ পৌষ পৃঃ ৮

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীশবাবু শুনিয়াছেন যে উহা অন্ততঃ দীনবন্ধুকে উৎসর্গীকৃত হয় নাই। আর দীনবন্ধুকে বন্ধুপ্রেম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দেখাইতে বঙ্কিম কখনও কার্পণ্য করেন নাই। জীবিতাবস্থায়ই তাঁহাকে 'মৃণালিনী' উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই বঙ্গদর্শনে যে

শোক ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার উল্লেখও পূর্ব্বেই করিয়াছি। তারপরে দীনবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনীও তিনি লিখিয়াছেন। এদিকে আবার শ্রীশ বাবু কথিত মৃত শিশু দৌহিত্রটীর উদ্দেশেও উৎসর্গ করিবার কথা নয়। একে শিশু, তারপরে অনেকদিন অতীত হইয়াছে, আর ইহা সম্ভবও নয়। এই বিষয়ে ব্রজেন্দ্র সুন্দরের অভিমতই মূল্যবান। আমাদেরও মনে হয়, বঙ্কিম তাঁহার মানস কন্যা শান্তিকে মোহিনী দেবীর পবিত্র আশ্রয়েই সমর্পণ করিয়াছেন।

এই স্ত্রীর সম্বন্ধেই 'উত্তর চরিত' আলোচনায় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী. কৈশোরে জীবন-সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, ক্রীড়ার যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ভালবাসুক বা না বাসুক কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে, পত্নী বিসর্জ্জনে তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা, আবার যে রামের ন্যায় ভালবাসে—যে পত্নীর স্পর্শমাত্রে অস্থির চিত্ত, যাহার বাহু বিবাহের সময় হইতে কি গৃহে কি বনে সর্ব্বত্রই শৈশবস্থায় এবং যৌবনাবস্থায় উপাধানের (মাথায় দিবার বালিস) কার্য্য করিয়াছে—তাহার কি কষ্ট, কি সর্ব্বনাশ কি জীবন-সর্ব্বস্ব ধ্বংসাধিক যন্ত্রণা!"

যাহাহউক পিতামাতা বঙ্কিমকে বেশীদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকিতে দিলেন না। পূর্ণচন্দ্র বলেন "বঙ্কিমচন্দ্র পিতামাতার অনুরোধে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন।" তাঁহাদের এই ব্যগ্রতার ভাব বঙ্কিম হরবল্লভের মুখে আরোপ করিয়াছেন, "তুমি পুনর্ব্বার সংসার কর সেটা আমারও ইচ্ছা, তোমার গর্ভধারিণীরও ইচ্ছা। বিশেষ বউমার পরলোকের পর আমরা এ বিষয়ে কাতর আছি।"

অল্পদিন পরে, বঙ্কিম যখন যশোহর হইতে বদলী হইবার মুখে ১৮৬০ সালের জানুয়ারী মাসে বাড়ী আসেন, কয়েকটী পাত্রীর সন্ধান

পাওয়া গেল আর সঞ্জীবচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রকে লইয়া পাত্রীর সন্ধানে ছুটিলেন। বলাবাহুল্য বঙ্কিমকেও সঙ্গে নিতে তাঁহারা ভুলিলেন না।

এই দীনবন্ধু ও সঞ্জীবের মিলন আবার বঙ্কিমজীবনের এক অপূর্ব্ব অধ্যায়। বঙ্কিম নিজে লিখিয়াছেন "সঞ্জীবচন্দ্র যখন কৃষ্ণনগরের (অনুমান ১৮৬৪) দীনবন্ধুও তখন সেইখানে। ইঁহাদের পরস্পর আন্তরিক অকপট বন্ধুতা ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মা ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকটে সমাগত হইতেন; দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক ছিলেন। সরস কথোপকথনের তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত উচ্ছসিত হইত।"

এই দুই সুরসিক বন্ধুর সঙ্গগুণে বঙ্কিমের বিষাদ যে অনেকটা লাঘব হইত—তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাহউক তিনজনে নৌকায় চড়িয়া পাত্রীর সন্ধানে বাহির হইলেন। এক বাড়ীতে একটী মেয়ে দেখিতে গেলেন, মেয়েটী বেশ সুশ্রী। সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি ?"

পাত্রী—আমার নাম মনোরমা।

সঞ্জীব—তোমার মামার বাড়ী কোথায় ? কখনো কি গিয়াছ সেখানে ?

পাত্রী—(ভ্রুভঙ্গী সহকারে) মামার বাড়ী আবার কোথায় ? কি জানি বাপু কখনও যাইনি কিন্তু সেখানে।

সে ভঙ্গী দেখিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিলেন।* বঙ্কিমও সে হাসিতে যোগ দেন। অতঃপরে তাঁহারা দীনবন্ধুর শ্বশুরবাড়ী

* দ্বিব্যেন্দু সুন্দর ও ইন্দুবালা দেবীর উক্তি

বাঁশবেড়েতে গেলে সেখানে কোন্নগরের তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের (পরবর্ত্তী বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ উকীল) নিকট হালিসহরের একটী মেয়ের সন্ধান পান। মেয়েটীর মাতামহী দয়াময়ী দেবী হালিসহরের কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র কন্যা—পিতা তাহাকে কুলীন করিয়া নিজ বাড়ীতেই রাখিয়াছিলেন। দয়াময়ীর কন্যা শ্যামাসুন্দরী ও মোহিনী দেবীও কুলীনের সঙ্গে পরিণীতা হইয়া মাতুলবাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। রাজলক্ষ্মী এই মোহিনী দেবীরই একমাত্র কন্যা, বয়স ১২ বৎসর। রং খুব ফর্সা না হইলেও, মেয়েটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা দয়াময়ী দেবীর সহোদর গোবিন্দ চৌধুরী তখন বাড়ী ছিলেন না, কেবল তাঁহার স্ত্রী নৃত্যকালী দেবী, ভগ্নী দয়াময়ী আর শ্যামাসুন্দরী ও মোহিনী দেবী বাড়ী ছিলেন।

তারাপ্রসন্ন বাবুও* পূর্ব্ব হইতেই সেখানে আসিয়া রহিলেন।

মেয়েটীকে দেখিয়া সকলেই পছন্দ করিলেন এবং সঞ্জীবচন্দ্র শীঘ্রই দিন স্থির করিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহারা উত্তর করেন—

"এত শীগ্গীর আমরা পারবোনা, আমাদের সবইতো গুছাইতে হইবে, বিশেষতঃ কর্ত্তা বাড়ী নাই।"

সঞ্জীব উত্তর করেন "আপনাদের কিছু গুছাইবার প্রয়োজন নাই—শুধু পাঁচটী হরিতকী দিয়াই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। আমার

---

* শচীশবাবু যে লিখিয়াছেন হালিসহরের তারানাথ নামক এক ব্যক্তি বিশেষ ধরিয়াছিল, সে খবর আমরা জানিনা। তবে দিবেন্দ্যু সুন্দর (সমালোচনী ১ম বর্ষ ২৭৭) এবং হালিসহরের চৌধুরী বাড়ীর অতুলকৃষ্ণ রায় (Late Mr. A. K. Roy Deputy Majistrate) দুইজনই তারাপ্রসন্ন বাবুর কথা বলিয়াছেন। তারাপ্রসন্ন বাবু ও সঞ্জীব বাবু উভয়েই এই সময়ে 'ল' কলেজে পড়িতেন।
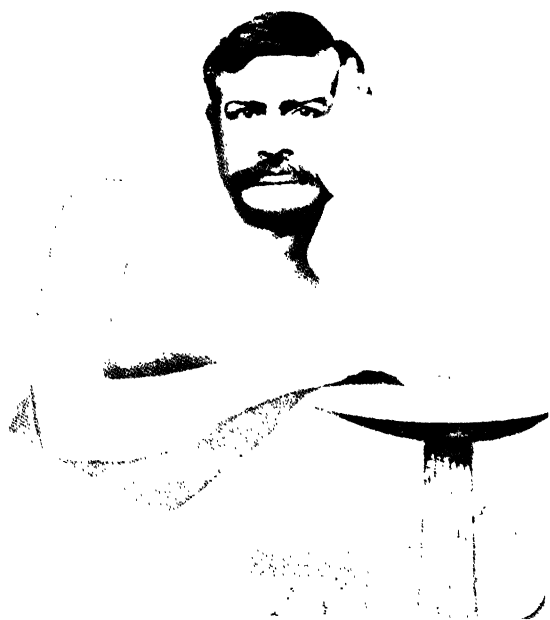
স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভ্রাতার ছুটীর মাত্র অল্পদিন বাকী, আমরা বেশীদিন অপেক্ষা করিতে পারিব না।"

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এখানেই বিবাহ সম্পন্ন হইল, এবং এই রাজলক্ষ্মী দেবীই বঙ্কিমের সুযোগ্যা গৃহিণী হইলেন।

কিন্তু বিবাহ হইবার পরে এই বাড়ীতে একটী দুর্ঘটনা হইল। বাড়ীর কর্ত্তা বিবাহ-রাত্রিতেই হালিসহরস্থ গঙ্গার ঘাটে আসিয়া যখন এই বিবাহের সংবাদ শুনিলেন, তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে গঙ্গাতীর হইতে বাটী পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাইল পথ অনেক কষ্টে ধরিয়া আনিতে হইল। তিনি বাড়ী আসিতেই সকলে আনন্দে বলিলেন—

"রায় বাহাদুরের কৃতী পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ! ইহাপেক্ষা লক্ষ্মীর আর উৎকৃষ্টতর সম্বন্ধ কি হইতে পারে?

গোবিন্দ চৌধুরী—আমার বাড়ীতে আর কে আছে, লক্ষ্মীকে দিয়ে কি ক'রে থাক্‌বো।* তোমরা আমার জন্য ২।১টা দিনও অপেক্ষা ক'রতে পারলেনা?

সকলে—তাঁদের অপেক্ষা করবার সময় ছিল না। আর কাছেই কাঁটালপাড়া। আমরা যখন তখন নিয়ে আস্‌বো।

গোবিন্দ—সেটী আর পার্‌বেনা। ওঁরা বড়লোক, মেয়ে যখন তখন দেবে কেন?

সে রাত্রে বৃদ্ধ আর জলস্পর্শও করিলেন না।

* কুন্দের পিতাও প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। "আর কিছুদিন যাক্, কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব? কি লইয়া থাকিব?" বিবাহের কথা মনে হইলে বৃদ্ধ এইরূপ ভাবিতেন।

অল্পদিন পরেই তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

রাজলক্ষ্মী দেবীর পিতার নাম ছিল সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস বেলেসিক্রি।

বিবাহের পর সকলেই রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। হালিসহরের সে পাড়ায়ও তাঁহার খুব সুযশ ছিল। সকলেই বলিত "কেবল নামই রাজলক্ষ্মী নয়, রূপেও লক্ষ্মী, গুণেও লক্ষ্মী"। বস্তুতঃ এই লক্ষ্মীই সর্ব্বদিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের শান্তিবিধান করিতেন।

বিবাহের পর রাজলক্ষ্মী দেবী নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইলেও মোহিনী দেবীর কাণের দুল দুটী ও সোণার কাঁটা পাইলেন না। বঙ্কিম তাহা নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন; তবে তিনি নব পরিণীতা রাজলক্ষ্মী দেবীকে বলেন—

"এ দুটী এখন আমার কাছেই রইলো। যেদিন তোমায় ভালবাস্‌বো, সে দিন দিব।"

বঙ্কিম দিয়াছিলেন বটে, তবে চারি বৎসর পরে। শরৎ কুমারীর জন্মের তিনমাস পরে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নৌকায় যাইতে লক্ষ্মী দেবীকে রাস্তায় স্বহস্তে উহা পরাইয়া দিয়াছিলেন।

ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীর প্রতি বড়ই অনুরক্ত হইয়া পড়েন। অনুরাগও আবার এত বেশী ছিল যে, বঙ্কিমকে স্ত্রৈণ আখ্যা দিলে খুব অসঙ্গত হইত না। স্ত্রীর প্রভাব তাঁহার প্রতি এতই বেশী ছিল যে তিনি অনেকের কাছে বলিতেন—

"একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহার কথা লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারিনা। আমার যত ভ্রম প্রমাদ তিনি জানেন, আর আমি জানি।"

রাজলক্ষ্মী দেবীর চরিত্র বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখীতে প্রতিভাত হইয়াছে। বস্তুতঃ সূর্য্যমুখীর সহিত তাঁহার এতই চরিত্রের সাদৃশ্য ছিল যে,—যেমন রাশভারিত্বে তেমনি স্বামীভক্তির আধিক্যে, অনেকেই রাজলক্ষ্মী দেবীকে সূর্য্যমুখী বলিয়া জানিত। তিনি এমনি গুণবতী ছিলেন যে, বঙ্কিম যেন নগেন্দ্রনাথের মুখ দিয়া নিজের কথাই বলিতেছেন—

"সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী ? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল ? সংসারে সহায় গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব। আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে! আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানে সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য। আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন ?"

সূর্য্যমুখীর গাম্ভীর্য্য সম্বন্ধেও বঙ্কিম একস্থানে লিখিয়াছেন "পুরবাসিনীরা সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। এমন সময়ে সেইখানে সূর্য্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা একেবারে বন্ধ হইল, অল্প বয়স্কারা সকলেই একটা একটা কাজ লইয়া বসিল।"

বস্তুতঃ রাজলক্ষ্মীদেবীর গাম্ভীর্য্যে বঙ্কিম পর্য্যন্ত সময় সময় ভয় পাইতেন। বঙ্কিম ক্রোধান্বিত হইলে নিজের চুল ছিঁড়িতেন। আর রাজলক্ষ্মীর দেবীর রাগ হইলে চুপ করিয়া থাকিতেন। কেবল তাঁহার চোখের পাতা নড়িত। এই রাগ থামাইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক সাধ্য সাধনা করিতে হইত!

রাজলক্ষ্মী দেবীকে লোকে কেবল সূর্য্যমুখী* বলিয়াই জানিত না, বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় স্ত্রী চরিত্রও পত্নীর প্রভাবে সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবেনা যে, "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যোল আনাই তাঁর স্ত্রী।" অনুমান ১৮৭৭ সালে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় কাঁঠালপাড়া আসেন। অনেক সাহিত্যিকই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া যেখানে কমলমণির কাছে সূর্য্যমুখী তাঁহার পতিপ্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন "বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারিনা। অন্য কিছু শুনিতে চাও তো পড়ি।" নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন "আমাকে অক্ষয় বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিম বাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে। তিনিই সূর্য্যমুখী"............('আমার জীবন' ২য় ভাগ)

কিন্তু বঙ্কিম কেবল "সূর্য্যমুখীতে"ই স্ত্রীর চরিত্র আঁকিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখী অঙ্কিত হয় বঙ্কিমের চৌত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে। প্রৌঢ়কালে আবার রূপে গুণে সদা প্রফুল্লময়ী রাজলক্ষ্মী দেবীকে অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা হওয়ায় বঙ্কিম 'ইন্দিরা' উপন্যাসখানি

---

*(১) স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ১৩০১, বৈশাখ মাসের 'নব্যভারতে' লিখিয়াছিলেন "বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম সূর্য্যমুখী।"

(২) স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত "পুরোহিতে" (১৩০১ জ্যৈষ্ঠ) হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। ভার্য্যার নাম সূর্য্যমুখী। ইঁহাকে লইয়াই বঙ্কিম সংসার পাতিলেন।"

(৩) "চিকিৎসাতত্ত্ব ও সমীরণ" ১৩০১, জ্যৈষ্ঠ—

"বঙ্কিমের দ্বিতীয় পত্নীর নাম সূর্য্যমুখী।"

পরিবর্দ্ধিত করিয়া স্বেচ্ছামত সেখানে তুলিকা সঞ্চালন করেন। সে অঙ্কন এতই স্পষ্ট ও স্বাভাবিক যে, রূপবর্ণনা ও গুণকীর্ত্তনে একটী নূতন সজীব মূর্ত্তি সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই চরিত্রটি 'সুভাষিণী'। প্রথমে ইন্দিরায় ইহা ছিল না, গ্রন্থকারের স্ত্রীর গুণেই 'ইন্দিরা' এত বড় ও সরস হইয়াছে।

একটা কথা বলি নাই। রাজলক্ষ্মী দেবীর ঘন কৃষ্ণ কেশরাজি সর্ব্বদাই তাঁহার কপাল ও গণ্ডদেশে বাহিয়া পড়িত। এরূপ কেশ বর্ণনা আমরা বঙ্কিম সাহিত্যের অনেক স্থানে পাইয়াছি, কিন্তু সুভাষিণী-তেই তাহা প্রকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে।

ইন্দিরা বলিতেছে—

"অনেকদিন এমন ভাল সামগ্রী কিছু দেখি নাই। মানুষটী আমারই বয়সী হইবে, রং আমা অপেক্ষা যে ফরসা তাও নয়। বেশ-ভূষা এমন কিছু নয়। কানে গোটাকতক মাক্‌ড়ি, হাতে বালা, গলায় চিক, একখানা কালাপেড়ে কাপড় পরা। তাতেই দেখিবার সামগ্রী। এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটী ফুটিয়া আছে—চারিদিক হইতে সাপের মত কোঁকড়া চুলগুলা ফণা তুলিয়া পদ্মটা ঘেরিয়াছে। খুব বড় বড় চোখ—কখন স্থির, কখনও হাসিতেছে। ঠোঁট দুখানি পাতলা, রাঙ্গা টক্‌টকে, ফুলের পাপ্‌ড়ির মত উল্‌টান, মুখখানি ছোট; সর্ব্বশুদ্ধ যেন একটী ফুটন্ত ফুল। গড়ন পিটন কি রকম তাহা বলিতে পারিলাম না। আমগাছের যে ডাল কচিয়া যায়, সে ডাল যেমন বাতাসে খেলে, সেই রকম তাহার সর্ব্বাঙ্গ খেলিতে লাগিল—যেমন নদীতে ঢেউ খেলে, তাহার শরীরে তেমনি কি একটা খেলিতে লাগিল—আমি কিছু ধরিতে পারিলাম না, তার চোখে কি একটা যেন মাখান ছিল, তাহাতে আমাকে যাদু করিয়া ফেলিল।"

রাজলক্ষ্মীর রূপলাবণ্য ও গুণরাশিও বঙ্কিমকে যাদু করিয়া ফেলিয়াছিল। বঙ্কিম লিখিতেছেন "সুভাষিণীর বুদ্ধি যেমন প্রখরা, স্বভাবও তেমনি সুন্দর। এমনটী সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।" রাজলক্ষ্মী দেবীরও সেইরূপই ছিল।

একস্থানে আছে—

"সুভাষিণী হারাণীকে বলিল "একবার তাঁকে ডেকে পাঠাও" হারাণী বলিল "এখন অসময়ে আসিবেন কি? আমি ডাকিয়া পাঠাই কি করিয়া?"

সুভাষিণী ভ্রূভঙ্গি করিল, বলিল "যেমন করে পারিস—ডাক্ গে যা।"

হারাণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমি সুভাষিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ডাকিতে পাঠালে কাকে? তোমার স্বামীকে?"

সু—না ত কি পাড়ার মুদি মিন্‌ষেকে এই রাত্রে ডাকিয়া পাঠাইব?

আমি বলিলাম "বলি, আমায় উঠিয়া যাইতে হইবে কি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

সুভাষিণী বলিল, "না। এইখানে বসিয়া থাক।"

সুভাষিণীর স্বামী আসিলেন। বেশ সুন্দর পুরুষ।

কিছু কথা হইলে বলিলেন "তা আমায় কি করিতে হইবে?"

সু—ওঁকে রাখিয়ে দিতে হবে।

স্বামী—কেন?

সুভাষিণী তাহার স্বামীর নিকটে গিয়া, আমি শুনিতে না পাই, এমন স্বরে বলিলেন "আমার হুকুম"।

কিন্তু আমি শুনিতে পাইলাম। তাঁর স্বামীও তেমনি স্বরে বলিলেন "যে আজ্ঞা"।

পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী

বঙ্কিমচন্দ্রকেও এরূপ ডাকিয়া পাঠান হইত। কাঁটালপাড়া বঙ্কিমের বৈঠকখানা ঘরের উত্তর দিকে যে বাড়ীর খিড়কীর দরজা আছে পাঠক নিশ্চয়ই সেইটী লক্ষ্য করিয়াছেন।

যাহাহউক এই বিবাহ যে কোন সময়ে হইয়াছিল, তাহা লইয়া অনেকেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। শচীশচন্দ্র বলেন ১৮৬০ সালের জুন মাসে। আমরা বলি ১২৬৬ সালের মাঘ মাসে। অর্থাৎ ১৮৬০এর জানুয়ারী মাসের শেষ, কি ফেব্রুয়ারীর প্রথম ভাগে। এ বিষয়ে চিঠি পত্রাদি কোন প্রমাণ নাই, অথবা কাহারও ডায়েরীতেও কিছু উল্লেখ নাই। বঙ্কিম নিজেও কিছু লিখিয়া রাখেন নাই। পূর্ণচন্দ্রের উক্তি এবং অবস্থাঘটিত প্রমাণাদিই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু কেহই তাহা বিচার না করিয়া শচীশবাবুর উক্তিটীই প্রামাণ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ শচীশবাবুর জন্মের দশ বার বৎসর পূর্ব্বে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তাই বিনা প্রমাণে তাঁহার কথাও গ্রাহ্য নয়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যশোহর হইতে নেগুঁয়ায় বদলী হন। এখন শচীশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র সময় পাইলে মধ্যে মধ্যে নাগোয়া হইতে সমুদ্র দেখিতে যাইতেন। নাগোয়া হইতেও সমুদ্রের চীৎকার সময় সময় শোনা যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিপত্নীক। নিস্তব্ধ নিশীথে শয্যায় শুইয়া সমুদ্রের রোদনে তিনি আপন হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনিতেন চপল সমুদ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিত, গম্ভীর বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে কাঁদিতেন। সে নীরব রোদন বঙ্কিমচন্দ্রের মাতাপিতা ছাড়া কেহ দেখিলনা, বুঝিল না। তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন......"

ইহা উপন্যাসের ভাষা। বিশেষতঃ নেগুঁয়া হইতে সমুদ্র এতদূর (প্রায় ২০ মাইল) যে, সেখানে শুইয়া কেহ সমুদ্রের চীৎকার শুনিতে পায়না। নেগুঁয়ায় তিনি পত্নীর বিরহে নৈশ উপাধান অভিষিক্ত করিতেন তাহারও কোন প্রমাণ নাই। অন্ততঃ দিব্যেন্দুসুন্দর লিখিয়াছেন বিপরীত কথা।* তিনি বলেন—

"বঙ্কিম বলিতেন, নাগোয়ানে তিনি দিবারাত্রি কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সময় কাটাইতেন। প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় নির্ভীক অদ্ভুতসাহসী যুবা বঙ্কিমচন্দ্র ভৃত্যবর্গ বা অপর কোন লোক সঙ্গে না লইয়া একাকী সেই মনুষ্যসমাগমশূন্য নির্জ্জন পল্লীপথ অতিবাহিত করিয়া অস্পষ্ট আলোকে কখনও সমুদ্র উপকুল সন্নিকট—বালুকাময় স্তূপের কাছাকাছি শ্বেত ধবলাকৃতি চরে—কখনও বা কোলাহলশূন্য গম্ভীর নিৰ্জ্জন নদীতীরে চুপ করিয়া বসিয়া অনন্তদেবের ধ্যানে তন্ময় হইয়া পৃথিবীর এমন কি নিজের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে সমাধিস্থ যোগীর ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। যখন গভীর রাত্রে লণ্ঠন হস্তে ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে ডাকাডাকি করিত, তখন তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া যাইত। তাহার পর ভৃত্যবর্গের হস্তস্থিত লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পথ দেখিয়া বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া আহারাদি করিয়া সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রম দূর করিবার মানসে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেন। নিদ্রাদেবীও তাঁহার প্রতি প্রসন্না ছিলেন। অতি অল্পকালমধ্যেই তাঁহার গভীর নাসিকাধ্বনি ভৃত্যবর্গকে জানাইয়া দিত যে, তিনি নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া পরমানন্দে নিদ্রিত হইয়াছেন।*

---

*সচিত্র শিশির—১০ই শ্রাবণ, ১৩৩১।

সামান্য একটু সত্যের আভাস থাকিলেও এ চিত্রও উপন্যাস বই আর কিছুই নয়। তাই বিবাহের সময় সম্বন্ধে দিব্যেন্দু সুন্দর অথবা শচীশচন্দ্রের রচনা হইতে কোন সহায়তা পাওয়া যাইতেছেনা। সুতরাং অবস্থাঘটিত প্রমাণ এবং পূর্ণচন্দ্রের উক্তিই এ বিষয়ে প্রধান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

জুনমাসে বিবাহ হইলে নিশ্চয়ই বঙ্কিম ছুটী নিতেন। কিন্তু চাকুরীর ইতিহাসে এ সময়ে কোন ছুটীর উল্লেখ নাই। আর এই সময়ে এই স্থান হইতে তিনি অন্য কোথাও বদলীও হন নাই। বদলী হইলে অবশ্য কিছুদিন একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার জন্য joining leave পাওয়া যায়।

বঙ্কিম ১৮৬০ জানুয়ারীতে যশোহর হইতে নেগুঁয়ায় বদলী হন। যদিচ চাকুরীর ইতিহাসে ২১, জানুয়ারী, নেগুঁয়ায় যোগদানের কথা আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কার্য্যে যোগদান করেন ৯ ফেব্রুয়ারী।* সুতরাং এদিকে পাইলেন ২০ দিন। আবার গেজেটে বদলীর কথা উঠে ২০ জানুয়ারী। এদিক হইতেও যদি উপরওয়ালার সম্মতিক্রমে ২।৪ দিন পূর্ব্বে আসিয়া থাকেন, তবে আরও কয়েকদিন পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ এই অন্ততঃ ২০।২২ দিন সময়ের মধ্যে হওয়া খুবই সম্ভব। আমাদেরও দৃঢ় প্রতীতি হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ এই

---

* এ বিষয়ে মেদিনীপুর কালেকক্টরীর কাগজপত্র আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া আসিয়াছি। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, আর সেন আই, সি, এস, এর অনুমত্যনুসারে, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন গুপ্ত এম, এ, সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সহায়তায় আমরা বঙ্কিম সংক্রান্ত কালেক্টরীর যাবতীয় কাগজ পত্রই দেখিয়াছি। এ বিষয়ে কালেক্টরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট "রূপান্তর" প্রণেতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাসও সাহায্য করিয়াছেন।

সময়ের মধ্যে মাঘ মাসে (জানুয়ারী শেষ দিকে অথবা ফেব্রুয়ারীর ২।১ দিন মধ্যেই) হইয়াছিল। এবিষয়ে আরও প্রমাণ আছে।

বঙ্কিম যশোহর হইতে আসেন নেগুঁয়ায় এবং তারপরে যান খুলনায়। পূর্ণচন্দ্র এই তিন স্থানের ক্রমিক বিবরণ "বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু" প্রসঙ্গে দিয়াছেন। আর বিবাহের কথা যশোহরের বিবরণ উপলক্ষেই উল্লেখ করিয়াছেন। বিবাহের বিবরণ দেওয়ার পরে নেগুঁয়ার প্রসঙ্গ বিবৃত করেন। সুতরাং তাঁহার কথায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে নেগুঁয়ায় যাওয়ার পূর্ব্বেই বঙ্কিম বিবাহ সারিয়া যান। পূর্ণচন্দ্র আরও বলেন বঙ্কিমের একবিংশতি বৎসরে বিবাহ হয়। ১২৬৬ সালে বিবাহ হইলেই ২১ বৎসরের ঘটনা হইয়া পড়ে।

এইখানে পুনরুক্তি দোষ ঘটিলেও পূর্ণচন্দ্রের উক্তিটী প্রদান করিব—

"ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হইবার এক বৎসর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিপত্নীক হইয়া পিতামাতার অনুরোধে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম এক বিংশতি বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র পঠদ্দশা হইতেই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। একে বি, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তারপর দেখিতে সুপুরুষ একুশ বছরের যুবা, আবার তাঁহার পিতৃদেবের এ অঞ্চলে নাম যশও ছিল, সুতরাং অনেক পাত্রী জুটিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটী লইয়া বাটী আসিলেন; সুহৃদপ্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; পরে একটী পাত্রী মনোনীত করিয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন।"

এই যশোহরের বিবরণ ও বিবাহের কথা উল্লেখ করিবার পরে পূর্ণচন্দ্র নেগুঁয়ার কথা বিবৃত করেন, তারপরে খুলনার ঘটনার কথা বলেন। সুতরাং নেগুঁয়ায় যাইবার পূর্ব্বেই যে বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে যে পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন "এ সময়ে

বঙ্কিমচন্দ্র ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলেন" তাহাতেও কোন ভুল হয় নাই। পূর্ণচন্দ্র তখন ছাত্র ছিলেন। তাঁহার নিকট এই joining leaveই 'ছুটী' বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জুন মাসে ছুটি লওয়ার কোন প্রমাণ নাই।

দীনবন্ধু যে পাত্রী দেখিতে গিয়াছিলেন ইহাতেও মনে হয়, যশোহরের ফেরতই বঙ্কিমের প্রতি সমবেদনা দেখাইতে দীনবন্ধু যশোহর হইতে আসিয়াছিলেন।

"ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইবার এক বৎসরের মধ্যে দার পরিগ্রহণে প্রবৃত্ত হন।"—পূর্ণচন্দ্রের এই কথাও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১২৬৫ সালে বঙ্কিম চাকুরী পান, এবং ১২৬৬ সালে বিবাহ করেন।

যাহাই হউক স্বর্গীয় মেঘনাদবাবুর নোটে লিখিত আছে যে, রামপণ্ডিত মহাশয় বলেন—

"রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত বিবাহের বাসর ঘরে মেয়েরা গুড় চাল দেওয়াতে বঙ্কিম পলাইয়া সভাস্থলে চলিয়া আসেন। পরে বন্ধু-বান্ধবেরা বলাতে পুনরায় বাসর ঘরে যান।"

বাসরঘরের স্মৃতি বরাবর যে বঙ্কিমের মনে জাগরূপ ছিল, তাহার প্রমাণ পাই "ইন্দিরা" উপন্যাসে। স্ত্রী-আচারকালে একজন যে বড় জোরে তাহার কাণ মলিয়া দিয়াছিল, এই কথা বলিয়া উপেন্দ্রবাবু ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"বাসর ঘরে সকলে উঠিয়া গেলে আমি ইন্দিরাকে নির্জ্জনে একটী কথা বলিয়াছিলাম। কি সে কথা, বল দেখি?"

রাজলক্ষ্মী দেবীর আনুগত্য, অক্লান্ত সেবা ও পতিপরায়ণতায়ই বঙ্কিমের প্রতিভাস্ফুরণে কোন বাধা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারামে'

লিখিয়াছেন "স্ত্রী পুরুষের পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্য-সুখ নহে, একাভিসন্ধি-সহৃদয়তা ইহাই দাম্পত্য-সুখ।

বস্তুতঃ রাজলক্ষ্মী দেবীতে বঙ্কিম সম্পূর্ণ দাম্পত্য সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। সীতারাম, ১ম খণ্ড ১০ পরিচ্ছেদ

কিন্তু তথাপি কি মোহিনীদেবীর জন্য অন্তর্ব্যথা কখনও কখনও মূর্ত্ত হইত না? নিশ্চয়ই হইত। তাই তিনি সীতারামের মুখে নিজের কথাই বোধ হয় ব্যক্ত করিতেছেন—

"মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন, কিন্তু সহধর্ম্মিণী কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী* ভাল, কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায় সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত।"

সীতারাম, ১ম খণ্ড একাদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিম উপন্যাসে ষোল আনাই যে তাঁহার স্ত্রী—সে কোন্ স্ত্রী? উভয় স্ত্রীরচরিত্রে রসমবায়েই বঙ্কিম এত দক্ষ নভেলিষ্ট, এরূপ অদ্ভুত শিল্পী।

যাহা হউক বিবাহ করিবার পরে বঙ্কিম নেগুঁয়ায় চলিয়া যান। বঙ্কিমের জীবনে সেখানে অনেক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়াছিল। আগামী খণ্ডে সে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিবার বাসনা রহিল।

*দিব্যেন্দুসুন্দরও যথার্থই লিখিয়াছেন "পত্নী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী যথার্থই **"রাজলক্ষ্মী"**। নারায়ণ লক্ষ্মীকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন"—
"বঙ্কিমকথা", সমালোচনী, ১৩০৮-৯ পৃঃ ২৭৯

অষ্টম অধ্যায়—"শতবর্ষ পূর্ব্বের সমাজ চিত্র বা সাময়িক ইতিহাস

এই অধ্যায়ে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহের' কথা বলিব না। 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি উপন্যাসের ঐতিহাসিকতত্ত্বও বিচার করিব না! এমন কি উপরোক্ত উপন্যাস কয়খানি যে যুগের ঘটনা অবলম্বনে রচিত সেই সময়ের ভারতের গ্রামপ্রান্তর নগর বা নগরীর অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু বলিতে চাহি না। বঙ্কিমের রচনায় শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গলার সামাজিক অবস্থা কিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে আমরা তাহাই বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব। আর এইরূপ অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানতঃ বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ,' কৃষ্ণকান্তের উইল, 'রজনী,' ইন্দিরা ও 'রাধারাণীতে' এবং কয়েকটী প্রবন্ধেই। কেবল সামাজিক অবস্থার দিক হইতেও বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এই সমস্ত রচনার ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসখানি কোন্ সময়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত, সর্ব্বাগ্রে তাহাই নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যমুখীর কথায় পাই, "ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কোন একজন বড় পণ্ডিত বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন।" আমরা ৺ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন চরিত পাঠে জানিতে পারি যে তিনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে "বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক" রচনা ও প্রচার করেন (৩য় সংস্করণ পৃঃ ১৬৯), সুতরাং 'বিষবৃক্ষ' ইহার পরের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। বিষবৃক্ষ প্রথম বঙ্গদর্শনে রচিত হয় ১৮৭২ সালে। সুতরাং ঘটনাটী নিশ্চয়ই ইহার পূর্ব্বের। কিন্তু কতদিন পূর্ব্বের? বঙ্কিম লিখিয়াছেন "এক্ষণে গ্রাণ্ট ইন্ এডের প্রভাবে গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা, টপ্পাবাজ নিরীহ ভালমানুষ মাষ্টার বাবুরা বিরাজ করিতেছেন কিন্তু তৎকালে সচরাচর "মাষ্টারবাবু" দেখা যাইত না।

বিষবৃক্ষ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুতরাং রচনার কয়েক বৎসরের পূর্ব্বকার ঘটনার কথাই ইহাতে প্রমাণিত হয়। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে, বঙ্কিম যে সময়ে কলিকাতা ছিলেন (১৮৫৬-৫৮), তিনি সেই সময়কারই সমাজের একটী চিত্র প্রদান করিয়াছেন।

(১) বিধবা বিবাহ

১৮৫৬, ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং কয়েকটী বিধবাবিবাহও অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় বিধবাবিবাহের আন্দোলনে সমগ্র দেশ বিকম্পিত হইয়া উঠে। গোবিন্দপুরেও এই লইয়া খুব তর্ক বিতর্ক হইত। তাই সূর্য্যমুখী বলিতেছে—

"এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক বিতর্ক হয়। সেদিন ন্যায়কচ্‌কচি ঠাকুর—মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র—বিধবাবিবাহের পক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটী টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্ব্বভৌম ঠাকুর বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যা-বিবাহের জন্য আমি পাঁচভরির সোণার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবাবিবাহের দিকে নয়।"

হরিদ্রাগ্রামেও এই আন্দোলনের কথা অপ্রকাশিত নাই।

"কৃষ্ণকান্তের উইলে" রোহিণী হরলালকে বলিতেছে "আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবাবিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি নাকি বিধবা বিবাহ করিবেন ?"

হর। ইচ্ছা তো আছে কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই ?

রো। তা বিধবাই হৌক আর সধবাই হৌক—বলি বিধবাই হউক, কুমারীই হউক—একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হইলে ভাল হয়। আমরা আত্মীয় স্বজন, সকলের তা হ'লে আহ্লাদ হয়।

হর। দেখ, রোহিণি, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

রো। তা ত এখন লোকে বলিতেছে।

হর। দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার—কেন করিবেনা ?

রোহিণি মাথার কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল।

অন্যত্র আবার হরলালও পিতাকে শাসাইয়াছে "বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, আমি একটী বিধবা বিবাহ করিব।"

"রজনী"তেও অমরনাথ শ্লেষ করিয়া বলিতেছেন—"বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দাও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গরুর মত গোয়ালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও, চরিয়া খাক্" ইত্যাদি।

(২) সংস্কার ও ইয়ংবেঙ্গল

তখন সংস্কারের দিন। সংস্কারক বক্তৃতাদিও দেন, আবার তাহার কোনরূপ কদাচারেই ক্রুটী নাই। ৺অক্ষয় দত্তের "তত্ত্ববোধিনী" উন্নতসমাজে তখন প্রবল প্রতাপে চলিয়াছে। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা পাঠ করিয়া সংস্কারক অনেক কথাই আওড়াইতেন।

এই সময়ের নব্যবাবুদের সাধারণ আচার-ব্যবহার দেবেন্দ্রের চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে। 'সধবার একাদশীর' অটলের ন্যায় দেবেন্দ্রও বিলাসী ও মদ্যপায়ী, 'ইয়ং বেঙ্গলের' টাইপ চরিত্র। দেবীপুরে তিনি একটী ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত করিয়াছেন। একটা ফিমেল স্কুল হইয়াছে। বিধবা বিবাহের উৎসাহ দেখা যাইতে লাগিল। জেনানারূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয়ে তারাচরণ ও দেবেন্দ্র একমত হইলেন। উভয়ে বলিতেন "মেয়েদের বাহির কর।"

তখন গ্রামে গ্রামে সংস্কার সভা হইত। ঐ সব সংস্কারকগণ সাধারণতঃ কিরূপ চরিত্রের হইতেন, বঙ্কিম তারাচরণের চরিত্রে দেখাইয়াছেন—

"তারাচরণ Goldsmith এর Citizen of the World আর Addisonএর Spectator এবং তিনবুক অব জিউমেট্রি পড়িয়া সংস্কারক হইয়াছেন। তিনি জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন এবং বাবুর পারিষদমধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিক বিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন এবং "হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর!" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লিখাইয়া লইতেন। মুখে সর্ব্বদা বলিতেন "তোমরা ইট পাটকেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জ্যাঠাইদের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঞ্জরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবারালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোক শূন্য; এপর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই।"

'বিষবৃক্ষ,' অষ্টম পরিচ্ছেদ।
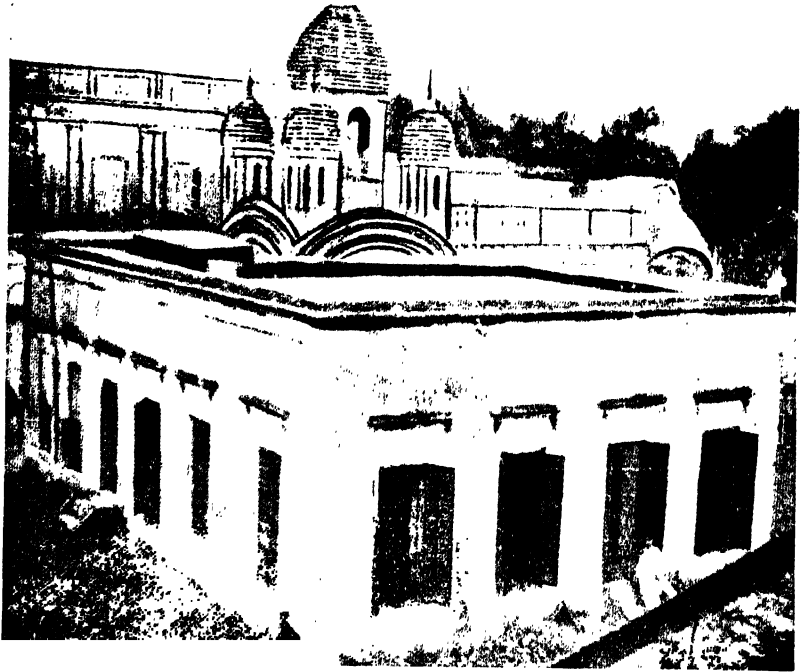
বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা (দক্ষিণ-পশ্চিমের রেলওয়ে পুলের উপর হইতে)

বৈঠকখানার উত্তরে শিব-মন্দির, তদুত্তরে বঙ্কিম বাবুর বাড়ী। বাড়ীর দোতলার অংশের সামনের দিকে বঙ্কিমবাবু থাকিতেন। তাহার উত্তরে থাকিতেন যাদববাবু বৈঠকখানার সিঁড়ি এখন নাই। পূর্ব্বদিকের ঘরে বঙ্কিম বাবু বসিতেন, পশ্চিম দিকের ঘরে শুইতেন। ঐ দুই ঘরের উত্তর দিকে একটী বড় হল্-ঘর। লোকটী বসিয়া রহিয়াছে দক্ষিণ দিকে। ইহার নীচে একটী ছোট পুষ্পোদ্যান ছিল। এখন উহার অস্তিত্ব নাই, জমিও রেলওয়ে অধিকারভুক্ত।

তারাচরণের স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাঙ্গার প্রবন্ধসকল প্রায় দেবেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানাতেই পড়া হইত। তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ককালে মাষ্টার সর্ব্বদাই দম্ভ করিয়া বলিতেন, "কখন যদি আমার সময় হয়, তবে এ বিষয়ে প্রথম রিফর্ম্ম করার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমার বিবাহ হইলে আমার স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বাহির করিব।"

—বিষবৃক্ষ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু সংস্কারকেরা নিজের বেলায় যে কথায় ও কার্য্যে এক হইতেন না, এ বিষয়েও বঙ্কিম ইঙ্গিত করিয়াছেন। তারাচরণের বিবাহ হইলে তাহার স্ত্রী কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ইয়ার মহলে প্রচারিত হইল। সকলে প্রাচীন গীত কোট্ করিয়া বলিল—

"কোথা রহিল সে পণ ?"

দেবেন্দ্র বলিলেন "কি হে তুমিও কি ওল্ড্ ফুল্দের দলে ? পত্নীর সহিত আমাদের আলাপ করিয়া দাও না কেন ?"

তারাচরণ বড় লজ্জিত হইলেন।

(অষ্টম পরিচ্ছেদ)

তখন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি সাহেবি চালচলনেই বেশী চলিত। এমন কি তাহারা বাঙ্গলা বলিতেও বিশেষ লজ্জাবোধ করিত। এইরূপ নব্য বাবুদের পোষাক সম্বন্ধে "হনুবদ্বাবুসংবাদে" আছে—বুট, কোট, পেণ্টালুন, চেন, চশমা, চুরুট, চাবুকধারী, টুপ্যাবৃত মস্তক, বাবুর পরানুকৃত বেশ, গমন, চাহনি প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। ভাষা সম্বন্ধে—কলার গুণ বলিলেন অতি মিষ্ট delicious.

হনু—হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ ! মাতৃভাষায় কথা কও।

বাবু—ওটা আমার ভুল হইয়াছে, এইবার আমাকে excuse করুন।

হনু—তাইবা কাকে বলে ?

বাবু—আমাকে মাপ করুন—আমি বড়—কি বলিব ? ইংরেজি কথাটা forgetful—তার বাঙ্গালা কি ?

অথচ ইহারা Local Self-Government, Freedom, Liberty, Free-born কথা মুখে খুব আওড়াইত।

"রজনী"তেও দেখিতে পাই—সোসাইটী, ক্লাব, এসোসিয়েসন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রিজলিউসন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন ইত্যাদি খুব সজোরভাবে চলিয়াছিল।

(২য় খণ্ড. ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

স্থূলতঃ তখন এই সব লোকই স্বাধীনতা প্রভৃতির কথা বলিতেন।

তখন বাঙ্গলা ভাষার উপরে শিক্ষিত লোকের কিরূপ গভীর অশ্রদ্ধা ছিল ১৯৩ পৃষ্ঠায় কতক আভাস দিয়াছি। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা তখন মদ খাইতেন, অখাদ্য ভোজন করিতেন, কুচরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না ; কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা তাহারা ঘোরতর অন্যায় মনে করিতেন। সমাজের এই অবস্থা বঙ্কিম "লোকরহস্যে" আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি—তোমরা ছাইভস্ম বাঙ্গলাগুলো পড় কেন ? সব immoral, obscene, filthy.

ভার্য্যা—পড়িলে কি হয় ?

স্বা—demoralize হয়—কি না, চরিত্র মন্দ হয়।

ভার্য্যা—স্বামী মহাশয় ! আপনি বোতল বোতল ব্রাণ্ডি মারেন, যাদের সঙ্গে বসিয়া ওকাজ হয়, তারা এমনই কুচরিত্রের লোক যে, তাদের মুখ দেখিলেও পাপ আছে। আপনার বন্ধুগণ ডিনারের পর যে ভাষায় কথাবার্ত্তা ক'ন—শুনিতে পাইলে খানসামারাও কানে

আঙ্গুল দেয়। আপনি যাদের বাড়ী মুরগি মটনের শ্রাদ্ধ করিয়া আসেন, পৃথিবীতে এমন কুকাজ নেই যে তাহারা ভিতরে ভিতরে করে না। তাহাতে আপনার চরিত্রের জন্য কোন ভয় নাই—আর আমি গরীবের মেয়ে, একখানা বই পড়িলেই গোল্লায় যাব?

স্বা—আরে না, না, ওসব ছুঁয়ে হাত ময়লা করো না। ইত্যাদি—

ধর্ম্মজ্ঞান

তখন সাধারণতঃ লোকের ধর্ম্মজ্ঞান প্রবল ছিল। সামান্য উপকার পাইলেও কৃতজ্ঞতার অভাব ছিল না। সন্তানের বা বংশের অহিত হইলেও প্রত্যুপকারের কথা কেহ ভুলিত না। কৃষ্ণকান্ত রায় ও তাঁহার সহোদর রামকান্ত একত্রে ধনোপার্জ্জন করিয়া বিষয় করেন। বিষয় ছিল কৃষ্ণকান্তের নামে। কিন্তু রামকান্তের ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার জীবদ্দশায়ই একটা লেখাপড়া হয়। কিন্তু তিনি হঠাৎ মারা যান, কোন দলিল আর হইল না। তথাপি ধর্ম্মজ্ঞানী কৃষ্ণকান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তিনি উইলে তাহাকে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ প্রদান করেন। এবিষয়ে দুর্ব্বৃত্ত পুত্র হরলালের সঙ্গে যে আলাপ হয়, তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। হরলাল পিতাকে বলিতেছে—

"এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল আর আমার তিন আনা?"

কৃষ্ণকান্ত করিলে—"ইহা ন্যায্য হইয়াছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।"

হর—গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি? আমাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তি সে লইবার কে? আর মা বহিনকে আমরা প্রতিপালন করিব—তাহাদিগকে বা এক আনা কেন বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী করিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাপু হরলাল, বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইব।"

(১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)

অতঃপরে দ্বিতীয় পুত্র বিনোদলালের অনেক সাধ্য সাধনায়ও হরলালকে একটী পয়সা দিলেন না, কিন্তু তাহার পুত্রকে এক পাই অংশ দিয়াছিলেন।

'রজনী'তে রামসদয় বাবুর পিতা বাঞ্ছারামও উইলে এই কারণেই (অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান হেতু) নিজ পুত্রকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিয়া বন্ধু মনোহরদাসকে সব বিষয় লিখিয়া দেন এবং ইহাও স্থির করিয়া যান যে, যতদিন মনোহরদাসের উত্তরাধিকারী থাকে, ততদিন পুত্র এক কপর্দ্দকও পাইবে না। ইহার কারণ বাঞ্ছারাম যে সমস্ত বিষয় করিয়াছিলেন, তাহা অর্জ্জিত হয় মনোহরদাসের সহায়তায় ও পরিশ্রমে। এবং যে-দিন নিজপুত্র রামসদয় সেই সুহৃদকে অপমান করে, আর অপমানিত হইয়া মনোহর চলিয়া যান সেই দিনই বাঞ্ছারাম রামসদয়কে ত্যাজ্যপুত্র করেন। কৃষ্ণকান্ত ও বাঞ্ছারামের এরূপ কৃতজ্ঞতা ও ধর্ম্মবুদ্ধি তখনকার দিনের একটী বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু আজকাল তাহা লোপ পাইয়াছে। রজনীও যে নিজ পুত্রের নাম অমরপ্রসাদ রাখিয়াছিল তাহাও কৃতজ্ঞতারই ফলে। তবে জাল করিবার ষড়যন্ত্রও যে তখন অজ্ঞাত ছিল না, হরলাল ও ব্রহ্মানন্দই তাহার প্রমাণ।

তখনকার দিনে বাড়ীতে সাধারণতঃ কিরূপ গীতের প্রচলন ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র "বিষবৃক্ষে" তাহা দিয়াছেন। সেই গানের নমুনা শুনিলে আজকাল তাঁহাদের রুচিতে অনেকে বিস্মিত হইবেন। কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ তাহা পাঠককে অনুধাবন করিতে বলি। হরিদাসী বৈষ্ণবী যখন নগেন্দ্র দত্তের বাড়ী খঞ্জনী লইয়া আসিয়া উপস্থিত, তখন নিম্নলিখিত প্রকারের গান গাহিবার জন্য ফরমাস হয়—
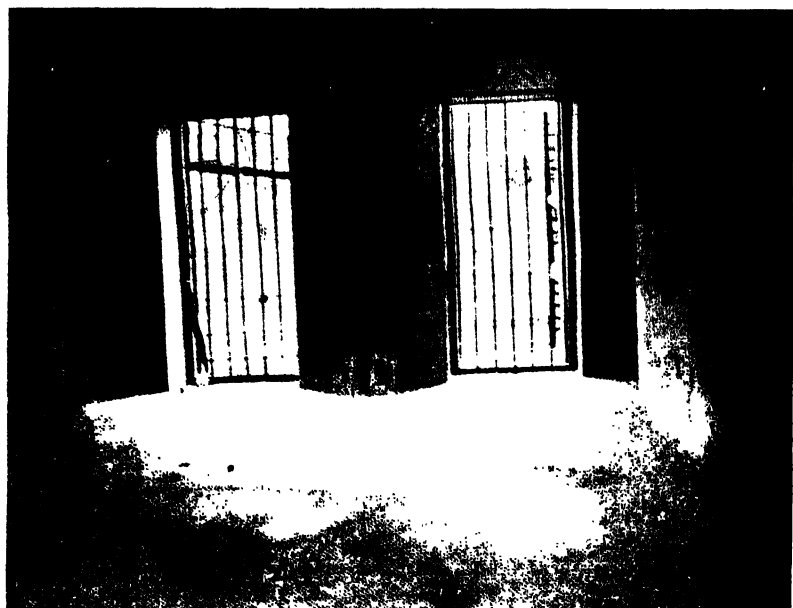
বৈঠকখানার বড় হল-ঘর

দক্ষিণের দুইটী ছোট আর উত্তরের হল-ঘরটী বড়। এই ঘরে ফরাস পাতা এবং অনেকগুলি তাকিয়া থাকিত। কোণের জানালার নিকটে যে স্থানে একটী ছাতা দেখা যাইতেছে, তথায় একটী হারমোনিয়ম্ থাকিত। বঙ্কিমবাবু এই হারমোনিয়মে সঙ্গীত অভ্যাস করিতেন। এই হল-ঘরের উত্তর দিক দিয়া (দেখান নাই) সিঁড়ি দিয়া পশ্চিম দিকে যাওয়া হইত। এখন সেই সিঁড়ি নাই। এই হল ঘরের উত্তর দিকে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। পায়খানাও ছিল, তাহার উত্তর দিকে বঙ্কিমবাবুর বাটী।

কেহ চাহিলেন "গোবিন্দ অধিকারী" কেহ "গোপাল উড়ে"। যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয়ক হুকুম করিলেন। তাহারই ঠিক করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা সখী-সংবাদ এবং বিরহ বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন 'গোষ্ঠ'—কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল 'নিধুর টপ্পা গাইতে হয় তো গাও—নহিলে শুনিব না।" একটী অস্ফুটবাচা বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল—"তোলা দাস্‌নে দাস্‌নে দাস্‌নে দুতী।"

অবশ্য কুন্দের ইচ্ছা ছিল কীর্ত্তন গাওয়া হয়, আর সূর্য্যমুখী একটী অপূর্ব্ব শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কারপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

তখন মধো কানের ও গোবিন্দ অথিকারীর গীত খুব বেশী হইত, কিন্তু অনেকে আবার মনে করিত গোপাল উড়ের যাত্রার মত পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই।

(বিষবৃক্ষ)

তখন স্ত্রীশিক্ষা যে হিন্দুমেয়েদের মধ্যেও কিছু আসে নাই তাহা নয়, তবে অধিকাংশই স্বধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষা করিত। সূর্য্যমুখী ও কমলমণিকে নগেন্দ্রের পিতা. মিস্ টেম্পল নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া বিশেষ যত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। আর রাধারাণীকেও কামেক্ষ্যাবাবু বেশী বয়স পর্য্যন্ত কুমারী রাখিয়া সুশিক্ষিতা করাইয়াছিলেন। কিন্তু রাধারাণী উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াও পুরুষের সম্মুখে আসিতেন না, আর সূর্য্যমুখীতো একেবারে আদর্শ হিন্দুপত্নীই ছিলেন। তবে অনেক বড়মানুষের মেয়ে "মেম-লোকের মত বাড়ীর বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল বটে।"

আজকাল সাধারণতঃ ২০।২৫ বৎসরের মেয়ের বিবাহ হয় না। কিন্তু তখন ১৯।২০ বছর পর্য্যন্ত দৈবক্রমে যদি কেহ অবিবাহিত থাকিত, তবে ইংরেজের মেয়ের মত মনে হইত।

(রাধারাণী)

এমন কি তের বৎসর বয়সেই সকলে মনে করিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহের বয়স অতিঃক্রম করিয়াছে।

তখনকার দিনে জমিদারেরা আত্মসর্ব্বস্ব অথবা কলিকাতাবাসী হইয়া প্রজার অর্থে বাবুগিরি করিতেন না। দেশে থাকিয়াই প্রজার মনোরঞ্জন করিতেন। কৃষ্ণকান্তের মত জমিদার দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। নগেন্দ্রের মত জমিদারের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথিসেবা হইত, তণ্ডুলাদি বিতরণ হইত।

তখন কেবল কোন কোন জায়গায় রেল হইয়াছিল মাত্র। সূর্য্যমুখী এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে নৌকাপথে কাশী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখান হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে, তারপর বুলক্‌ট্রেণে বর্হি পর্য্যন্ত যান। গোবিন্দলাল মাকে লইয়া ট্রেণে কাশী যাইবার জন্য শিবিকা-রোহণে যান, কিন্তু অমরনাথ একেবারে বাষ্পীয় শকটারোহণে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন। কিন্তু রজনীর জ্যেঠামহাশয় মনোহরদাস ঢাকা হইতে জলপথে আসিতে নৌকাডুবি হইয়া মারা যান।

তখন কলিকাতায় নৌকাসংখ্যা ছিল অগণ্য। ইন্দিরার বিস্ময় জন্মিল যে, এত নৌকা মানুষে গড়িল কি প্রকারে! কিন্তু হায়, পোনর বিশ বৎসরের মধ্যে উহার শতাংশও রহিল না।

কলিকাতার রাজপথে তখন গাড়ী পাল্কী পিপ্‌ড়ের সারির মত চলিত, কিন্তু এখন অবস্থা কিরূপ সকলেই জানেন।

অট্টালিকা এখনকার ন্যায়ই তখনও ছিল অসংখ্য—"যেন অট্টালিকার সমুদ্র—অন্ত নাই, সংখ্যা নাই, সীমা নাই। জাহাজের

মাস্তুলেরও অরণ্য দেখিয়া পল্লীগ্রামবাসীর জ্ঞান বুদ্ধির বিপর্য্যয় হইয়া যাইত।"

(ইন্দিরা)

কলিকাতায় তখন বড়লোকের মেয়েরাও রাঁধিত। পাচক থাকিত অনেকটা সাক্ষীগোপালের মত। সুভাষিণী বলে—

"আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি। তবু কলিকাতার রেওয়াজ মত একটা পাচিকাও আছে।······আমরা সকলেই রাঁধিব, তার সঙ্গে তুমি দুই একদিন রাঁধিবে।"

তখন রামসদয় বাবুর ন্যায় ৬৩ বৎসরের বৃদ্ধের ও ১৯ বৎসরের নবীনা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অমানান হইত, আর সেই স্ত্রী লবঙ্গলতার ন্যায় স্বামীকে "ঠাকুর দাদা মহাশয়" বলিয়া রহস্য করিলেও একান্ত পতিগতপ্রাণা হইত এবং অনেক ক্ষেত্রে এত ভালবাসিত যে, বোধ হয় কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসিত কি না সন্দেহ। যথাক্রমে রামসদয়, অমরনাথ ও লবঙ্গলতার বিশেষতঃ শেষোক্ত নায়িকার চরিত্র সম্বন্ধে মনস্তত্ত্বমূলক আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

তখন সপত্নী বর্ত্তমানেও বিবাহ হইত—যেমন শচীন্দ্রের মাতা জীবিতা ছিলেন ; তথাপি লবঙ্গলতা গৃহোজ্জ্বল করিয়াছিল। নগেন্দ্রনাথও কুন্দকে বিবাহ করিবার সময় শ্রীশচন্দ্রকে লিখিয়াছেন—"তুমি বলিবে এই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। তুমি এই কথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে একথা ছিল না। কিন্তু ইংরেজেরা কি অভ্রান্ত ?"

তখন কলিকাতার কুলকামিনী পল্লীগ্রাম অপেক্ষাও কঠিনতর কারাগারে নিবদ্ধ থাকিত। চাকুরী যাঁহারা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে

ঈশানবাবুর ন্যায় ভাল লোকও ছিল, আবার মুচিরাম গুড়ের ন্যায় তোষামুদে লোকও খুব ছিল। তখনকার দিনে সাহেবরা বাঙ্গালীকে ভাল বাসিতেন, কেননা অনেক বিবেকজ্ঞানহীন ব্যক্তি সাহেবদিগকে মুরুব্বি জ্ঞান করিতেন, কখনও কখনও 'পিতা' উপাধিতেও ভূষিত করিতে লজ্জিত হইতেন না, কোনরূপ অপমানই তাহারা অপমান মনে করিতেন না। সাহেবরা গালাগালি দিলেও গাল পাতিয়া নিতেন। এইরূপ ব্যক্তির উন্নতিও খুব হইত। বঙ্কিমচন্দ্র 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিতে' সেই সময়কার খোসামোদে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিচয় দিয়াছেন—

"সাহেব মহলে মুচিরামের বড় সুখ্যাতি হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ সুযোগ্য ডেপুটি আর নাই। এরূপ সুখ্যাতির কারণ প্রথম—মুচিরাম গুড় মূর্খ, কাজে কাজেই সাহেবদিগের প্রিয়।

দ্বিতীয়—মুচিরাম অতি সামান্য ইংরেজি জানিত, যাহারা ভাল ইংরেজি জানিত তাহাদিগকে খাটো করিবার জন্য সাহেবেরা বলিতেন, মুচিরাম ইংরেজিতে সুশিক্ষিত, অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানী নহে! তাঁহারা বলিতেন, মুচিরাম তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়—মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক ছিলেন। সাহেবেরা অপমান করিলেও সম্মান বোধ করিতেন। একবার তিনি কমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেম-সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরম মেজাজে ছিলেন। এতালা হইবামাত্র বলিলেন—"নেকাল দাও শালাকো।" বাহির হইতে মুচিরাম শুনিতে পাইয়া সেখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল "বহুত খুব হুজুর। হামারা বহিন্‌কো খোদা জিতা রাখে।"

চতুর্থ—খোসামোদে মুচিরাম অদ্বিতীয়। তাহার পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে ইত্যাদি—

পঞ্চম—মুচিরাম ডিপুটির হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্চমের কাজ ছিল—অন্য কাজ বড় ছিল না। হপ্তম পঞ্চমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার-আচারের প্রয়োজন হইত না। তাতে আবার মুচিরাম বিচার-আচারের বড় ধার ধারিতেন না—চোখ বুজিয়া ডিক্রী দিতেন—নথির কাগজও বড় পড়িতেন না। সুতরাং মাস কাবারে দেখিয়া সাহেবেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। জনরব যে, মুচিরামের একেবারে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবৃদ্ধি হইবে। বোর্ডও স্থির করিল "বিচক্ষণ ডেপুটীতো মুচিরাম ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি না।"

বঙ্কিম বলিয়াছেন এই সব লোকেরই তখন যেমন খুব পদবৃদ্ধি হইত, আবার তাহারাই উপাধিতেও ভূষিত হইতেন।

এই অবস্থা হইতে কিরূপে আমাদের জাতীয় জীবনে পরিবর্ত্তনের আভাস দেখা গেল, আর এ বিষয়ে বঙ্কিমের অবদান কতদূর, এবং কিরূপে বঙ্কিম কেবল সাহিত্য সম্রাট নয়, জাতীয় ঋষির অবিসম্বাদী আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী খণ্ডে তাহা বলিব।

বঙ্কিমচন্দ্র

নবম অধ্যায়—বঙ্কিম ও মুসলমান

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন "বঙ্কিম-সাহিত্যে অনভিজ্ঞেরাই বলিয়া থাকেন, তিনি মুসলমানদের উপরে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন ছিলেন।" যাঁহারা বঙ্কিম-সাহিত্য পড়েন না, তাঁহারা এই কল্পিত অভিযোগে আমোদ পাইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বঙ্কিমের সমগ্র রচনাবলী পড়িয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ কথা অত্যন্ত অশোভনীয়। যিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি, তাঁহার পক্ষে এ ভাল, এ মন্দ, এই উচ্চজাতি, এই নিম্নজাতি, এই হিন্দু, এই মুসলমান, এইরূপ সঙ্কীর্ণভাব কখনও আসিতে পারে না। মনুষ্যজাতি এক, এবং ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন তিনি এই ভাবই মনে করিবেন। বস্তুতঃ প্রকৃতই যদি বঙ্কিমের সঙ্কীর্ণতা প্রমাণিত হয়, তবে তিনি ঋষি নহেন। আর যদি তিনি প্রকৃতই সমদর্শী, যদি তিনি ব্রাহ্মণকে আদর্শচ্যুত বলিয়া সমালোচনা করেন, অসংযমী হিন্দুর পরিণাম দেখাইতে ক্রুটী না করেন, যদি হিন্দু বিশ্বাসঘাতকের তুল্যরূপ দণ্ডবিধান করেন, যদি দেশ ভাবিতে হিন্দু মুসলমানের দেশই মনে করেন, তবে মিরজাফরের ন্যায় ব্যক্তিরও দোষ দেখাইবার, তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার, অথবা 'ধর্ম্মহীন নরপতির ধর্ম্মশূন্যতাই রাজ্যের পতনের কারণ,' এই কথা বলিবারও তুল্য অধিকার তাঁহার আছে। সমগ্র পাঠকমণ্ডলী শ্রদ্ধাবান হইয়া তাঁহার

গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে এ বিষয়ে সত্যাসত্য ও নিরপেক্ষতা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, তিনি গোটা বাঙ্গলা দেশ বলিতে কি বুঝেন? তিনি কি হিন্দুর বাঙ্গলা বুঝেন, না হিন্দু-মুসলমানের বাঙ্গলা বুঝেন? 'আনন্দমঠে' দেখিতে পাই তিনি বলিতেছেন—

"সপ্ত কোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্ত কোটি ভুজৈর্ধৃত খর করবালে
অবলা কেন মা এত বলে।"

এই সপ্তকোটি বলিতে কি কেবল হিন্দুকেই বুঝায়? এমন কি হইতে পারে যে, তিনি কেবল হিন্দুদের সম্বন্ধেই কথা বলিতে চাহিয়াছেন, তবে ব্যবহার করিয়াছেন কবি-সুলভ সুবিধানুযায়ী ভাষা? আচ্ছা দেখা যাক জাতির মেরুদণ্ড কৃষকের অবস্থা চিন্তা করিতে করিতেই তিনি কি বলেন! এখানে তো তিনি বলিতেছেন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। তিনি লিখিয়াছেন—

"হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি মাথায়, খালি পায়ে, একহাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন-লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে গোহালের একপাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার

সময়, হয় জমিদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমিখানি কাড়িয়া লইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সাধারণের উপবাস। বল দেখি চস্‌মা-নাকে-বাবু ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে একহাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডুয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি যে তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্র না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ— দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

"বঙ্গদেশের কৃষক"—প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাঠক দেখুন, সমগ্র দেশবাসীর জন্য, যাহারা দেশের মেরুদণ্ড তাহাদের জন্য, ঐ সরল আত্মত্যাগী কৃষিজীবীর জন্য— সমগ্র হিন্দু-মুসলমানের জন্য বঙ্কিমের ন্যায় আর কাহার প্রাণ কাঁদিয়াছে? "বন্দেমাতরম" কাহাদের প্রাণের গান হইবে। সপ্তকোটি বলিতে বঙ্কিম কি বুঝিতেন, এখন পাঠকের বুঝিতে বোধ হয় কোন অসুবিধা হইবে না। অন্যত্র "প্রচারে" বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

"সমদর্শী হইলে আর হিংসা থাকেনা ! এই সমদর্শিতা থাকিলেই মনুষ্য। যে খৃষ্টান কি মুসলমান মনুষ্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে যীশুরই পূজা করুক, আর পীর প্যাগম্বরেরই পূজা করুক, সেই পরম বৈষ্ণব।

প্রশ্ন—মুসলমানের বাড়ী খাইতে আছে ?

বাবাজী—যখন সর্ব্বত্র সমানজ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণবধর্ম্ম, তখন এ হিন্দু, ও মুসলমান, এ ছোটজাতি ও বড়জাতি, এরূপ ভেদজ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদজ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।

গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি।

পাঠক দেখুন,এরূপ যাঁহার সমজ্ঞান তাঁহাকে কদাচ মুসলমান-বিদ্বেষী বলা যাইতে পারে না।

তবে অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন ইহা ধর্ম্মপ্রচারকের কথা। আবার "অনুশীলনে" মনুষ্যধর্ম্ম তিনি সবদিক্ দিয়া বুঝাইতেছেন—

"খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, সবই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্গত। গড্ বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি।"

ইহাপেক্ষা সমদর্শিতা ও বিদ্বেষশূন্যভাব আর কি হইতে পারে, আমাদের তাহা জানা নাই। যাহা হউক, ধর্ম্মপ্রচারকের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণক্ষেত্রে প্রজার প্রতি রাজা বা শাসনকর্ত্তার কি কর্ত্তব্য তাহার আলোচনা করা যাউক ! আমরা "প্রচার" হইতে আর একটী স্থান উদ্ধৃত করিব।*

*প্রচার ১২৯২ শ্রাবণ, ২য় বর্ষ—পৃঃ ৬৩—৬৬।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় ইহারও ছয় মাস পরে—১৮৮৫, ডিসেম্বর।

"সীতারাম লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দির দর্শনে চলিয়াছেন। সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন যে, দেবমন্দির-দ্বারে দেবমূর্ত্তি সমীপে একজন মুসলমান বসিয়া আছে। বিস্মিত হইয়া সীতারাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে বাবা, তুমি?'

মুসলমান বলিল, "আমি ফকির।"

সীতারাম। মুসলমান?

ফকির। মুসলমানই বটে।

সীতারাম। আ সর্ব্বনাশ!

ফকির। তুমি এতবড় জমিদার। হঠাৎ তোমার সর্ব্বনাশ কিসে হইল?

সীতা। ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান!

ফকির। দোষ কি বাবা! ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইলেন?

সীতা। হইলেন বৈকি? তোমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল?

ফকির। তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতা। ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা।

ফকির। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই।

ফকির। আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন?

সীতা। ইনিই; যিনি জগদীশ্বর, তিনি সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির। মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই— কেবল মুসলমান ইঁহার মন্দির দ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইলেন? এই বুদ্ধিতে বাবা তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে

আসিয়াছ ? আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ইনি থাকেন কোথা ? এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন ? না, আর থাকিবার স্থান আছে ?

সীতা। ইনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বঘটে সর্ব্বভূতে আছেন।

ফকির। তবে আমাতে ইনি আছেন ?

সীতা। অবশ্য—তোমরা মান না কেন ?

ফকির। বাবা! ইনি আমাতে অহরহঃ আছেন, তাহাতে তিনি অপবিত্র হইলেন না—আমি উহার মন্দিরের দ্বারে বসিলাম ইহাতে ইনি অপবিত্র হইলেন ?

একটি স্মৃতিব্যবসায়ী অধ্যাপক ব্রাহ্মণ থাকিলে ইহার যথাশাস্ত্র উত্তর দিতে পারিত—কিন্তু সীতারাম স্মৃতি-ব্যবসায়ী অধ্যাপক নহেন, কথাটার কিছু উত্তর দিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কেবল বলিলেন, 'এইরূপ আমাদের দেশাচার।'

ফকির বলিল, বাবা! শুনিতে পাই তুমি হিন্দু-রাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ, কিন্তু অত দেশাচারের বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু-মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্য ধর্ম্মের রাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে। সেই একজনই হিন্দু-মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাকে মুসলমান করিয়াছেন, সেও তিনিই করিয়াছেন। উভয়েই তাঁহার সন্তান। উভয়েই তোমার প্রজা হইবে : অতএব দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিওনা। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ! পাপের রাজ্য থাকেনা।

সীতা। মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে না কি ?

ফকির। করিতেছে। তাই মুসলমানরাজ্য ছারেখার যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমানরাজ্য যাইবে ; তুমি রাজ্য লইতে পার ভালই, নহিলে অন্যে লইবে। আর যখন তুমি বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে ? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু-মুসলমানে কোন প্রভেদ করিনা। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্তরে যাইতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময় আবার আসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইব।

সীতা। দেখিতেছি, আপনি বিজ্ঞ। অবশ্য আসিবেন।

ফকির তখন চলিয়া গেল। সীতারামের দর্শন ও পূজা ইত্যাদি সমাপন হইলে সে আবার ফিরিয়া আসিল। সীতারাম তাঁহার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। সীতারাম দেখিলেন সে ব্যক্তি জ্ঞানী। ফারসী, আরবী উত্তম জানে সে। তাহার উপর সংস্কৃতও উত্তম জানে। এবং হিন্দু ধর্ম্মবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থও পড়িয়াছে। দেখিলেন যে, যদিও তাঁহার বয়স এমন বেশী নয়, তথাপি সংসারে সে মমতাশূন্য বৈরাগী, এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাঁহার এবম্বিধ চরিত্র দেখিয়া নন্দা রমাও (ভার্য্যাদ্বয়) লজ্জা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে বসিয়া তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথা সকল শুনিতে লাগিলেন।

বিদায়কালে সীতারাম বলিলেন, "আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন তাহা অতি ন্যায্য। আমি সাধ্যানুসারে পালন করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে আমার নূতন রাজধানীতে আপনি বাস করেন। আমি এই উপদেশের বিপরীতাচরণ করিলে আপনি নিকটে থাকিলে আমাকে সে সকল কথা আবার মনে করিয়া দিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নিকটে থাকিলে, আমার রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে।"

ফকির। তুমি একটী কথা আমার নিকট স্বীকৃত হইলে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি। তুমি রাজধানীর কি নাম দিবে ?

সীতা। শ্যামাপুর নাম আছে—সেই নামই থাকিবে।

ফকির। যদি উহার **"মহম্মদপুর"** নাম দিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি।*

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় এই স্থানটী তাঁহার অপূর্ব্ব গ্রন্থ "দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র" ও ঢাকা সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি গ্রন্থকারকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাও পাঠকের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম।

১৩৯বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা ২৯।১।৩৯

কল্যাণবরেষু

আপনার ২২শে তারিখের পত্র সহ 'বঙ্গশ্রীতে' প্রকাশিত 'বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়' প্রবন্ধ পাইয়াছি। প্রবন্ধটি পড়িলাম। বেশ ভাল লাগিল। 'প্রচারে' প্রকাশিত এই অংশের কথা সাধারণে ভুলিয়া গিয়াছে, আমারও স্মরণ ছিল না, অথচ এই অংশটী বেশী দরকারী। এ প্রসঙ্গে 'রাজসিংহের' ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাহিত্য পরিষদ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একটী critical সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। এখন দুইখণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। সীতারাম এখনও মুদ্রিত হয় নাই। সীতারাম মুদ্রণকালে সম্পাদকদিগের আপনার এই 'বঙ্কিম ও মুসলমান সম্প্রদায়' দেখা উচিত। সেইজন্য তাঁহাদের কাছে প্রবন্ধটি পাঠাইয়া দিলাম।

আমার মানসিক কুশল—আশা করি আপনি বেশ সুস্থ আছেন। ইতি—

শুভার্থী—

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সীতা। এ নাম কেন ?

ফকির। তাহা হইলে আমি খাতিরজমা থাকিব যে, তুমি হিন্দু-মুসলমান সমান দেখিবে।

সীতারাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ফকির তখন বলিলেন,—

"আমি ফকির, কোন গৃহে বাস করি না। কিন্তু তোমার নিকটেই থাকিব। যখন যেখানে থাকি তোমাকে জানাইব। তুমি খুঁজিলেই আমাকে পাইবে।"

গমনকালে ফকির তিনজনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অতঃপরে বঙ্কিমের মনোভাব সম্বন্ধে বোধ হয় আর কাহারও সন্দেহের কোন কারণ নাই।

উপন্যাস প্রচারকার্য্য নয় বলিয়া এই অংশ "সীতারাম" উপন্যাসে পাঠক দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, উপন্যাসে উক্ত চাঁদশা ফকির ও সীতারামের সম্বন্ধ কি অন্যরূপ দেওয়া হইয়াছে ? না, কখনও না। বঙ্কিম "সীতারাম" উপন্যাসে ফকিরের চরিত্র সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"এই সময় চাঁদশাহ নামে একজন মুসলমান ফকির সীতারামের সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ফকির বিজ্ঞ, পণ্ডিত, নিরীহ এবং 'হিন্দু-মুসলমানে' সমদর্শী। তাঁহার সহিত সীতারামের বিশেষ সম্প্রীতি হইল। তাঁহারই পরামর্শমতে নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য রাজধানীর নাম রাখিলেন "মহম্মদপুর"।

"ফকির আসে যায়। জিজ্ঞাসা মতে সৎপরামর্শ দেয়। কেহ বিবাদের কথা তুলিলে তাহাকে ক্ষান্ত করে।............"

'সীতারাম', প্রথম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ

ফকির নির্ভীক, সত্যবাদী এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তাই অত্যাচারী লম্পট সীতারামের জন্য যখন বাঙ্গালাদেশ ছাড়িয়া যাইতেছেন, তাঁহার সেই ক্ষোভ-কাতরতার অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিতেছেন—

........"চন্দ্রচূড় ঠাকুর এবার কাহাকে কিছু না বলিয়া তল্পী বাঁধিয়া মুটের মাথায় দিয়া তীর্থযাত্রা করিতেছেন। ইহজীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না।

পথে যাইতে যাইতে চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরজি, কোথায় যাইতেছেন?"

চন্দ্র। কাশী। আপনি কোথায় যাইতেছেন?

ফকির। মোক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায়?

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে, সে দেশে আর থাকিব না, একথা সীতারাম শিখাইয়াছে।"

'সীতারাম', ৩য় খণ্ড, উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই ক্ষেত্রে ফকিরের স্পষ্ট কথায় যেমন তাঁহার হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় হয় না, সেইরূপ স্পষ্ট কথায় ভ্রান্তি দেখাইয়া দিলেও বঙ্কিমের মুসলমান-বিদ্বেষ প্রমাণিত হয় না। কি হিন্দু, কি মুসলমান—কাহারও সম্বন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র 'একটু রহিয়া সহিয়া, একটু রাখিয়া ঢাকিয়া' কিছু ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। যাহা ভাবিতেন তাহাই প্রকাশ করিতেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দেখিতে পাই একজন বিক্রমপুরবাসী পোষ্টমাষ্টারের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। তাই বলিয়া যদি তাহাতে কেহ বঙ্কিমের বাঙ্গাল-বিদ্বেষের গন্ধ পান, তবে তাহা নিতান্তই বোকামি হইবে। হরবল্লভ গোয়েন্দাগিরি করিয়াছিল বলিয়া সব ব্রাহ্মণ গৃহস্থই গোয়েন্দা নহেন।

এসব চিত্রণ ব্যাপারে শিল্পীর অবাধ স্বচ্ছন্দগতি না থাকিলে চিত্রাঙ্কণ কিছুতেই স্বাভাবিক হইতে পারেনা।

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পড়িয়া একশ্রেণীর লোক যেমন বঙ্কিমের ডেপুটী-বিদ্বেষ ও ঈর্ষার কথা তুলিয়া তাঁহার দোষানুসন্ধানে রত হইবেন, আবার অনেকে তাঁহার স্পষ্ট ও সত্যবাদিতারই প্রশংসা করিবেন। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যই বিবেচ্য, এক-আধটা এদিক্ ওদিকের কথা নয়।

পাঠক যদি এই মনস্তত্ত্ব লইয়া বিচার করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশকে এত ভালবাসিতেন যে, যে-ব্যক্তি সেই মাতৃভূমির অনিষ্ট করিবে সেই ব্যক্তিমাত্রেরই প্রতি তিনি বিদ্বেষভাবাপন্ন—কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি নহেন—তবেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নাগাল পাইবেন, নতুবা পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় যেমন বঙ্কিমের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ দেখিতেন,* সেরূপ অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বঙ্কিমের মুসলমানদ্বেষের কথা বলিতেও পঞ্চমুখ হইবেন। বস্তুতঃ বঙ্কিম দেশ ভালবাসিতেন বলিয়াই পলাশী যুদ্ধ সম্বন্ধে বলিতেছেন –

"পলাশীর যুদ্ধে জন দুই চারি ইংরেজ ও তৈলঙ্গ সেনা সহস্র সহস্র দেশী সৈন্য বিনষ্ট করিয়া অদ্ভুত রণজয় করিল, —কথাটী উপন্যাসমাত্র। পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ্গ তামাসা হইয়াছিল।"

* বঙ্কিম বাবুর সহিত সাক্ষাৎ না করিবার দ্বিতীয় কারণ "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শ্রেণীর উপর তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা। সুবিধা পাইলেই, কোনরূপ প্রসঙ্গ পাইলেই তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর একহাত চালাইতেন, একচোট বসাইতেন।"

'বঙ্কিমবাবুর পিতৃপ্রসঙ্গ'—'নারায়ণ', ১৩২২, পৃঃ ৮৯৯।

আমাদের মনে হয় পণ্ডিত মহাশয় ভুল বুঝিয়াছেন। —গ্রন্থকার

দেশ ভালবাসিতেন বলিয়াই তিনি আবার 'চন্দ্রশেখরে' নবাব মীরকাশিমের মুখেও আরোপ করিয়াছেন—

"যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব, অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সিরাজউদ্দৌলা বা মীরজাফর নহি।"

এইরূপ সমদর্শী লেখকই আবার মীরজাফর সম্বন্ধেও লিখিতে পারেন—

"১১৭৬ সালে (ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে) বাঙ্গলা প্রদেশ ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই, ইংরেজ তখন বাঙ্গলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজানার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাসহন্তা, মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, **বাঙ্গলা রক্ষা** করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলী খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ লেখে। **বাঙ্গালী কাঁদে** আর উৎছন্ন যায়!"……

কথাটা কি সত্য নয়? জাতীয়তা-গুণ-বিশিষ্ট বহু মুসলমান ভ্রাতৃগণও মীরজাফরকে এই ভাবেই দেখিয়া থাকেন।

এই যে উক্তি—ইহাতে বাঙ্গলার জন্য দরদই সম্পূর্ণ প্রকটিত হইতেছে। আর যে বিশ্বাসঘাতক, সে হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, খৃষ্টান হৌক, সমানই অশ্রদ্ধার পাত্র। মীরজাফরকে বরং ইতিহাসই অকর্ম্মণ্যচরিত্রভাবে পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু কল্পিত চরিত্র হিন্দু বিশ্বাস-ঘাতক পশুপতি (যদিও খুব কর্ম্মঠ, অগাধ শাস্ত্রবিদ, পরোপকারী) সম্বন্ধেও বঙ্কিম লিখিয়াছেন এই ভাবেরই কথা। পশুপতি ভাবিলেন এ "সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই

রাজধানীকে শ্মশানভূমি করিয়াছেন। তিনি মনে মনে স্বীকার করিলেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্যপাত্র বটে!"

বস্তুতঃ বঙ্কিম বাঙ্গলা দেশ ভাল বাসিতেন বলিয়াই হিন্দুর ন্যায় মুসলমানের স্বার্থও সমভাবেই দেখিতেছেন। তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই যে, "বাঙ্গলার অর্দ্ধেক মুসলমান।"* এমন কি সামাজিক প্রশ্ন "বহুবিবাহ" প্রসঙ্গালোচনায়ও তিনি মুসলমানদের কথা ভুলেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"একথা ভুলিলে চলিবে না যে এদেশে (বাঙ্গলায়) অর্দ্ধেক হিন্দু অর্দ্ধেক মুসমলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দু শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধিদ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থা-বিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, "বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ, অতএব যে মুসমলান বহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে।" যদি তাহা না বলেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে "আমরা বড় প্রজাহিতৈষী ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমরা বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা অর্দ্ধেক প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ভাল। তাহাদিগের ব্যাকরণের গুণে একস্থানে "ক্রমশোবরা" "ক্রমশোঽবরা" উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগেরই হিত করিব। আমাদের অবশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের ভাগ্যদোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ সুচতুর নহে, আরবী কায়দা হেলে দোলে না, বিশেষ মুসলমানদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নাই, অতএব বাকি

---

*বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

অর্দ্ধেক প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক সমাজ এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে কোন উক্তিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না।"

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, বঙ্কিম হিন্দু-মুসমলান জানিতেন না, উচ্চজাতি নীচজাতিও বুঝিতেন না, একমাত্র গোটা বাঙ্গলাদেশই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এইজন্য যদিচ বহুবার তিনি বলিয়াছেন "সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বাঙ্গলা জয় হইয়াছিল একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা"—*

তথাপি এই খাঁটি সত্যটী উপলব্ধি করিতেও তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান নাই যে "রাজা ভিন্নজাতি হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলা যায় না।—বস্তুতঃ দেখিতে হইবে যে, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না?" †

এই মাপকাঠিতে তিনি মুসলমান শাসন বিচার করিয়াছেন—প্রথম পাঠান শাসন—তারপরে মোগল শাসন।

পাঠানদের সম্বন্ধে বঙ্কিম প্রশংসাবাদ করিয়া বলেন††

"(১) যে সময়ে জমিদারগণ রাজার ন্যায় ছিলেন—করদ ছিলেন মাত্র।

(২) পরাধীনতার ফলে জাতির মানসিক স্ফূর্ত্তি নিবিয়া যায়। কিন্তু পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়ে আবির্ভূত; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়েই স্মার্ত্ততিলক রঘুনন্দন, এই

* বাঙ্গলার ইতিহাস। † ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা।
†† বাঙ্গলার ইতিহাস।

সময়েই চৈতন্যদেব, এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী ;—চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব্ব বৈষ্ণব সাহিত্য।

৩। তৎকালীন শিল্প-নৈপুণ্যের অনেক পরিচয় আছে। কলিকাতা অপেক্ষা গৌড় অনেক বড় ছিল। গৌড়ের ইষ্টক রাজধানী মুরশিদাবাদ ও রাজমহলের নির্ম্মাণেও লাগিয়াছে।

কিন্তু মোগলের সময়ের কথা বঙ্কিম ক্ষুব্ধচিত্তে বলেন—

(১) বাঙ্গলার সৌভাগ্য মোগল কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।

(২) পাঠান আমাদের মিত্র, মোগল শত্রু, আমরা মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের অধিক জয় গাহিয়া থাকি।

(৩) মোগলের অধিকারের পর হইতে একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই।

(৪) মোগল অধিকারের পরে বাঙ্গলার ধন আর বাঙ্গলায় রহিল না—প্রথমে উহা দিল্লী, তারপরে ইরাণ, তুরাণ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

(৫) বাঙ্গলায় হিন্দুর অনেক কীর্ত্তি আছে, পাঠানের অনেক কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গলায় মোগলের কোন কীর্ত্তি কেহ দেখিয়াছে? কীর্ত্তির মধ্যে "আসল তুমার জমা"—কীর্ত্তি কি অকীর্ত্তি বলিতে পারি না, কিন্তু তাহাও একজন হিন্দুকৃত।*

সুতরাং একশ্রেণীর মুসলমানের অথবা অত্যাচারী বা অহিতকারী মুসলমানের নিন্দায় সমগ্র মুসলমান সমাজের বিরক্তির কোন কারণ

* এখানে কি তিনি হিন্দুর নিন্দা করেন নাই?

নাই। সেরূপ পশুপতি* বা হরবল্লভের নিন্দায়ও সমগ্র ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ক্ষোভের কোন কারণ নাই।

বাঙ্গালীজাতিকে ভাল বাসিতেন বলিয়াই বঙ্কিম বাঙ্গলার প্রকৃত ইতিহাস চাহিতেন। তাই সপ্তদশ অশ্বারোহী সম্বন্ধে মিনহাজউদ্দিন যে-ইতিহাস দিয়াছেন, তিনি তাহা কল্পিত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এরূপ পক্ষপাতিত্বের জন্য সময় সময় ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধেও কম তীব্র-ভাষা প্রয়োগ করেন নাই। এই কারণেই যেমন হিন্দুদ্বেষী মুসলমান লেখকের ইতিহাস তিনি গ্রহণ করেন নাই, সেরূপ আবার স্বজাতি পক্ষপাতী হিন্দুর ইতিহাসও গ্রহণ করেন নাই।

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসই পাঠান চরিত্র অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে বিলাসী শাসনকর্ত্তা কতলুখাঁর কথা ও "পাঠান কুলতিলক" ওসমানের কথাও আছে, আবার "রমণীরত্ন" দেববালা আয়েষার কথাও আছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'রাজসিংহ' পর্য্যন্ত বঙ্কিম বহু উপন্যাস লিখিয়াছেন, আর শান্তি, প্রফুল্ল, শ্রী প্রভৃতি বহু গরীয়সী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু "অনুশীলন"তত্ত্বে প্রয়োগসিদ্ধা না হইলেও, আয়েষার ন্যায় "প্রেমময়ী, মাধুর্য্যময়ী, পরহিত-মূর্ত্তিমতী,

* পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন বলেন—

"বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ না করিবার তৃতীয় কারণ, 'মৃণালিনী'তে মহামতি মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মণ্যের অবতার গ্রন্থকার পশুপতি আচার্য্যের বীভৎস চিত্র প্রদর্শন। পশুপতি আচার্য্য যে সে লোক নহেন, তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমিকে ধন্য করিয়াছেন।" 'নারায়ণ'—১৩২২—৯০১।

স্বার্থত্যাগব্রতা” রমণী বঙ্কিম-সাহিত্যে গ্রন্থকারের চক্ষে পড়ে নাই। যথাস্থানে এই চরিত্র আলোচিত হইবে। ওসমানের মহানুভবতাও পরিস্ফুট হয় দুই একটী কথায়—

“কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে যে পাছে লোকে দয়ালুচিত্ত বলে, এই লজ্জার আশঙ্কায় কাঠিন্য প্রকাশ করেন; এবং দয়াশীলতা নারীস্বভাবসিদ্ধ বলিয়া উপহাস করিতে করিতে পরোপকার করেন। লোকে জিজ্ঞাসিলে বলেন—ইহাতে আমার প্রয়োজন আছে। আয়েষা বিলক্ষণ জানিতেন ওসমান তাহারই একজন।”

‘দুর্গেশনন্দিনী’ ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।

নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, গ্রন্থের নায়ক জগৎসিংহ হইলেও ওসমান চরিত্র তাঁহার অপেক্ষাও মহত্তর হইয়াছে।

ধীরভাবে চিন্তা করিলে, কেবল খণ্ড খণ্ড দুই একটী কথার উপর নির্ভর করিয়া বঙ্কিমের প্রতি খড়্গহস্ত না হইলে, নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই এ বিষয়েই নিঃসংশয় হইতে পারিবেন যে, প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলারই ঐকান্তিক হিতৈষী ছিলেন—এবং জাতি বিশেষের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। অনেকে হয়তো “রাজসিংহ” উপন্যাসে ঔরঙ্গজেব চরিত্র উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমের ত্রুটী ধরিতে পারেন। এবিষয়টী বর্ত্তমান গ্রন্থকার “রাজসিংহের ভূমিকা”* নামক গ্রন্থে বিস্তৃতালোচনা করিয়াছে। হীরেন্দ্রনাথও এবিষয়ে সুন্দরভাবে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিদ্বেষবশতঃ ঔরঙ্গজেব চরিত্র চিত্রিত হয় নাই। বঙ্কিম স্পষ্টই বলিয়াছেন—

“গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক যেন মনে না করেন যে, হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই

* মাসিক ‘বঙ্গশ্রীতে’ ৮।১০টী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না ; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে······অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিলেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হউক মুসলমান হউক—সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল।"

ধর্ম্মান্ধতা যে ধর্ম্মশূন্যতা নহে, বঙ্কিম তাহা ভালরকমই জানিতেন। যে কপটাচারী, ভণ্ড, সে ধর্ম্মশূন্য ; কিন্তু যে সরলভাবে একরূপ বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাসানুযায়ী কাজ করে, হয়তো তাহার ধর্ম্মমতের সঙ্গে অনেকের অনৈক্য হইতে পারে, কিন্তু কেহ তাঁহার অকপটতায় দোষ ধরিতে পারে না এবং ইহাতে কিছুতেই তাঁহাকে ধর্ম্মহীন বলা যাইতে পারে না। ওসমান এই শ্রেণীর মুসলমান। ওসমান জগৎসিংহকে বলিতেছে—

"মোছলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্ম্মই সত্য-ধর্ম্ম ; বলে হউক, ছলে হউক, সত্যধর্ম্ম প্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম আছে"—*
দ্বিতীয় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ।

ইহা ধর্ম্মান্ধতার নামান্তর মাত্র। কোন হিন্দু ইহা অনুমোদন করিবেন না, অনেক ধার্ম্মিক ও ন্যায়নিষ্ঠ মুসলমানও করিবেন না। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র ওসমানকে মহৎ চরিত্রে পরিণত করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের প্রতি তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন, কেন না তিনি "নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মমাত্র-হিতৈষী ও প্রজা-

* সৈয়দ ইমদাদল হক্ বলেন—"এরূপ শিক্ষা আমরা ইংরাজের শিক্ষায় শিখিয়াছি। বস্তুতঃ মহম্মদীয় ধর্ম্ম অনেক উদার।" 'ভারতী'—১৩১৭, বৈশাখ।
আমরা শ্রীযুক্ত হকের সহিত একমত। গ্রন্থকার

পীড়ক !" ওসমানও যে অন্যায় করেন না, তাহা নয়। "যুদ্ধজয়ার্থ ওসমান কোন কার্য্যই সঙ্কোচ করিতেন না—কিন্তু যুদ্ধ-প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পরাজিত পক্ষের প্রতি কদাচিৎ নিষ্প্রয়োজনে তিলার্দ্ধ অত্যাচার করিতে দিতেন না।" উক্ত ত্রুটী সত্ত্বেও সরল এবং মহৎ ছিলেন বলিয়া ধর্ম্মান্ধ হইয়াও ওসমান পাঠান কুলতিলক—আর উপরোক্ত দোষে ঔরঙ্গজেব সাম্রাজ্য-ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন।* এই মনোভাব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচার করিলেই তাঁহার উদারতা, দেশপ্রেম ও সমদর্শিতা বুঝিতে পারিব।

মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসের পরিচয় যথাস্থানে দিব। এবং আরও দেখাইব যে মুসলমান চরিত্র মোবারক ও দরিয়া চরিত্রও কত মহৎ। এমন কি জেবউন্নিসাও প্রেমরসে কিরূপ অপূর্ব্ব মানবীয় নারী চরিত্রে পরিণত হইয়াছে। আর এই জেবউন্নিসা চরিত্রাঙ্কণে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের শিল্পনৈপুণ্যের কত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন !

আজ হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, পার্শী, ইহুদী সকলেই বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে, বঙ্কিম প্রকৃতই জাতীয় ঋষি ছিলেন, হিন্দু মুসলমানে তিনি সমদর্শী ছিলেন, তিনি জাতির প্রকৃত হিতাকাঙ্খী ছিলেন, জাতির শত্রু, দেশের শত্রুর প্রতি তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন এবং তাহার সঙ্গীত 'বন্দেমাতরমই' ভারতীয় জাতীয় মহাসম্মিলনের একমাত্র মিলন-সঙ্গীত। তাই সেই গান, সেই মহামিলন গীতি,

* মুসলমান-লেখক সৈয়দ ইমদাদল হকও বলেন—

"আওরঙ্গজেবের দোষের মধ্যে তিনি ঘোর হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন। যদিও হিন্দুদিগের বিরুদ্ধাচরণ করা তাহার একটী মহারাজনৈতিক ভ্রান্তি হইয়াছিল এবং এই মহাভ্রান্তিই ভবিষ্যতে মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার একটী প্রধানতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

'ভারতী'—১৩১০—বৈশাখ ৩০

সকলকণ্ঠেই সমস্বরে ধ্বনিত হয়—*—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম,
সুখদাং বরদাং মাতরম্,
ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ† কলকল নিনাদ করালে,
দ্বিত্রিংশ কোটি ভুজৈর্ধৃত খর করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।

বঙ্কিমও বলিতেন "আমি তখন থাকিব না কিন্তু তোমরা দেখিবে এ গানে একদিন আকাশ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হবে। ধূলো থেকে আরম্ভ ক'রে গাছের পাতা পর্য্যন্ত কাঁপতে থাকবে।" তাই আমরা দেখিয়াছি বঙ্গভঙ্গের সময়ে এগান গাহিলে ছেলেদের জেল হইত, আবার মহাযুদ্ধের সময় এই গানটীই গাহিতে গাহিতে দেশীয় বাহিনী

* ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বীডন উদ্যানে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে শুভ্রবস্ত্র পরিহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ সমগ্র সঙ্গীতটি গাহিয়াছিলেন। কংগ্রেসে 'বন্দেমাতরম্ গানের এইখানেই আরম্ভ। 'বঙ্গশ্রী'—কংগ্রেসের ইতিহাস, ১৩৪৮

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলেন "বিডন উদ্যানের কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের বন্দেমাতরম্ গান শুনিয়া একজন মদ্রদেশাগত প্রতিনিধির নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়াছিলাম।" "ঋষি বঙ্কিম", নারায়ণ—১৩২২

† পূর্ব্বে ছিল ইহা সপ্তকোটিকণ্ঠ ও দ্বিসপ্তকোটিভুজ। ১৯৩৮ সালের হরিপুরা কংগ্রেস হইতে এইরূপ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শত্রুর সম্মুখীন হইত। আজও আমরা দেখিতেছি ইহাই গাহিতে গাহিতে আত্মরক্ষায়, জাতিরক্ষায়, দেশরক্ষায় ভারতবাসী আত্মাহুতি দিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

বঙ্কিম মহেন্দ্রের মুখে স্পষ্ট বলিয়াছেন—"এ তোমার কালী নয়, দুর্গা নয়, জগদ্ধাত্রী মা নয়, এতো দেশ—"

ভবানন্দও বলিলেন—আমরা অন্য মা জানিনা, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—

তাই তিনি গাহিলেন—

বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীম্
রিপুদল বারিণীং মাতরম্ ॥
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।*

ভবানন্দ বলিতেছেন—জন্মভূমিই আমাদের জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই। আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা, শস্যশ্যামলা—জন্মভূমি।

(আনন্দমঠ)

*যথাস্থানে এই গানের ব্যাখ্যা ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রদত্ত হইবে।

তিনিই (ত্বং হি) আমাদের তুর্গা, তিনিই আমাদের শক্তি, তিনিই কমলা, তিনিই বিদ্যাদায়িনী, তিনিই ধরণী ভরণী মা—

ত্বংহি তুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীম্ ভরণীম্ মাতরম্

জন্মভূমিকে সকল ঐশ্বর্য্যময়ী, সকল গুণশালিনী, সর্ব্ববলদায়িনী বলিয়া সন্তান পূজা করেন। ইহা কি কেবল হিন্দুরই সঙ্গীত? তবে হিন্দু এই মাকে মন্দিরে মন্দিরে পূজা করেনা কেন ?* এই জন্মভূমিই দেশভক্তমাত্রেরই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কেবল হিন্দুই কি দেশভক্ত ? এই মা তোমার আমার সকলের মা—ইহা হিন্দুর, ইহা মুসলমানের, ইহা খৃষ্টানের। ইনি সমগ্র ভারতবাসীর জন্মভূমি মা। এই সঙ্গীতে কোন পৌত্তলিকতা নাই, সাম্প্রদায়িক ভাব নাই, ইহাতে কোন সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি নাই। তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, তুমি খৃষ্টান হও, তুমি বাঙ্গালী হও, পঞ্চনদ বা মহারাষ্ট্রবাসী হও, তুমি আস্তিক হও, নাস্তিক হও, সূর্য্যোপাসক হও, সকলেরই এই গান গাহিবার অধিকার আছে। তুমি আমি সমগ্র ভারতবাসী একই জাতি।

* বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের "জাতীয় সঙ্গীত" প্রবন্ধটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সকলেই আমরা ভাই। সকলেই বলো বন্দেমাতরম, প্রতিধ্বনিত হউক বন্দেমাতরম, আর এই গানেই বিদূরীত হউক আমাদের যাবতীয় ভেদবুদ্ধি, আমাদের সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণ মনোভাব।

"তবে এসো ভাইসকল, এই গান গাহিতে গাহিতে আমরা অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি।"* ভয় কি, না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? এসো মা, যুক্ত করে ডাকি এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব—ওঠ মা, এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম্ম; আলস্য, ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিব। এসো ভাই সব, প্রতিমা তুলিয়া আনি—

বল, সকল কণ্ঠে বল,

"বন্দে মাতরম্"

* 'আমার দুর্গোৎসব'—কমলাকান্ত।

নির্ঘণ্ট (ক)

ব্যক্তি

র

ল

শ

স

হ

নির্ঘণ্ট (খ)

পুস্তক, পত্রিকা ও প্রবন্ধাবলী

* সাময়িক পত্রিকা

† বঙ্কিম লিখিত প্রবন্ধ

* সাময়িক পত্রিকা

†বঙ্কিম লিখিত প্রবন্ধ

* সাময়িক পত্রিকা

† বঙ্কিম লিখিত প্রবন্ধ

ল

শ

স

স

হ

* সাময়িক পত্রিকা

† বঙ্কিম লিখিত প্রবন্ধ

নির্ঘণ্ট (গ)

বঙ্কিম-উপন্যাসের চরিত্রাবলী

র

ল

শ

স

স

হ

গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন

আমাদের দেশে যে সমস্ত গ্রন্থকার আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া পুস্তক রচনা করেন, তাঁহাদের অসুবিধা বড় কম নয়। বহু পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধান করিবেন, পুস্তক লিখিবেন, সেই পুস্তক তাঁহাদিগকে নিজব্যয়েই মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইবে, তাহাদিগকেই সমস্ত দেখিতে শুনিতে হইবে। তারপরে পুস্তক যত ভালই হউক না কেন, সে পুস্তক বড় বিক্রয় হইবে না। এদিকে রিসার্চ্চ-উন্মত্ত গ্রন্থকারের সাংসারিক দুঃখদৈন্য ক্রমে বাড়িয়াই চলিবে। কিন্তু তথাপি দেখিতেছি উদারপ্রাণ ব্যক্তিগণের ও নানাবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এদিকে মনোযোগ বড়ই কম।

বহু গবেষণা করিয়া 'গিরিশপ্রতিভা' ও 'ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ' প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি। আজ আবার বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র জীবনী (পাঁচ খণ্ডে), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন চরিত (চারি খণ্ডে) ও ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস (দুই খণ্ডে) প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। এই সমস্ত বিরাট গ্রন্থ রচনায় আমাকে অনেক পরিশ্রম, শক্তি ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, লাভবান ওকালতি ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছি, খাটিতে খাটিতে নিজেও অসময়ে বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইয়াছি। কিন্তু মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছি। জাতীয় হৃদয় উদ্দীপিত করিতেই গ্রন্থকয়খানি রচিত হইয়াছে।

এই মহাকার্য্যে আমি সকলের সহানুভূতি প্রার্থনা করি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পাঁচ খণ্ডের মূল্য বাবদ যে অন্যূন ২০৲ টাকা ধার্য্য

হইয়াছে, পাঠকের পক্ষে তাহা অধিক মনে হইলেও, খরচ হিসাবে একেবারেই বেশী নয়! সকলের সহযোগিতা পাইলেই জাতীয়তা-মূলক সমগ্র গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইবে,—নতুবা নয়।

ভরসা করি এবিষয়ে আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতে কেহই শিথিল বা পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না।

এ কার্য্য আমার একার নয়, ইহা জাতির মহাকার্য্য। আজ যদি 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' বা 'চৈতন্যভাগবত' না বাহির হইত, মহাপ্রভুর অমূল্য জীবন আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিত। মহাত্মা টড্ না থাকিলে রাজস্থানের পর্ব্বতে কন্দরে আজও চারণ-গীত প্রতিধ্বনিত হইত না। ইতিহাস নাই বলিয়াই বাঙ্গালী আপনাকে চিনে না—তাই এ জাতি দুরদৃষ্ট, আত্মবিস্মৃত।

'বন্দে মাতরমের' ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, বন্দেমাতরমের শ্রেষ্ঠ পূজক সর্ব্বত্যাগী চিত্তরঞ্জনের ইতিবৃত্ত বাহির হইবে না—বাঙ্গালীর এই দুঃখ ও ক্ষোভ রাখিবার স্থান কোথায়?

ভরসা করি, জাতির মঙ্গলের জন্য এ মহাকার্য্যে সকল দেশবাসীর সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হইব না।

বিনীত—

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

১২৪।৫ রসা রোড, কালীঘাট,
কলিকাতা।